বিপ্লবের পদাঙ্ক

শ্রীভূপেন্দ্রকুমার দত্ত

সরস্বতী লাইব্রেরী
১৯৫৩

প্রকাশক : শ্রীসুবোধ গুহ
সরস্বতী লাইব্রেরী
৬নং বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১২

প্রাপ্তিস্থান :

সরস্বতী লাইব্রেরী—৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২
বেঙ্গল পাবলিশার্স—৮৯ হ্যারিশন রোড, কলিকাতা-৭
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স—২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত পুস্তকালয়।

মুদ্রাকর : শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত
শ্রীসরস্বতী প্রেস লিঃ
৩২, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা-৯

উৎসর্গ-পত্র

একটানা সুযোগ-সন্ধানের ঐতিহ্য ভেঙে

দেশে

দুর্যোগের সাধনা করলেন যাঁরা,

যাঁরা নিজেদের জীবন এবং বাণী দিয়ে

প্রেরণা জুগিয়েছেন

আমার জীবনে অতীতে

আজও জুগিয়ে চলেছেন—

তাঁদের কাছে

ভক্তি-নিবেদন।

গ্রন্থকার

পরিচিতি

বিপ্লবের পদচিহ্ন—ভূপেনবাবুর ঠিক জেল-জীবনের কাহিনী নয়; এটা একটা ইতিহাসের ক্রমবিকাশের কাহিনী। বাংলার রাজনীতি ক্ষেত্রে শ্রীভূপেন্দ্রকুমার দত্ত একটা বিশেষ স্থান অধিকার করেন। বাংলার বিপ্লবী যুগের কাহিনীর ঘটনার বিন্যাস ভূপেনবাবুর চেয়ে ভাল কেউ করতে পারবে কি না সন্দেহ। কিন্তু তার চেয়ে-ও বড় কথা হল—বাংলার বিপ্লবী যুগের কাহিনীর বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করতে ভূপেনবাবুর সমকক্ষ কেউ নেই—একথা তাঁর সহকর্মীরা সবাই জানেন ও মানেন।

এই পুস্তকে জেলখানার কথা এবং কারা-জীবনের কথা অবশ্যই আছে। কিন্তু সেটা হল উপলক্ষ। কি চিন্তাধারা নিয়ে আমরা বিপ্লব-আন্দোলনে আসি? ইংরেজকে তাড়াতে হবে—এই অন্ধ আবেগ ভিন্ন আর কিছুই প্রায় ছিল না। তারপর কি হবে? হয়ত বরোদার মহারাজাকে ডেকে ভারতের সিংহাসন দেব; হয়ত আনন্দমঠের মতো সন্ন্যাসী সমাজের হাতে শাসন ভার দেওয়া হবে; হয়ত আকবরের মতো সর্বধর্মসমন্বয়কারী একটি সম্রাট খুঁজে বের করতে হবে; অথবা হয়ত প্রতাপ বা শিবাজীর বংশধরদের মধ্য থেকে কাউকে বসাব। এমনি নানা উদ্ভট ধারণা মনে আসত। কিন্তু তা নিয়ে আমরা বিশেষ ব্যস্ত ছিলাম না;—আমরা ব্যস্ত ছিলাম ইংরেজকে তাড়াবার প্রয়াস করব এবং সম্ভব হ'লে সেই প্রয়াসে আত্মবলিদান করব।

১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় তার একটা সুযোগ এল। পড়া-শুনা ছেড়ে উত্তেজিত হয়ে দেশের এক প্রান্ত হ'তে অপর প্রান্তে

ছুটেছি। কোন্ উন্মাদনায়? সশস্ত্র বিদ্রোহের সুযোগ আসছে; তাতে আমরা মরতে পারব—এই ছিল আমাদের আশা। জার্মানীর দেওয়া কয়েক হাজার বন্দুক বা অন্য কিছু অস্ত্র-শস্ত্র দিয়েই আমরা দেশকে স্বাধীন করতে পারব—সে আশা ছিল না। কিন্তু জাতির অন্তরে আমরা একটা দাগ রেখে যাব—তার সুপ্ত চেতনাকে জাগিয়ে দিয়ে যাব—এই ছিল আমাদের আকাংক্ষা। আমাদের সে প্রয়াস ব্যর্থ হ'ল; আত্মাহুতির সুযোগ আমরা পেলাম না। একে একে ধরা পড়লাম; জেলে আবদ্ধ হ'লাম। ব্রিটিশ-রাজের জীবন-মরণ সন্ধিক্ষণে তার শত্রুর সঙ্গে ষড়যন্ত্র করেছি—তাকে ঘা দেবার জন্য। এত বড় অপরাধ ইংরেজ যে সহজে ক্ষমা করবে না—তা আমরা জানতাম। কিন্তু খালাস একদিন হব—এটা বুঝতে পারলাম। তখন থেকে সুরু হ'ল—আত্ম-বিশ্লেষণ।

কিসের আবেগে আমরা ঘর ছেড়ে, মাতা-পিতাকে ত্যাগ ক'রে বের হয়েছি? কি আমরা চাই? কি পথে তা পাওয়া সম্ভব বা সহজ? এ সব প্রশ্ন আমাদের মনে আসতে লাগল। স্কুল-কলেজে যা পড়েছি, তা পরীক্ষা পাশের পড়া; দলের আওতায় যা পড়েছি—তা প্রধানত চরিত্র-গঠন ও স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষার জন্য। জেলে বসে রাজ-নীতি, অর্থ-নীতি, ইতিহাস ও সমাজ-বিজ্ঞান পড়ার সুযোগ পেলাম। এর মধ্যে এল রুষ বিপ্লব। লেনিন ও ট্রটস্কী আমাদের মনকে আচ্ছন্ন করল। রাজনৈতিক বই পাওয়ার যথেষ্ট অন্তরায় ছিল; কিন্তু কোন রকমে যোগাড় করতাম। ট্রটস্কীর একখানা বই বের হ'ল—Russian Revolution from October to Brestlitovsk (Published by Allen & Unwin)। বই-এর তালিকা সরকার থেকে পাশ করিয়ে আনতে হবে। এক গাদা বই-এর নামের সঙ্গে লিখে দিলাম—"From October to Brestlitovsk"—

Allen & Unwin ; Censorএর হাত থেকে ঐ বই পাশ হয়ে গেল। Censorএর বিত্তায় কুলোয় নি—Octoberএর তাৎপর্য কি এবং Brestlitovsk কি। হয়ত বই-এর পরিচয়ে লেখা ছিল উপন্যাস বা এমনি কিছু। যাক—জেলের দেওয়াল ভেদ ক'রে-ও রুশ বিপ্লবের কথা আমাদের কাণে এল।

এর মধ্যে সুরু হ'ল গান্ধীজির সত্যাগ্রহ। গান্ধীজি যখন তৈরি হচ্ছিলেন ভারত সেবক সমাজে (Servants of India Society) যোগ দেবার জন্য—তখন বের হ'ল রৌলাট কমিটির রিপোর্ট (Rowlatt Committee)। এই কমিটি গঠিত হয়েছিল—বিপ্লবী ষড়যন্ত্র প্রতিরোধ করার ব্যবস্থা বাতলাবার জন্য। এই কমিটির বহু সুপারিস সভ্য সমাজের অনুপযুক্ত ব'লে গান্ধীজির ধর্ম-বুদ্ধিতে আঘাত লাগল। তিনি এর প্রতিবাদে সত্যাগ্রহ আন্দোলন সুরু করেন। মৌলিক দিক থেকে দেখলে গান্ধীজির এই আন্দোলন আমাদের বিপ্লবী আন্দোলনের অনুসৃতি মাত্র। আমাদের চিন্তা জগতে আর একটি সূর্যের উদয় হ'ল। আমাদের রাজনীতির ক্রমবিকাশ এখান থেকে সুরু হয়। আমরা সিদ্ধান্ত করলাম, খালাস হয়ে গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেব।

আদর্শগত এত বড় একটা পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত একদিনে বা হুজুগের মুখে হয় নি ; হয়েছে অনেক আলোচনা, অনেক তর্ক-বিতর্ক, বন্ধু-বিচ্ছেদ এবং অনেক অন্তর্দ্বন্দ্বের পর। সহিংস বিপ্লবীর আত্ম-শ্লাঘা অহিংস পন্থা অবলম্বনে অনেকের পক্ষে অন্তরায় হয়েছিল। তখন-ও আমরা গান্ধীর পন্থা (technique) গ্রহণ করেছিলাম—কিন্তু তাঁর মত (ideology) গ্রহণ করিনি। কি ক'রে আস্তে আস্তে আমরা গান্ধীর মতবাদ-ও গ্রহণ করলাম—সে এক বিস্ময়কর কাহিনী। অথচ মার্কস্ ও তাঁর মতের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা কখন-ও লোপ পায় নি।

এই যে আত্ম-বিশ্লেষণ ও অন্তর্দ্বন্দ্ব ভূপেনবাবু তার ব্যাখ্যা করেছেন তাঁর নানা লেখার ভিতর দিয়ে। এই পুস্তকের প্রধান বিশেষত্ব-ই হ'ল—গোপন ষড়যন্ত্র থেকে গণ আন্দোলনের পথ, বিদ্রোহ থেকে বিপ্লবের পথ, রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা থেকে অর্থনৈতিক ও সামাজিক স্বরাজ গ'ড়ে তোলার পথ গ্রহণের ক্রমবিকাশকে ব্যাখ্যা করা। এই হ'ল এই গ্রন্থের দার্শনিক তত্ত্ব,—এই গ্রন্থের মধ্যমণি। গ্রন্থের যে-অংশ প্রকাশিত হচ্ছে, সেখানেই এর শেষ নয়, আরম্ভ মাত্র।

তা ছাড়া, এই গ্রন্থের একটা সাহিত্যিক দিক-ও আছে। বিপ্লবী কর্মীদের মধ্যে ভূপেনবাবুর সাহিত্যিক হিসাবে একটা খ্যাতি আছে। ইংরাজী ও বাংলা উভয় ভাষাতেই তাঁর লিখবার ক্ষমতা কতকটা অসাধারণ। ১৯৩৯ হ'তে '৪১ সাল পর্যন্ত ইংরেজী সাপ্তাহিক Forward তাঁর সম্পাদকতায় বের হ'ত। বিদ্বজ্জন মহলে ভারতের সর্বত্র Forward তখন সমাদৃত হ'ত। অনেকে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন—বিপ্লবী কর্মী ভূপেন দত্ত আবার লিখতে শিখলেন কবে। দু'চার জন এমন সন্দেহ-ও প্রকাশ করেছেন—ভূপেনবাবু কেবল নামে সম্পাদক—প্রকৃত পক্ষে ঐসব প্রবন্ধ লেখে অন্য কেউ। তাঁর বাংলা লেখা-ও তেমনি বিস্ময় উৎপাদন করেছে। তাঁর লেখার বিশেষত্ব যে কেবল লেখার ভঙ্গী বা styleএর জন্য, তা নয়; লেখার বিষয়-বস্তু বা contentsও লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সাহিত্য, দর্শন, রাজনীতি ও ইতিহাসে তাঁর অধিকার ও পাণ্ডিত্য—এই লেখায় প্রকাশ পায়। ১৯৪৬ সালে তাঁর লিখিত কয়েকটি প্রবন্ধ Forwardএ প্রকাশিত হয়। তখন-ও তিনি জেলে আবদ্ধ; সেখান থেকে প্রেরিত প্রবন্ধ স্বভাবতই বেনামীতে বের করতে হয়েছিল। বহু পণ্ডিত ব্যক্তি ঐ সব প্রবন্ধের জন্য Forwardএর তৎকালীন সম্পাদককে সন্তোষ-জ্ঞাপন ক'রে চিঠি দিয়েছেন। ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ-ও

সন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন। "Indian Revolution and the Constructive Programme" নামে ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের ভূমিকা-সহ ঐসব প্রবন্ধ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছে।

"বিপ্লবের পদচিহ্ন" ভূপেনবাবুর সাহিত্যিক ক্ষমতারও পরিচায়ক। জেলের কঠোর জীবনের কাহিনীকে সরস ক'রে লেখা, জেলজীবনে বন্দীদের মনের উপর যে চাপ পড়ে এবং তার ফলে যে একটা অস্বাভাবিক মনোভাব ও পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়—তাকে সহৃদয়তার সঙ্গে মানবিকতার স্পর্শ (human touch) দিয়ে প্রকাশ করা—খুব সহজ নয়। বহু জেল-সহচরের নাম এই বইতে আছে; তাঁদের মধ্যে প্রায় সবাই এখনও জীবিত। জেলে একটা অস্বাভাবিক মনোভাব ও আবেষ্টন নিয়ে বাস করতে হয়; কাজেই প্রায় প্রত্যেক রাজবন্দীই আচরণে সময় সময় একটা অস্বাভাবিকতার পরিচয় দেন। তা নিয়ে বা তার জন্য কাউকে বিদ্রূপ বা ব্যঙ্গ না ক'রেও, তাকে হাস্য-রসের উপযোগী করা যায়। ভূপেনবাবু এই পুস্তকে, তা ক'রে দেখিয়েছেন।

বিভিন্ন রাজনৈতিক মতের ও দলের লোক নিয়ে জেলে বাস করতে হয়েছে। এই পার্থক্য যে কেবল সাধারণ আলোচনা ও তর্ক-বিতর্কে-ই সীমাবদ্ধ থাকত, তা নয়; অনেক সময় গ্রাম্য দলাদলির পর্যায়ে-ও নেমে যেতো। একদল যুবক—যাদের কল্পনা-শক্তি প্রবল, যাদের প্রেরণা উদগ্র, যাদের উচ্চ আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শ প্রতিনিয়ত ব্যাহত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ছে, যাদের সেবা করার প্রবৃত্তি প্রকাশের কোন রন্ধ্র না পেয়ে আত্ম-সেবার ও স্বার্থ-সাধনের পঙ্কিলতায় ডুবে যায়—তাদের জীবনের এই করুণ দৃশ্যকে দরদ দিয়ে দেখা ও ব্যাখ্যা করা, ভূপেনবাবুর মতো দরদী লোকের পক্ষেই সম্ভব।

তাই নানাদিক থেকেই এই পুস্তকের একটা বিশেষত্ব আছে।

কয়েকজন শিক্ষাব্রতী ও সাহিত্যিক বন্ধু মুখে মুখে ভূপেনবাবুর জেল জীবনের কাহিনী প্রথমটা শোনেন। কেউ বা প্রথম ধরা পড়ার দিনের তাঁর মনের পরিচয় পেয়ে, কেউ বা ১৯১৭ সালের অনশনব্রত কি ভাবে আরম্ভ হয়, কি মনোভাব নিয়ে তিনি ৭৮ দিন উপবাসে কাটান তা শুনে দেশের যুবক সাধারণের কাজে লাগবে ব'লে সেই সব কথা লিখে প্রকাশ করতে তাঁকে পীড়াপীড়ি করেন। তারপর ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশের সময় বহু গুণগ্রাহী ব্যক্তি লেখার সুখ্যাতি করেছেন; এমন কি—এঁদের অনুরোধে-ই ভূপেনবাবু এতদূর পর্যন্ত লিখেছেন। প্রথমে দু'একটা প্রবন্ধ লিখেছিলেন; ধারাবাহিক হিসাবে চালাবার ইচ্ছা ছিল না। বিভিন্ন লোকের অনুরোধেই তিনি এতগুলি প্রবন্ধ লিখেছেন। ভূপেনবাবুর লেখার ক্ষমতায় ও বিষয়-বস্তুতে আকৃষ্ট হয়েই অনেকে এই অনুরোধ তাঁকে করেছিলেন। তা না হ'লে ভূপেনবাবুর মতো আত্ম-বিলোপী বিপ্লবী আত্ম-কাহিনী লিখতে বসতেন না।

বাংলার বিপ্লবী সাধনায় বহু লোক বহু ত্যাগ স্বীকার করেছে; বহু লোক বহু লাঞ্ছনা বরণ করেছে; বহু লোকের জীবন জ্বলে-পুড়ে খাঁক হয়ে গিয়েছে। হয়ত পৃথিবীর ইতিহাসেই এর তুলনা বিরল। আর কেউ না হক—বাঙ্গালী যেন শ্রদ্ধার সঙ্গে সে সব কাহিনী স্মরণ করে। অনেকে বেদনার ভারে ভেঙ্গে পড়েছেন, অনেকের অন্তর দুঃখের দাহনে অকালে শুকিয়ে গিয়েছে; অনেকে ব্যর্থতার ব্যথায় নিরাশাবাদী (cynic) এবং মানুষের উপর বিশ্বাসহীন (misanthrop) হয়েছেন।—আজ তাঁরা ভাঙ্গা ও পরিত্যক্ত মন্দিরের বিগ্রহের মতো লোকের খেলার দ্রব্যে পরিণত হয়েছেন।

দুঃখ ও লাঞ্ছনা ভূপেনবাবুর জীবনে যা পড়েছে, তা অনেকেই জানে না। কিন্তু ভূপেনবাবু এখনো ভেঙ্গে পড়েন নি, এখন-ও তিনি

cynic বা misanthrop হননি। আজও তাঁর সঙ্গ মানুষের মনকে নাড়া দিতে পারে ; আজও রাজনৈতিক আলোচনায় যুবকদের মন ও চিন্তাকে তিনি স্পর্শ করতে পারেন, আজ-ও তাঁর কাছে যুবকদের আহ্বান আসে বিচার-মূলক (intellectual) রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আলোচনার জন্য।

ভূপেনবাবু তত্ত্বের দিক দিয়ে ইতিহাসের এবং মানুষের অভিব্যক্তিতে এবং তারই পন্থা হিসাবে বিপ্লবেরও অভিব্যক্তিতে বিশ্বাসী। এই কারণে অন্য অনেকে যেখানে ভেঙে পড়েছেন, ভূপেনবাবু আজও সেখানে 'আপন মর্মবাণী' শুনছেন। অতীতের কাহিনীর ভিতর দিয়ে সেই মর্মবাণীই এখানে ধীরে ধীরে ফুটে উঠ্ছে।

শ্রীঅরুণচন্দ্র গুহ

সূচীপত্র

			পৃষ্ঠা
পরিচিতি (শ্রীঅরুণচন্দ্র গুহ)		...	
প্রথম যেদিন ধরা পড়ি	...	...	১
প্রথম জেলের অভিজ্ঞতা	...	...	৩২
আলিপুর জেলে	...	...	৬১
প্রথম হাঙ্গার স্ট্রাইক	...	...	৮৩
হাঙ্গার স্ট্রাইকের জের	...	...	১২৮
রাজসাহী জেলে তিন বৎসর	...	...	১৪২
দ্বিতীয় বার জেলে	...	...	২০৭
বর্মার পথে	...	...	২৩৮
বর্মার জেলে তিন বৎসর (বেসিন, মান্দালে ও থেইটমিও)	...	...	২৫৭
বর্মার জেলে তিন বৎসর (ইনসিন)	...	...	২৮১
বর্মার জেলে তিন বৎসর (ইনসিন)	...	...	৩০০
বর্মার জেলে তিন বৎসর (ইনসিন ও বেসিন)		...	৩২৩
(জেলখানায়) একটি যুগাদর্শের তিরোধান		...	৩৪
অন্তরীণে	...	...	৩৫৮

চিত্রসূচী

যতীন্দ্রনাথ (দেহাবসান) .. ১ পৃঃ সম্মুখে

কুন্তল চক্রবর্তী ... ... ১৯৮ „ „

যাদুগোপাল মুখার্জি ... ... ২১৭ „ „

চারু ঘোষ ... ... ২৫৩ „ „

জীবন চাটার্জি ... ... ২৬০ „ „

সুভাষচন্দ্র ... ... ২৮০ „ „

অরুণ গুহ ৩২৪

যতীন্দ্রনাথ (দেহাবসান)

বিপ্লবের পদচিহ্ন

প্রথম যেদিন ধরা পড়ি

ধরা তো কয়বারই পড়েছি। কিন্তু সেই প্রথম বারের কথাই বলছি।

জার্মাণী থেকে অস্ত্র এসে পৌঁছাতে পারলো না। আমেরিকা প্রবাসী চেকোশ্লোভাক বিপ্লবীরা খবর দিয়ে দিল—সমস্ত ভারত-জার্মাণ ষড়যন্ত্রটা ধরা পড়ে গেল। বালেশ্বরের হল্‌দিঘাটে যতীনদা নিহত হলেন। ও-পর্ব প্রায় শেষ হয়েই গেল।

আশা ছাড়লে আর যারই চলুক, বিপ্লবীর চলে না। 'দাদা'র মৃত্যুর পর সবাই প্রায় ভেঙ্গে পড়েছেন—আজ যেমন গান্ধীজির মৃত্যুর পর সারা দেশ। যাদুগোপাল মুখার্জি তখনও চেষ্টা করছেন। পুর্ব বন্দোবস্ত মতো স্থলপথে চীনের ভিতর দিয়ে, শ্যামের ভিতর দিয়ে, আসামের সীমান্ত দিয়ে অস্ত্র আনবার জন্য লোক গেছে, ধরা পড়েছে, অথবা যাবার বা ফিরবার পথে, বা ফিরে এসে ধরা পড়েছে। বর্মায় কিছু অস্ত্র এসে পৌঁছেছিল। তা-ও একজন পাঞ্জাবী এঞ্জিনিয়ারের বিশ্বাসঘাতকতায় ধরা পড়ে গেল।

আর প্রায় আশা করবার রইল না। কলকাতায় বসন্ত চাটার্জির হত্যা হ'ল ৩০শে জুন, ১৯১৬ সাল। ঐ দিন থেকে টেগার্ট সাহেবের

তাণ্ডব শুরু হ'ল—এতদিনের সঞ্চিত ক্রোধ ফেটে পড়লো। আমরা এটার নাম দিয়েছিলাম জুলাই বিপ্লব।

কলকাতায় এবং মফঃস্বলে কত যে লোক ধরা পড়তে লাগলো, তার আর সংখ্যা নাই। আশ্রয়ের অভাবে কতো রাজনৈতিক কর্মী রাস্তার পাশে অপরিচিত বাড়ীর বা বাজারের রোয়াকে শুয়ে থাকেন। শেষ রাতের দিকে পুলিশ এসে ধরে নিয়ে যায়। খানাতল্লাসী লেগেই আছে। রাস্তায় বের হ'লেই দু'চারটে বাড়ী চোখে পড়তো লাল-পাগড়ীতে ঘেরা, প্রায়ই মেস বাড়ী। ধরা-ধরিরও কোন হিসাব বিচার নেই।

নরেন শেঠের বাড়ীর বালিশ তোষক ছিঁড়ে ফুড়ে সমস্ত জিনিস লণ্ডভণ্ড করে ১লা জুলাই ভোরে ছেলে বুড়ো এগারটি লোককে ধরে নিয়ে গেল।

সকাল বেলায় যে বের হয়, সে যে ভাত খেতে দুপুর বেলায় ফিরবে এমন আশা অনেক ক্ষেত্রেই থাকে না। দালান্দা হাউজ ভরতি হয়ে গেল। সেখান থেকে পাঁচ দিন, সাত দিন, দশ দিনের জন্যে নিয়ে যায় কীড্ স্ট্রীট থানায় টেগার্ট সাহেবের নিজের হেফাজতে।

সে কয়দিন কাউকে দিনে রাতে বসতে বা শুতে দেবার নিয়ম ছিল না। পাশেই রুল হাতে পাহারা দেবার জন্যে পুলিশ মোতায়েন ছিল। রুল ব্যবহার না করে কোনো পাহারাওয়ালা যদি কয়েক মিনিটের জন্যে মানুষ বা ভারতীয় হয়ে পড়তো তা হলে তার চাকরি যেত।

ও-কয়দিন স্নান করতে দেবারও হুকুম ছিল না। খেতে দেওয়া হ'ত দুবেলায় দু'পয়সার মুড়িমুড়কি—মুড়কি কোথা থেকে ফরমায়েস দিয়ে আনা হ'ত জানা নেই, কিন্তু মুখে দেওয়া যেত না, এমন তিতো,

দু-পাঁচ দিনের ক্ষুধাতেও তা কারও কারও মুখে মিষ্টি হয়ে উঠ্‌তো না, ফেলে রেখে দিত।

এর উপর মিষ্টি কিছুরও ব্যবস্থা ছিল। এবং তারই জন্যে কীড্‌ ষ্ট্রীটের বাড়ীতে নিয়ে যাওয়া হ'ত। সেটা জুটত প্রায়ই রাতের বেলায়। মাঝে মাঝে টেগার্ট সাহেব নিজে এবং প্রায়শঃ বাঙ্গালী অফিসাররা মদে চুর হয়ে আসতো। মুখে ছুট্‌তো যেমন মদের দুর্গন্ধ, তেম্‌নি ভাষার।

কিল, ঘুষি, চড়, লাথি, কেশাকর্ষণ, আঙ্গুল মোচড়ানো, পেছন দিকে হাতকড়ি লাগিয়ে পিঠের উপর রুলের ঘা—এসব তো ছিল অতি সাধারণ ব্যবস্থা। নানাবিধ অসম্ভব কসরৎ করানো, পাঁচ-সাত দিনের ক্ষুৎপিপাসা-অনিদ্রাকাতর, অথবা তিন চার ডিগ্রি জ্বরে আক্রান্ত বন্দীকে নিয়ে ঘরের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে ঠেলে পনের মিনিট আধঘণ্টা ধরে টেনিস খেলা, পুরুষাঙ্গ রশি বেঁধে টানা বা রুল দিয়ে থ্যাঁৎলানো, মলদ্বারে রুল ঢোকাবার চেষ্টা, কমোড্‌ প্যান থেকে মলমূত্র মাথায়, মুখে, সর্বাঙ্গে ঢেলে দেওয়া এবং তার পর, দিনের পর দিন জলের সংস্পর্শ থেকে বঞ্চিত করে রাখা—ইত্যাদি যতরকমের ধর্ষকাম (sadist) জুলুমবাজির কল্পনা করা চলে বা কল্পনা করাও চলে না, তেম্‌নি সব অভিনয় হ'ত, কোনো কোনো ক্ষেত্রে সারারাত ধরে, অথবা বন্দী জ্ঞান না হারানো পর্যন্ত।

ফলে কেউ কেউ ভেঙে পড়ে, এবং স্বীকারোক্তি করে। কিন্তু যত লোক স্বীকারোক্তি করে, তার চেয়ে অনেক বেশী করে রটে যায়। রটানোটাও স্নায়ুর উপর কাজ করার উদ্দেশ্যে। সে কথা আজ বুঝি। তখন অবাক হয়ে ভাবতাম, যে-সব লোকের কথা রটছে, তারা কি করে স্বীকারোক্তি করতে পারে—জুলুম যতো প্রচণ্ডই হোক্।

চারদিকে একটা হতাশায় থমথমে ভাব। ভয়ে সব জড়োসড়ো। এদেশে অমন ব্যাপক ধরপাকড়, তার সঙ্গে অত জুলুমবাজি—সে-ই তো প্রথম।

এই সব স্বীকারোক্তির ফলে আমিও পাছে ধরা পড়ে যাই—চন্দননগর থেকে অতুল ঘোষ বলে পাঠালেন কলেজ ছেড়ে সরে পড়তে। দল গঠন ও পরিচালনার কাজে অতুলদা ছিলেন যতীনদার দক্ষিণ হস্ত। তখন তিনি পলাতক—ভারত-জার্মাণ ষড়যন্ত্রে যে কয়জনের নামে মোটা মোটা পুরস্কার ঘোষণা হয়েছে, তাঁদের ভিতর একজন। কলকাতায় আসা-যাওয়া তাঁর পক্ষে প্রায় অসম্ভব। সতীশ চক্রবর্তী আমায় জানালেন অতুলদার নির্দেশের কথা। সতীশদা তখনও ঘোরা-ফেরা করেন—কিন্তু অতি সাবধানে। আর, পলাতকের পক্ষে সাবধানতা অবলম্বনের কায়দাকানুনে আমাদের ভিতর যাদুদার পরেই ছিলেন সতীশদা।

কলেজ ছেড়ে দিয়ে পলাতক হওয়া স্থির করলাম। কিন্তু বাধা ছিল। অতুলদার সঙ্গে চন্দননগরে দেখা করে সব বললাম।

সেই বছরেই একটা মেস করেছিলাম। আমার সঙ্গে বাড়ীর ভাড়াটে ছিলেন ফরিদপুরের অমৃত গুপ্ত। শ্রীযুত মাখনলাল সেনের প্রভাবে তখন তিনি ধর্মজীবনের দিকে ঝুঁকে পড়েছেন, রাজনীতি প্রায় ছেড়েই দিয়েছেন। তবু সেবারে ধরা পড়া থেকে বাঁচেন নাই। এবং পরে যক্ষ্মারোগে তাঁর মৃত্যু হয়।

মেসটাকে প্রায় আমাদের দলের লোক দিয়েই ভরে ফেলেছিলাম। মেঘনাথ সাহা, শিশির মিত্র, শৈলেন ঘোষ, যতীন শেঠ, জ্ঞান মুখার্জি, জ্ঞান ঘোষ প্রভৃতি যাঁরা তখনকার দিনে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজ গড়ে তুলতে স্যার আশুতোষ মুখার্জিকে সাহায্য করছিলেন, তাঁদের

আটজন এই মেসে সীট্ নিয়েছিলেন। এঁরা প্রায় সবাই যতীনদা এবং শশীদার (শ্রমজীবী শিক্ষার প্রবর্তক শশিভূষণ রায় চৌধুরী) সঙ্গে মিশতেন, কেউ কেউ ভারত-জার্মাণ ষড়যন্ত্রে অংশ নিয়েছিলেন, যতীনদার পুর্ণোদ্যম কার্যকলাপের সময় ১১০নং কলেজ স্ট্রীটে নীলরতন ধরের মেসে তাঁর যে আড্ডা ছিল, সেখানে, হিন্দু হোষ্টেলে এবং আরও অন্যত্র ঘনিষ্ঠভাবে যাওয়া আসা করতেন, কেউ কেউ বা ঐ সব জায়গাতেই থাকতেন।

ইতিমধ্যে শৈলেন ঘোষ আমেরিকায় যাবার পাসপোর্ট পেয়েছেন। পাসপোর্ট পাবার পরে তিনি একবার দৌলতপুর, নড়াল ইত্যাদি অঞ্চল বেড়াতে যান। এসব অঞ্চলে তখন যতীনদার সহকর্মীরা বেশ কর্মচঞ্চল। শৈলেন ঘোষের পাসপোর্ট বাতিল হয়ে গেল। তার পর তাঁর আত্মীয় পরিচয়ে নলিনী মজুমদার (তখন আই. বি.র সাব-ইনস্পেক্টার) আমার মেসে একদিন তাঁকে খুঁজতে এলেন। লক্ষণ ভাল নয় বুঝে যতীন শেঠের কাছে ওঁদের আটজনের সীট ভাড়ার টাকাটা ফেরত দিয়ে এলাম—বলে এলাম, ও-মেসে এখন এঁদের যাওয়া বুদ্ধির কাজ হবে না। মেসের সীট ভরত্তি করা, বাড়ী ভাড়ার টাকা আদায় ক'রে বাড়ীওয়ালার দেনা মেটানো ইত্যাদি দায় তখন ঘাড়ে।

নিজে তখন আর নিজের মেসে থাকি না। ফরিদপুরের ইন্দু সরকার এক মেস করেন, সেখানে হেমেনদার (বর্তমানে ডাক্তার—ষ্ট্যাণ্ডার্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস্-এর ডিরেক্টর) সঙ্গে রাত কাটাই। দিনের বেলায় দু'একবার গিয়ে মেসের দায় মিটাতে চেষ্টা করি। যা নিজে না পারি, আশুদার (টাকি সৈদপুরের আশুতোষ রায় চৌধুরী) ঘাড়ে চাপাই।

ইতিমধ্যে সতীশদাকে এক রাত্রে শালখের এক বাড়ীতে ঘিরে

ফেললো। তিনি গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়লেন। পুকুর ধার দিয়ে ছুটতে গিয়ে অন্ধকারে দেখতে পান নাই, ঘোড়ার পিঠে থেকে কোনো ইউরোপিয়ান পুলিশ মারলে তাঁর বুকে এক লাথি। হাতের রিভলবার ছিটকে পড়ে গেল, নিজেও পড়ে গিয়ে ভাবলেন, ধরাই পড়ে গেলেন—পকেটে ছিল পটাসিয়াম সায়ানাইড্, খেয়ে ফেললেন। কিন্তু পালালেন। ভাগ্যে সায়ানাইড্টা গুঁড়ো (oxidized) হয়ে গিয়েছিল। জীবনে বেঁচে গেলেন, কিন্তু চমৎকার স্বাস্থ্যটি সারাজীবনের মতো হারালেন।

এই ঘটনাকে উপলক্ষ্য করে পরদিন মেহেরপুরের রাজেন পালকে ধরলো সেণ্ট জেভিয়ার কলেজে। রাজেন থাকতেন আমার মেসে, তাঁর সীট তল্লাসী হ'ল। দু'এক দিনের মধ্যেই কুমিল্লার গ্রেপ্তারী পরোয়ানায় অশ্বিনী ভট্টাচার্য ধরা পড়লেন আমার মেসে। প্রথম শৈলেন ঘোষ, তারপর রাজেন পাল, তারপর অশ্বিনী ভট্টচার্য—পুলিশ বুঝলো, মেসটি একটি আড্ডা। দৈনন্দিন দৌরাত্ম্য শুরু হ'ল। আজ একে ধরে, কাল ওর জবানবন্দী নেয়, পরশু ওর সীট তল্লাসী করে। আমার খোঁজ শুরু হ'ল। আমি ওমুখো হওয়া ছেড়ে দিলাম। কিন্তু তখনও আধা পলাতক।

বিপদে পড়লাম অন্যভাবে। কুন্তলও (মনোজ বসুর "ভুলি নাই" উপন্যাসের নায়ক কুন্তল—সরকার নয়—চক্রবর্তী) প্রায় এই সময়েই পলাতক হলেন। অতুলদা তাঁর জন্যে চন্দননগরে একটা মাষ্টারি যোগাড় করেছেন—একখানা অন্য নামের সার্টিফিকেট চাই। আমায় বললেন কলেজের ট্রান্সফার সার্টিফিকেট নিতে।

কলেজে অধ্যাপকদের প্রিয়পাত্র ছিলাম। সুভাষ তখন ওটেন-পর্ব শেষ করে বেরিয়ে পড়েছেন। ডাঃ আদিত্য মুখার্জি রোল ডাকতে

ডাকতে একদিন বললেন, **Master Dutta is also giving us the slip.**

কিন্তু প্রেসিডেন্সিতে পড়তাম শুধু অনার্স ক্লাসে। আমাকে ট্রান্সফার সার্টিফিকেট নিতে হবে সংস্কৃত কলেজ থেকে। ডাঃ মহেন্দ্র সরকার খুব স্নেহ করতেন। জিজ্ঞাসা করলেন, কেন সার্টিফিকেট নেবে ?

অতখানি স্নেহ যিনি করেন তাঁর কাছে মিথ্যা বলতে আটকায়। কিন্তু জীবন তখন অন্য সত্যে ভরপুর, আপ্লুত—বলি, বাড়ীতে বাবার অসুখ, তাঁর কাছে থাকতে হবে।

বলেই কিন্তু তাঁর চোখের থেকে চোখ সরিয়ে ফেলি। তার পরের পরীক্ষা প্রিন্সিপালের কাছে। প্রিন্সিপাল তখন ডাঃ সতীশ বিদ্যাভূষণ। তিনি বলেন, যতদিন তোমার বাবার অসুখ থাকবে, ততদিন তুমি তাঁর কাছে থাক, সার্টিফিকেট তোমায় দেব না।

আমিও নাছোড়বান্দা। দু'তিন দিন ঘুরি। এদিকে আমাকে ধরবার মতো জানা ঠিকানা পুলিশের কাছে তখন শুধু ঐ কলেজেরই। সুতরাং সন্তর্পণে যাই আসি। অবশেষে সার্টিফিকেট নিয়েই বেরিয়ে পড়ি।

তখন থেকে প্রায়ই আমি চন্দননগরে—কখনও কুন্তলের বাড়ীতে, কখনও অতুলদার বাড়ীতে, কখনও সুরেশ দাসের বাড়ীতে, কখনও খুলনার সুরেন কুশারি একখানা বাড়ী নিয়েছিলেন, সেখানে। মাঝে মাঝেই বাড়ী বদল করার প্রয়োজন হ'ত। নিজেও একখানা বাড়ী নিয়েছিলাম। কলকাতাতেও পর পর কয়েকখানা বাড়ী নেওয়া হয়েছিল।

আমরা কয়েকজন তখন পলাতক বটে, কিন্তু ঘুরে ফিরে বেড়াই—আমি, কুন্তল চক্রবর্তী, চারু ঘোষ, সুরেন কুশারি, জীবন চাটার্জি,

সুরেশ দাস। তখনকার মতো কাজ আমাদের প্রায় ফুরিয়ে গেছে—বিদেশ থেকে অস্ত্রপাতি আসবার আশা আর নেই, ধরপাকড়ে কলকাতায় এবং জেলায় জেলায় দলবলও ভেঙে পড়েছে। বলতে গেলে, আমাদের কাজ হয়ে পড়েছে, প্রধান প্রধান পলাতক কয়েকজনকে রক্ষা করা—এঁদের মধ্যে আছেন তখন যাদুগোপাল মুখার্জি, অতুল ঘোষ, অমরেন্দ্র চাটার্জি, সতীশ চক্রবর্তী, নলিনী কর, মন্মথ বিশ্বাস (লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় ফাঁসি যান বসন্ত বিশ্বাস, তাঁর ভাই), ও পাঁচুগোপাল ব্যানার্জি। এঁদের বাঁচিয়ে রাখা তখন বিপ্লবীদলের মর্যাদার প্রশ্নে দাঁড়িয়ে গেছে। পুলিশও এঁদের না ধরতে পারলে আর সোয়াস্তি পাচ্ছে না।

কলকাতায় ক্রমাগত তাড়া খেতে খেতে শেষ পর্যন্ত আমাদের প্রায় একমাত্র আশ্রয়স্থল দাঁড়িয়েছে তিলজলা রেলওয়ে ক্যাবিনের দেবেন ঘোষের বাড়ী। ইনি সেই বিখ্যাত সিন্ধুবালার স্বামী—যে সিন্ধুবালার নাম পেয়ে পুলিশ বাঁকুড়া জেলা থেকে দুই সিন্ধুবালাকে ধরে এনেছিল, তার ফলে সে সময় খুব হৈ চৈ হয়।

চন্দননগরে বিরাট তোড়জোড় করে এক খানাতল্লাসী হয়। যাদুগোপাল মুখার্জি ও নলিনী কর প্রথমটা প্রায়ই থাকতেন পুর্ববঙ্গে, আসামে, ভুটান প্রান্তে। সে সময় তাঁরাও এসেছেন। অনুশীলন দলেরও কয়েকজন নেতা অন্যত্র থেকে তাড়া খেয়ে চন্দননগরে এসে জমেছেন। এঁরা প্রায় সব একসঙ্গেই আছেন। পুলিশ কোনোরকমে খবর পেয়েছে। ট্রেনে করে তো এসেছেই, গঙ্গার পথও বাদ যায় নাই, কয়েক লঞ্চ ভরতি করে এসেছে।

অতুল ঘোষ অনেক দিন চন্দননগরে থাকার ফলে সরকারী মহলের সঙ্গে এমন যোগাযোগ দাঁড়িয়েছিল যে, শেষরাত্রের দিকে

কোনো থানাতল্লাসীর সম্ভাবনা থাকলে সন্ধ্যারাত্রে তাঁর কাছে খবর পৌঁছে যেত। সারাদিন ঘরে বন্ধ থেকে বাইরের যা' কিছু কাজকর্ম, তার জন্য এই সময়টায়ই বের হতেন। এইভাবে খবর পেয়ে তিনি একবার কুন্তলকে চন্দননগর হাসপাতালের গেট টপকে উদ্ধার করেছিলেন। সেইবারেই কুন্তলের থাইসিস্‌ ধরা পড়ে। এবং চন্দন নগরের সিভিল সার্জনের বিশেষ চেষ্টায় যত্নে তখন সুস্থ হয়ে উঠছিলেন।

এবারে যেমন খবর পাওয়া গেল যে তল্লাসী হবে, সতীশদা অনুশীলনের দু'একজনকে নিয়ে চন্দননগরের গঙ্গার ঘাটে গিয়ে বসলেন। পটাসিয়াম সায়ানাইড্‌ খাওয়ার পর থেকে রাতে প্রায় তাঁর ঘুম হ'ত না, আর এই ধরনের কাজে তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন।

খবর দিলেন, ব্যাপার গুরুতর। তখন পলাতকদের আড্ডাগুলো কতক ঘিরেছে, কতকগুলোর চারপাশ দিয়ে ঘন ঘন সাইকেল ঘুরছে। এঁরা তখন দশজনই এক বাড়ীতে এসে জমেছেন।

এক মিনিটের মধ্যে তৈরী হয়ে যাদুগোপাল মুখার্জি বেরিয়ে পড়লেন, পেছনে পেছনে আর সবাই। সবাই সশস্ত্র। পুলিশ বেশ টের পেল, এই পালাচ্ছে। কিন্তু এমন সাহস ওদের হ'ল না যে তাড়া করে ধরে।

অমরদা আর অতুলদা সহরেই এক বাড়ীতে কোনো রকমে রয়ে গেলেন—বাইরে ঘুরে বেড়াবার পক্ষে দু'জনেরই চেহারা তখন অনুকূল নয়।

বাদবাকীরা ফরাসী রাজ্যের সীমা পেরিয়ে দূরে এক মাঠের পাশে ঝোঁপের কাছে আশ্রয় নিলেন। সমস্ত দিন এঁরা মাঠে মাঠে সেটেলমেণ্ট অফিসার হয়ে কাটিয়ে দিয়ে সন্ধ্যা নামতে আবার চন্দননগরে ঢুকে পড়লেন।

পুলিশ ইতিমধ্যে বিফলমনোরথ হয়ে ফিরে গেল।

আমি সেদিন ছিলাম কলকাতায়। বেলা নয়টা আন্দাজ অতুলদার কাছ থেকে খবর পৌঁছাল যেমন করে পারি হাজার দেড়েক টাকা নিয়ে সন্ধ্যার মধ্যে চন্দননগর পৌঁছাতে হবে—পলাতকদের আশ্রয় নাই, অন্যত্র পার করে দিতে হবে।

তখনকার দিনে সম্বল আমাদের স্কুল কলেজ—সে মহলে আমি নামকরা ভিখারী। কিন্তু তখন স্কুল কলেজেরও ছুটি। গেলাম বজবজে অতুলদার বড়দার কাছে। শোনামাত্র পাগলের মতো ছুটে হাতের কাছে যা পেলেন দিলেন—হ'ল ছশ' টাকা। আর যেখান থেকে যা পেলাম নিয়ে রাত্রে চন্দননগরে পৌঁছালাম।

তেলজলা: দেবেন ঘোষের মারফত বাংলার বিভিন্ন জংশন ষ্টেশনে আমার কতকগুলি পরিচিত রেল কর্মচারী জুটেছিলেন। তাঁদের একজনের সাহায্যে নলিনী ঘোষ আর প্রভাস লাহিড়িকে ব্যাণ্ডেল থেকে গৌহাটির দিকে পার করলাম।

যাদুদার সুদীর্ঘ দাড়ির উপর মাথায় একটি ফেজ পরলে এবং তাঁর পেছনে টুপি মাথায়, সুর মুখে, গামছা কাঁধে, মাদুর বগলে এবং ফর্সিহুকো হাতে নিয়ে নলিনীদা দাঁড়ালে পরিচিত লোকেও তাঁদের চিনতে পারতো না—যাদুদা সব সময়ে একভাবে পা ফেলে চলবার অভ্যাস ছেড়ে দিয়েছিলেন। কাজেই তাঁদের পার করতে কারও সাহায্যের দরকার হ'ল না।

সতীশদাও 'মোটাদা'কে (মন্মথ বিশ্বাস) নিয়ে যে কোথায় উবে গেলেন তা কেউ টেরও পেল না। অতুলদা নিজের চেষ্টায় চন্দননগরে স্থান করে নিয়ে শেষ পর্যন্তই কাটিয়ে দেন।

কিন্তু মুস্কিল হ'ল অমরদাকে নিয়ে। সুদীর্ঘ গৌরকান্তি পুরুষ,

দীর্ঘ শ্মশ্রুকেশের সমাবেশে তখনকার দিনে এমনই তাঁর চেহারা দাঁড়িয়েছিল যে রাস্তায় লোকে দেখলে তাকিয়ে থাকতো। তার উপর পরিচিতের তাঁর কোথাও অভাব নেই। কিন্তু তাঁকে নিয়ে বিপদের কথা পরে বলছি।

অনুশীলনের নেতাদের মধ্যে একজন ছিলেন কানাই (কৃষ্ণ) সাহা। অতুলদা বললেন, ওঁদের একজন শ্রেষ্ঠ নেতা, অপর দলের লোক, তার উপর এঁর বিরুদ্ধে অনেকগুলি হত্যা ও ডাকাতির চার্জ। তোমাদের সব চাইতে নিরাপদ যা আশ্রয়স্থল আছে, সেখানে রাখবে।

তখন আমাদের সব চাইতে নিরাপদ আশ্রয় ঐ দেবেন ঘোষের বাড়ী। ওঁকে এনে রাখলাম ঐ বাড়ীর দোতলার ঘরে দেবেনবাবুর সঙ্গে। আমি আর কুন্তল সশস্ত্র হয়ে থাকি নীচের তলার ঘরে।

কিন্তু এঁকে নিয়ে আমরা বিপদে পড়লাম। ভদ্রলোকের তখনই বেশ খানিকটা অধোগতি হয়েছে। পয়তাল্লিশ টাকা মাইনের রেলওয়ে কর্মচারীর বেকার ভাই পরিচয়ে ওখানে থাকেন, ঢাকাই তাঁতের ধুতি, আদ্দির পাঞ্জাবী ছাড়া পরেন না, হাতের দুতিনটে আঙুলে জড়োয়া আংটি। অথচ থাকতে হয় অন্যান্য রেল-কর্মচারীদের সঙ্গে পাশাপাশি। রাত্রে একজন সহকর্মী আসেন, দামী জামাকাপড় রুমাল এসেন্স দিয়ে যান। নিজে কাউকে সঙ্গে নিয়ে সন্ধ্যাবেলা ভিক্টোরিয়া ক'রে বের হন—অনেক রাতে ফেরেন মাংস, ল্যাংড়া আম, সন্দেশ নিয়ে।

কুন্তল বলেন, লক্ষণ ভাল নয়—এ শেষ পর্যন্ত অনেক অনর্থ করবে। আমরা কিছু বলতে সাহস করিনে, কারণ অপর দলের লোক। আভাসে ইঙ্গিতে যা বলি, তা'তে কোনো সাড়া তো পাই-ই না, বরং তিনি যে একজন নেতা, তা-ই বুঝিয়ে দেন। দেবেন ঘোষ

অতি সৎ এবং নিষ্ঠাবান লোক, আমাদের উপর অগাধ শ্রদ্ধা। কতোদিন শুধু একবাটি ফেন নিয়ে ভাত খেতে বসেছেন, আমি বা কুন্তল বা জীবন কেউ গিয়ে পড়েছি—ভাতের থালাটি সরিয়ে দিয়ে বাজারে গেছেন দু'পয়সার চিঁড়ে কিনতে। তা-ই নুন আর তেঁতুল মেখে খেয়েছেন। কানাইয়ের এসব তাঁর ভাল লাগে না। কিন্তু "দেবী চৌধুরাণীর" শিক্ষামতো ভাবেন, বুঝি দোকানদারী।

কুন্তলের কথাই সত্যি হয়েছিল। ধরা পড়ার আগে এবং পরে ইনি অনেক অনর্থ ঘটিয়েছিলেন। সমস্ত অনুশীলন দলটিকে সর্বস্বান্ত করেছিলেন—এমনকি জেলে বসে নতুন-ধরা-পড়া বন্ধুদের কাছ থেকে খবর সংগ্রহ করে বহুলোককে ধরিয়ে দিয়েছিলেন।

গোদের উপর বিষ ফোঁড়া। অতুলদা আবার খবর পাঠালেন, অমরদাকে যাঁদের কাছে রেখেছিলেন, তাঁরা আর একদিনও তাঁকে রাখবেন না, সেই দিনই তাঁকে নিয়ে আসতে হবে। ঐ কয়দিন তাঁকে শেষরাতে তুলে পায়খানা স্নান করিয়ে কিছু খাইয়ে একটা ঘরে তালা দিয়ে দিতেন। ঘরের বারান্দায় সারাদিন ধরে স্কুল বসতো, অর্থাৎ একটু জোরে নিঃশ্বাস ফেল্‌লে বা কাশি দিলেই সর্বনাশ। আবার রাত বেশী হলে ঘর থেকে বের করে কিছু খাবার দাবার দিতেন। সেকালে অরবিন্দের যে কয়জন সহচর জুটেছিলেন, এরকম ভাবে তাঁরাই শুধু কাটাতে পারতেন। যাদুদাকেও দেখেছি অনেক সময় সারাদিন ধরে ধ্যানস্থ হয়ে বসে কাটিয়ে দিতেন।

এ ভাবে হোক্, যে ভাবে হোক্, অমরদাকে পনের দিন রাখবার কথা ছিল। তার জন্য ছ'শ' টাকাও নিয়েছিলেন। কিন্তু চার দিনের দিন বললেন, আর একদিনও নয়। কুন্তল গেলেন অমরদাকে আনতে। বারাকপুরে অমরদার এক আত্মীয় ছিলেন—

নৌকো করে সেখানে গেলেন, আত্মীয় ওঁকে রাখতে অস্বীকার করলেন। গেলেন দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে। চেহারা দেখে লোকের ভিড় জমে যায়। তখন এক ঘোড়ার গাড়ী করে দুজন রওয়ানা হলেন শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনের দিকে।

স্থান ও সময় বুঝে গাড়ীখানি ভেঙে পড়লো। বেলা সাড়ে দশটা এগারটায় যখন ডেইলি প্যাসেঞ্জারের ভিড়, তখন অমর চাটার্জি ঐ চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে হাওড়ার পুলে। ও-অঞ্চল থেকে যারা আসে অমর চাটার্জি তাদের অনেকের পরিচিত। যা-ই হোক্, কুন্তল আবার গাড়ী ঠিক করে বোটানিক্যাল গার্ডেনে গিয়ে সমস্ত দিন কাটালেন। রাতের বেলায় এসে উপস্থিত ঐ দেবেন ঘোষের বাড়ীতে। আর উপায় নেই।

কানাই সাহা ইতিমধ্যে আরও এগিয়েছেন। রাস্তা থেকে উৎকলবাসী এক একজনকে ধরে নিয়ে আসেন, দুটো চারটে পয়সা দেন, গা টিপে দিয়ে যায়। উৎকলবাসী আসন-করে-বসা অমর চাটার্জির দিকে ফিরে ফিরে তাকায়, আর সংকুচিত হয়ে যায়। আমরা সংকুচিত হয়ে পড়ি, পাছে বাইরে গিয়ে গল্প করে।

অমরদার জন্যে তখন দুইদিকে চেষ্টা করছি। এক, কলকাতাতেই একখানা উপযুক্তমতো বাড়ী ভাড়া করে সেখানে সরানো। আর, শৈলেন ঘোষকে আমেরিকায় পাঠান হয়েছিল যার সহায়তায়, তাকে দিয়ে অমরদাকেও বাইরে পাঠিয়ে দেওয়া।

এই লোকটির নাম রামগোপাল দত্ত, শৈলেন ঘোষের আত্মীয়, খিদিরপুর ডকে চাকুরি করে। সে অমরদার জন্যে একটা জাহাজে চেষ্টা করে। হয়ে উঠ্‌লো না। পরে আর একটা জাহাজে চেষ্টা করবে। ইতিমধ্যে খিদিরপুর অঞ্চলেই একখানা বাড়ীর চেষ্টা করতে

থাক্‌লো, জাহাজে উঠবার আগে যেন যতোদিন প্রয়োজন সেখানে গিয়ে থাকতে পারেন।

আমরাও এদিকে নিশ্চিন্ত থাকতে পারিনি। সেদিন কুন্তল ও আমি দুপুরে বেরিয়ে ওদিকে শ্রীরামপুর, রিষড়া, কোন্নগর অঞ্চলে সুবিধামতো বাড়ী খুঁজলাম, পেলাম না, পরে ব্যারাকপুরের এদিকে খুঁজে কলকাতাতেও দু'একজনের কাছে খোঁজ নিয়ে ক্লান্ত হয়ে যখন বাড়ী ফিরলাম তখন রাত বারোটা। ইতিমধ্যে কানাইয়ের সেই সহচরটি এসেছেন। তাঁকে বিদায় করে খেয়ে দেয়ে শুতে রাত আড়াইটা হয়ে গেল।

বড় পিসি শুয়ে ছিলেন পাশের একটা গুদামমতো ঘরে, সঙ্গে তাঁর ছোট্ট একটি পালিত পুত্র। এই বড় পিসি আর ছোট পিসি আমাদের আশ্রয়দাত্রী, আমাদের পলাতক জীবনের মা। এঁদের কাহিনী আর একবার বলব।

হঠাৎ রাত সাড়ে তিনটায় পিসিমা চীৎকার করে উঠলেন। রিভলভার হাতে আমি আর কুন্তল বেরিয়ে আসতে বল্‌লেন, জানালায় দেখলাম মানুষ।

উপরে অমরদা আর কানাই, নীচে আমি আর কুন্তল চারজনেই পলাতক। উদ্বেগ তখনকার দিনে লেগেই আছে। চারদিক ঘুরে এলাম। কোথাও লোকজনের কোনো চিহ্ন দেখলাম না। কিন্তু এর পর আর ঘুমও এল না। অর্থাৎ অত ক্লান্তির পর সারারাত প্রায় ঘুম হ'ল না।

ভোরে শ্রীশবাবুকে নিয়ে আসবার কথা। ঢাকার শ্রীশ চাটার্জিকে কলকাতায় খবর দিয়ে আনা হয়েছে। এতগুলি পলাতক, খরচ কম নয়। সি. আর. দাস, সুরেন হালদার, বি. সি. চাটার্জি ইত্যাদির

সঙ্গে বন্দোবস্ত করে দিয়ে যাবেন যাতে আমরা এঁদের কাছ থেকে সাহায্য পাই।

কথাবার্তা হয়ে গেল। শ্রীশবাবুকে বাসায় পৌঁছে দিয়ে আরও দু'একটা কাজ সেরে বাড়ী থেকে খাওয়া দাওয়া করে বের হব। কথা ছিল সেইদিনই রামগোপালের সঙ্গে কথাবার্তা পাকা করে ফেলতে হবে। এবং তারপর অমরদাকে তার আশ্রয়ে রেখে আমি গৌহাটি চলে যাব। এই সময়ে পুলিশ আমায় ধরবার জন্যে উঠে পড়ে লেগে গেছে—চারদিকেই খবর পাই। বন্ধুবান্ধবও অনেককে ধরেছে। যাদুদার নির্দেশ, কর্মঠভাবে পলাতকের জীবন যাপন করা আমার আর চলবে না, আমি যেন আগামী শনিবারেই তাঁর ওখানে চলে যাই।

ইতিমধ্যে অমরদার ব্যবস্থা করতে হবে। রামগোপালের সাহায্য নিয়ে তাঁকে জাহাজে তুলে দেওয়া এক কথা, আর তার আশ্রয়ে তাঁকে রাখা ভিন্ন কথা। এটা আমি পছন্দ করি নাই বলেই আগের দিন অত ঘোরাফেরা করেছি অমরদার আশ্রয়ের জন্য একটা বাড়ী খুঁজতে। বাড়ী যখন নেহাৎই পাওয়া গেল না, তখন রামগোপালের সাথেই ব্যবস্থা করতে হবে, অমরদা ও কুন্তলের সঙ্গে পরামর্শ করে সেই সিদ্ধান্তই হ'ল। অমরদা ভগবানে বিশ্বাসী, তাঁর উপর নির্ভর করতেই বললেন।

আদেশ নির্দেশ সেদিন অনেকগুলিরই ব্যতিক্রম হ'ল। অতুলদা বিষ্যুৎবারের বারবেলাকে বরাবর ডরাতেন। সেবারে চন্দনগর থেকে বেরিয়ে আসি বিষ্যুৎবারের বারবেলায়। বললেন, ত্যাখ্‌রে আজ না গেলেই পারতিস্‌, আমি একটু হেসে চলে এলাম।

যাদুদার নির্দেশ ছিল, গৌহাটি যাবার আগে যেন কখনও দিনের বেলায় না বের হই, পায়ে হেটে না বের হই, একা যেন না বের হই,

সশস্ত্র থাকলেও আর একজন সশস্ত্র লোক যেন সঙ্গে থাকে। এছাড়া আমার নিজের প্রতি নিজের একটা নির্দেশ ছিল। রামগোপালের মতো লোক, যারা আমাদের ঠিক দলের লোক নয়, এবং খুব বিশ্বাস যাদের করতে পারিনে, তাদের সঙ্গে কথা দিয়ে কথা না রাখতেই চেষ্টা করতাম—যদি বলতাম শনিবার আসব, তা হলে শুক্রবার যেতাম, সন্ধ্যার কথা বলে ভোরে যেতাম।

সেদিন সব আদেশ নির্দেশেরই ব্যতিক্রম হ'ল—সময় হাতে কম, এই জন্যে। দুপুরের পর অমরদার সাথে কথা বলছিলাম, কানাই পাশে শুয়ে, কুন্তল মেঝেয় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে।

রামগোপালের ওখানে যাব, কুন্তল সাথে থাকবে, সেখান থেকেই ওকে নিয়ে সন্ধ্যার দিকে চন্দননগর চলে যাব শিয়ালদ' শ্যামনগর হয়ে।

কুন্তলকে কয়েকবার ডাকলাম, অকাতরে ঘুমোচ্ছে। ওর যখন ঘুম ভাঙলো না, আমি উঠে জামা পরছি দেখে অমরদা বললেন, একাই বের হবে? বল্‌লাম, এই সেদিন ও হাসপাতাল থেকে বেরিয়েছে, কাল সমস্ত দিন খুব পরিশ্রম গেছে, রাতে ঘুম প্রায় হয় নাই। ও থাক্‌, ঘুমোক্‌। ওকে বলবেন বিকেলে ঠিক সাড়ে পাঁচটার সময় যেন ক্যাম্বেল হাসপাতালের দরজায় থাকে, সেখান থেকে ওকে নিয়ে চন্দননগর যাব। হাসপাতালের দরজায় কোথায় দাঁড়াতে হবে, তা ও জানে।

হাতে টাকা কম—ট্রামে করে খিদিরপুরে গেলাম। রামগোপালের ওখানে ঢুকতে সবই কেমন একটু নতুন নতুন মনে হ'ল। অন্য কোনোদিন দেখি নাই, সেদিন দেখলাম তেতলার দরজায় দারোয়ানের কাছে একটি দাড়িওয়ালা লোক কে বসে আছে। তার আমার দিকে তাকানোর ধরনটা ভাল লাগলো না।

রামগোপালের নিজেরও বেশ একটা ভাবান্তর লক্ষ্য করলাম। অন্যদিন তাকে দেখি খুব ফিট্‌ফাট, আজ মনে হ'ল কেমন একটা উস্কোখুস্কো ভাব, যেন স্নানও করে নাই। অন্যদিন আমায় দেখলেই উঠে আসে, বাইরে একটা বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াই, সেখানেই কথাবার্তা হয়।

এদিন ও যেন মুখ তুলেও তাকাতে পারলো না। জিজ্ঞেস করলাম, অসুখ করেছে? বললে, না। যা বল্‌লো, তার অর্থ, বাসার কোনো সুবিধা করতে পারে নাই।

বেরিয়ে এলাম। ডক থেকে বের হবার ওদিককার রেলিংঘেরা পথটা এমন যে তিনচারটা রেলিং ছাড়িয়ে যদি কোনো লোক আমার গতিবিধির উপর লক্ষ্য রেখে আসে, আমার পক্ষে তা টের পাওয়া শক্ত।

এসে ট্রামের ফার্ষ্ট ক্লাসে বসেছি। ওয়াটগঞ্জের মোড় থেকে চার-পাঁচজন সাধারণ পুলিশ কনষ্টেবল সেকেণ্ড ক্লাসে উঠলো। অমন তো কতো পাহারাওয়ালাই ওঠে। তখন কিছু গ্রাহ্য করিনি।

এসপ্লানেডে নেমেছি। চারু তখন চন্দননগর হাসপাতালে শয্যাগত—থাইসিসের সন্দেহ আগে থেকেই ছিল, তার উপর পিঠে একটা গুলি লেগেছে। চন্দননগরের সেই সিভিল সার্জন যিনি আগে কুন্তলের চিকিৎসা করেছিলেন, তাঁরই চিকিৎসায় সেই হাসপাতালেই চারুকে রাখা হয়েছে। তাঁর জন্যে কিছু ফল নিয়ে যেতে হবে। হগ্ মার্কেটের দিকে এগিয়ে চলেছি। পেছনে শুনি কতক-গুলি ভারি জুতোর শব্দ।

পেছন ফিরে তাকাবার সঙ্গে সঙ্গে ঝাপ্‌টে ধরেছে। কয়েকদিন আগে ডান হাতের পাতার পেছনে একটা গুলি লেগেছিল, গুলিটা হাতের পাতা ফুঁড়ে হাতের রিভলভারের বাটের ভিতর ঢুকে

গিয়েছিল। হাতটা তখন ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। গলায় একটা সিল্কের চাদর পরি, তারই তলায় ব্যাণ্ডেজটা ঢেকে রাখি।

পুলিশ ঝাপ্‌টে ধরার সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়লো বাঁদিককার পকেটে একজন ডাচ্ কন্সালের একখানা চিঠি আছে। সেটা গৌহাটিতে যাদুদার কাছে নিয়ে যেতে হবে বলে কাছে রেখে দিয়েছি। তা'তে তখন আর অনিষ্ট করার মতো কিছু ছিল না। তবু সেটাকে নষ্ট করারই প্রবৃত্তি হ'ল অভ্যাস অনুযায়ী। ব্যাণ্ডেজকরা ডান হাতে রিভলবার বের করতে চেষ্টা করলাম। দেখলাম, এমন করে ধরেছে দুটোর একটাও বের করা শক্ত।

তখন মাটিতে পড়ে চেষ্টা করছি, কাপড়ের ভিতরই যদি রিভলভারটার একটা আওয়াজ করতে পারি—এক মুহূর্তের জন্যে আঁৎকে উঠে যদি হাতগুলো একটু ঢিলে ক'রে দেয়। সেফটিটা সরিয়েছি, ট্রিগারও ঠিকই ধরেছি। কাপড়েই আটকে গেল, কি, কি হ'ল, ট্রিগার আর কিছুতেই পড়লো না। অথচ সেটা খুব ভাল রিভলভারই ছিল।

এস্‌প্লানেডের মোড়। বহু পুলিশ এসে জমে গেল। আমি ক্রমাগত ঝাপটা ঝাপটি এমন করছি যে ওরা আমার হাত পা কিছুই বাঁধতে পারছে না। গায়ে তখন বেশ জোর ছিল। এই সেদিন যে পুলিশ এক্‌জিবিশন করেছিল, তাতে তখনকার দিনের নিজের ফটো দেখে নিজেরই হিংসে হচ্ছিল।

কিন্তু হলে কি হবে? পরে শুনেছি, সতের জন লোকে মিলে আমায় ধরেছিল। দু'জন ইউরোপিয়ান সার্জেণ্ট ছিল। তার একজন মাটিতে বসে আমার গলায় পা দিয়ে গলার চাদরটা ক্রমাগত পাকিয়ে চলেছিল।

সেই অবস্থাতেও তুমুল ধ্বস্তাধ্বস্তি করছি। ইতিমধ্যে বুঝলাম, ধরা পড়তেই হবে, রিভলবারও আর ব্যবহার করতে পারব না। তখন চেষ্টা করলাম পকেট থেকে পটাসিয়াম সায়ানাইড বের করতে কিন্তু দেখি সে পকেটটা ছিঁড়েই নিয়ে গেছে।

মাঝে একবার চারিদিকে তাকিয়ে দেখলাম, বহু লোক জমে গেছে। দু'একজন বলছে, কি করছ, কি করছ তোমরা? ছেড়ে দাও ভদ্রলোককে!

পুলিশও তার সনাতন জবাব দিচ্ছে, ইয়ে তো ডাকু হ্যায়। এই সব শুনতে শুনতে আর ধ্বস্তাধ্বস্তি করতে করতে কখন অজ্ঞান হয়ে গেছি। ওরা তখন আমার হাত পা বেঁধেছে, একটা ট্যাক্সিতে তুলেছে। ট্যাক্সিওয়ালা জিজ্ঞেস করছে কোথায় নিয়ে যাবে? লালবাজার? পুলিশের একজন বললে, ইলিশিয়াম রো। ঠিক এই রকম সময়েই আমার জ্ঞান ফিরে এল।

সব পুলিশগুলোও আর কয়েকটা ট্যাক্সিতে উঠলো, নাম লেখাবে, ইনাম মিলবে। দেখলাম, আমার কাপড় জামা সব ছিঁড়ে টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে গেছে, চাদরটারই এক অংশ কোমরে জড়ানো, সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত, অনেক জায়গা থেকে রক্ত ঝরছে। বৈশাখের অপরাহ্ণ, তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে।

ইলিশিয়াম রোতে যখন পৌছালাম, হাত দুটোকে পেছনে নিয়ে হাতকড়ি লাগিয়ে দিল। বারান্দা দিয়ে যখন একটা ঘরের ভিতর নিয়ে যায়, শুনতে পেলাম, পাশের ঘরে কে বলছে, ভূপেন দত্তকে ধরে নিয়ে এসেছে।

ঘরের ভিতর নিয়ে যেতে বহু লোক এসে পড়লো দেখতে, সবাই আই. বি-র কর্মচারী।

হিন্দুস্থানী একটি পেছনে এসে দাঁড়িয়ে আমার চুল ধরে টানতে শুরু করলো। চুল তখন ছোট করে কাটা, বিশেষ সুবিধে করতে পারছিল না। আর, জানিই তো মারবে। চুপ করে রইলাম।

সাহস পেয়ে চারদিক থেকে গাল পাড়তে আরম্ভ করলো। মার হয় তো সহ্য হ'ত, কিন্তু গাল সহ্য হয় না। চীৎকার করে বললাম—

Stop you brutes, you have sold your mother, sold your country, sold your conscience. And now don't you feel ashamed to use filthy language against a patriot ?

চীৎকারে ঘরটাসুদ্ধ যেন কেঁপে উঠ্‌লো। গাল থেমে গেল। ইন্‌স্পেক্‌টার কালিসদয় ঘোষাল হিন্দুস্থানীটাকে বললো, মেরো না, এর কেস্‌ কোর্টে যাবে। মার থেমে গেল। আমার ভাগ্যে এর পরে আর মার জোটে নাই।

একে একে ঘর ছেড়ে সব বেরিয়ে গেল। দু'চারজন রইলো, তারই মধ্যে একজন পাশে এসে ধীরে ধীরে জিজ্ঞেস করলে, আপনার পিপাসা পেয়েছে ? জল খাবেন ?

ইংরেজিতেই ধমক দিয়ে জবাব দিলাম, মনে করেছ, তোমার হাতে জল খাব ? ইউরোপিয়ান সার্জেন্টটাকে দেখিয়ে বললাম, বরং এর হাতে খেতে পারি, এরা যা করছে নিজের দেশের সেবার জন্য করছে।

সামনেই একটা জলের কল ছিল। সার্জেন্টটা একটা পেয়ালা নিয়ে বেশ করে ধুয়ে জল এনে দিল, খেলাম। তারপর আবার পেয়ালায় জল নিয়ে এসে, আমার ধুতি জামার টুক্‌রোগুলো কাছেই

পড়ে ছিল, তা থেকে খানিকটা ন্যাকড়া নিয়ে আমার সমস্ত গায়ের মাথার ঘাগুলো ধুয়ে ধুয়ে যেখান যেখান থেকে তখনও রক্ত ঝরছে, সেখানে সেখানে জলপটি দিয়ে দিতে লাগল।

একটা চেয়ারে বসেছিলাম। খানিক বাদে একজন বৃদ্ধ গোছের অফিসার এলেন, তাঁর কথায় একটু কুষ্টিয়ার টান শুনে আন্দাজ করলাম, পূর্ণ লাহিড়ি। বললেন, আহা! এই ছেলেটি? বাবা, তোমার নাম কি?

বল্‌লাম, Are you the officer in charge here?

না, না, সে আছেন, সাহেবরা আছেন।

Then I have nothing to tell you.

আচ্ছা, আচ্ছা, বলে সরে পড়লেন।

সন্ধ্যার সময় কয়টি সাহেব একে একে এসে দেখে চলে গেল। মনে হ'ল, তারই একজন টেগার্ট। লর্ড রোনাল্ডশে এই সময় গভর্ণর হয়ে এসে অত্যাচার জুলুমের কথা শুনে টেগার্টকে সরিয়ে দেন। তখন টেগার্ট চার্জ বুঝিয়ে দিয়েছে, কর্বেট ডি. আই. জি. হয়েছে।

সন্ধ্যার পর দোতলার ঘরে নিয়ে গেল। সেখানে কর্বেট, গোল্ডি, সতীশ মজুমদার এবং আরও অনেকগুলি বিলিতি ও দেশী অফিসার। কর্বেটের হাতে একটা পাতলা ছড়ি।

ছড়িটা টেবিলে রেখে কতকগুলো কাগজ নিয়ে একসাথে অনেকগুলো প্রশ্ন করে গেল, What's your name? What's your father's name? Where's your native village? How old are you? Was this revolver found on your person?... ...

আমি বললাম, 'Hear me once for all. My name is···, my father's name ·····, my native village···, P. S.···, District······, my age······Expect from me so far and no further, I refuse to answer all further questions from the officers of a foreign Government.

খস্ খস্ ক'রে কথাগুলো লিখলো, অত তাড়াতাড়ির কথা যা যা মনে পড়লো না, তা লিখতে সতীশ মজুমদার সাহায্য করলো। লেখা হয়ে গেলে আমায় জিজ্ঞেস করলো, Was this revolver found on your person ?

বললাম, I refuse to answer.

Was this monthly ticket found on your person ?

Ditto.

আরও দু'একটা প্রশ্নের ঐ রকম জবাব শুনবার পর চটেমটে কাগজগুলো টেবিল থেকে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল, বেতটা তুলে নিয়ে ঘোরাতে লাগলো, সঙ্গে সঙ্গে রাগে নাক দিয়ে ক্লান্ত কুকুরের নাকের আওয়াজের মতো একটা আওয়াজ করতে লাগলো।

বললো, You refuse to answer questions from a foreign Government's officers ! You are a revolutionary then ?

I am a patriot.

Do you know what this sort of behaviour will lead you to ?

What ? I know you have tortured many people, tortured some to death......

We torture men! Don't you believe in British honesty?

Yes. From Robert Clive down to yourself I don't know whom to call more dishonest.

You want us to leave the country?

I know, you won't leave out of your own accord. We'll force you out.

You are a revolutionist then?

I am a patriot.

You were going to stir up a revolution. How many are you? I can count your number on my fingers. Have you got an army? Have you got a navy? Who is going to be your General? Satish Chakravarti? Satish Chakravati going to be your General? Do you know what an ordinary man-of-war would cost you? It'll cost you three crores of rupees. Have you got the money?

এইভাবে প্রশ্নের বন্যা চললো। তার উত্তরে আমিও এক বক্তৃতা ঝেড়ে দিলাম—যার মর্ম হ'ল: কিছু তো নেই আমাদের, জানি। কিন্তু আমরা মরতে জানি, আমরা এক এক দল করে মরব, আর দেশকে জাগাব—দেখি কতদিন তোমরা আমাদের লোকসংখ্যা আর টাকার হিসেব দেখিয়ে দাবিয়ে রাখতে পার। স্বাধীনতা চাইতে শিখলে কোন্ জাতকে কোন্ জাত কবে দাবিয়ে রাখতে পেরেছে? আমরা জাতকে স্বাধীনতা চাইতেই শিখিয়ে যাব।

তারপর না হয় দীর্ঘকাল তোমাদের সাথে আমাদের ধ্বস্তাধ্বস্তি করতে হবে।

আমার বক্তৃতা চল্‌ছে, ওর হাতের ছড়ি ঘুরছে। আর আমি ভাবছি, এক ঘা যদি মারে, হাতেই না হয় হাতকড়ি আছে, একটা লাথিতে ওকে টেবিলের উপর দিয়ে ফেলব, তারপর যা হয় হবে।

দেখলাম, ছড়িটা সংযতই রইলো। আমার বক্তৃতা থামবার পর অত্যন্ত ক্রুদ্ধস্বরে বললে, "লে যাও"। এই "লে যাও" কথার অর্থ শুনেছিলাম, মারের ঘরে নিয়ে যাও। আমার বেলায় দেখলাম, লালবাজারে নিয়ে চললো।

সে আর এক কাণ্ড। আফিসের সামনে দেখ্‌লাম, এক বন্ধ ভ্যান দাঁড়িয়ে—তার সামনে পাঁচজন বন্দুকধারী দেশী পুলিশ, এবং দুইজন ইউরোপীয়ান সার্জেণ্ট। দেশী পুলিশগুলো ভিতরে ঢুকলো, একটা সার্জেণ্ট সামনে বসলো, অন্যটা বন্দুকের চেম্বার ও হাতের গুলি খুলে পেছনের দরজায় বস্‌লো। গাড়ীর দরজার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে একটি আই. বি. অফিসার। সে আর ভিতরে ঢুকছে না। সতীশ মজুমদার এসে তাকে জিজ্ঞেস করছে, উঠ্‌ছ না কেন?

সে মুখ কাচুমাচু করে বল্লে, আর একজন কাউকে দিলে হ'ত না?

তুমি বল্‌ছ কি? ওর রয়েছে পেছনে হাতকড়ি লাগানো, তার উপর বন্দুক নিয়ে অতগুলো কনষ্টেবল ভেতরে রয়েছে, দরজায় রয়েছে রাইফেল নিয়ে সার্জেণ্ট। তোমার কাছে আছে রিভলভার। আরও লোক? অত ঘাবড়াচ্ছ কেন?

না, না, তবু, তবু, করে তো উঠে পড়লো।

সেই প্রথম ব্ল্যাক ম্যারিয়ায় ঢোকা। ভেতরে অন্ধকার, আমার মনভয়াও তাই।

লালবাজারে গিয়ে এক বুড়ো মতন ভালো মানুষ সার্জেণ্টের কাছে তো আমার নাম ইত্যাদি লেখালো। তখনও আমার সেই সিল্কের চাদরের আর্ধেকটা পরা। আই. বি.র লোকটা সার্জেণ্টটিকে বললে, ঐ কাপড় ছাড়িয়ে নিয়ে ওকে একটা হাফপ্যাণ্ট দাও।

সার্জেণ্ট বলে, How can I remove his national costume ?

আই. বি.টা বলে, দিলে ভালো করতে, আচ্ছা, যা খুশি কর।

এর পর সার্জেণ্ট আমায় নিয়ে একটা সেলে ঢুকলো। সেখানে দুখানা কম্বল দিল। দরজায় পাঁচজন পুলিশ বসালো। তারপর দরজায় তালা লাগালো। একটু বাদে দরজা খুলে, বোধ হয় ঐ আই. বি.টার পরামর্শে, ওর একজন পুলিশকে সঙ্গীন সুদ্ধ ভিতরে এনে দাঁড়ো করিয়ে দিল।

দরজার সাম্‌নাসাম্‌নি জানালার কাছে একটা কম্বল বিছিয়ে বস্‌লাম। এলোমেলো সমস্ত কথাগুলো মনের ভিতর ওলটপালট করতে রইলো। তিনটি কথাই তার ভিতর বড় হয়ে দেখা দিল।

প্রথম কথা, কেমন করে ধরা পড়লাম। আনুপূর্বিক সমস্ত ভেবে তখন যা মনে হয়েছিল, পরে সমস্ত জেনেশুনেও দেখলাম, আমার ঐ প্রথম সিদ্ধান্তই ঠিক। রামগোপালই আমায় ধরিয়ে দিয়েছে। শৈলেন ঘোষের আমেরিকায় যাবার ব্যাপারের সঙ্গে আর যারা সংশ্লিষ্ট ছিল, তার একজন কয়দিন আগে ধরা পড়েছে। সে স্বীকারোক্তি করার ফলে, রামগোপালকে ঐদিন ভোরেই ধরতে যায়। তখন, আমায় ধরিয়ে দেবে, এই অঙ্গীকারে রামগোপাল সেইদিনই ছাড়া পায়। এবং আমিও ঠিক কথামতো এবং সময়মতো ঐদিন তার কাছে যাওয়াতে সে সুযোগ পেয়ে যায়।

এ খবর বাইরে অজানা রইলো না—রামগোপাল সমাজে একঘরে এবং ভাইদের দ্বারা পরিত্যক্ত হয়। কিন্তু পুলিশ বিভাগে চাকরী পায়।

দ্বিতীয় কথা যা' আমায় অস্থির করে তুলছিল সে হচ্ছে এই—আমি ধরা পড়লাম, কিন্তু যাঁরা রইলেন তাঁদের চলবে কি করে? কুন্তল, চারু—অতজন পলাতকের ভার ওদের উপর, অথচ ওরা তো বেশী লোককে চেনে না। আজ অবধি কোনো ঝামেলাই ওদের উপর দিয়ে যায়নি। তা ছাড়া স্বাস্থ্যও দুজনেরই খারাপ। কি করে কোথা থেকে আজই ওদের চলবে? তার উপর, কতোখানি হতাশায় যে ওরা ভেঙে পড়বে! কুন্তল আজ যখন ক্যাম্বেলের দরজায় এসে দাঁড়িয়ে থাকবে, আমি নির্দিষ্ট সময়ে যাব না, কি নৈরাশ্য আর ব্যথা নিয়ে বাড়ী ফিরবে! আজ সন্ধ্যায় চারু হাসপাতালের জানালা থেকে পথের দিকে চেয়ে থাকবে, আমি যাব না, হাসপাতালের দরজা বন্ধ হবে অনেক রাতে, তখন অবধি আশায় আশায় থাকবে। তারপর?

সব ছাপিয়ে মনে জাগ্‌ছিল এক ভাবনা। কত লোকের কথা শুনেছি স্বীকারোক্তি করেছে। কি করে হয়? টুক্‌রো টুকরো কথা সব মনে ভেসে আসছিল। অতুলদা বলেছিলেন একদিন: মারলেই যদি স্বীকারোক্তি করতে হয়, তা হলে কোনো দেশে কোনো কালে বিপ্লব সম্ভব হ'ত না।···সুরেশ দাস বলেছিলেন, আমি যদি সত্যি সত্যিই কিছু না জানতাম, মারলেই বা কোথা থেকে বলতাম? ······কুন্তল বলেছিলেন, মারতে মারতে মেরে ফেলে দেবে, মুখ দিয়ে একটি কথা বের হবে না—এই তো বিপ্লবীর জীবন।······

এসব কথাই জানি, বুঝি। মুখ দিয়ে কথা বের হতে পারে না। নিজেকে বাঁচাবার জন্য অপরের সর্বনাশ করা—বিপ্লবীর

ধর্মত্যাগ, বিপ্লবীর জাতিপাত। বিশ্বাসঘাতক হতে পারে, পুলিশের কাছে মাথা নোয়াতে পারে—আত্মসম্মানবোধের কতোখানি অভাব হলে! অথচ কার না নামে রটেছে? জীবন চাটার্জির নামে পর্যন্ত,—যে জীবনকে আমি নিজের চেয়েও বেশী বিশ্বাস করি। অনুশীলনের অমৃত সরকার—তাঁকে আমি ব্যক্তিগতভাবে জানিনে, কিন্তু কতো কথাই তো তাঁর সম্বন্ধে শুনেছি! পরে শুনেছি, এঁদের নামে যা কিছু রটেছে, সবই মিথ্যা, আত্মসম্মান অনাহত রেখেই এঁরা উৎরেছেন।

কিন্তু তখন ঐ জানালা দিয়ে অন্ধকার আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে ভাব্‌ছি, মার খেয়ে বা কোনোরকম অত্যাচার জুলুমের ভয়ে তো এঁদের মুখ দিয়ে কোনো কথা বের হওয়া সম্ভব নয়। তবে কি কোনো রকম ঔষধ খাওয়ায়? কোনো রকমে অজ্ঞান করে নিয়ে, উন্মাদ করে নিয়ে কি তবে কথা বের করে?

যদি সত্যিই আমার তাই হয়? সেই কলংকিত জীবন বয়ে আমায় বেঁচে থাকতে হবে? আর, আমার মুখ দিয়ে যদি কোনো কথা বের হয়, আমার কথায় প্রথমেই ধরা পড়বে কে? —কুন্তল আর চারু—কাল পর্যন্তও আমার কাঁধে মাথা রেখে যারা পরম নিশ্চিন্তে ঘুমিয়েছে।

পরে শুনেছি, ঐ দিনই আলোচনা হয়েছে: কানাই সাহা বলেছে অমরদাকে, ভূপেন দত্ত যদি ধরা পড়ে থাকে, আমাদের তো আজই বাসা বদলানো উচিত। অমরদা বলেছেন, কেন? ভূপেন যদি স্বীকারোক্তি করে, আমাদের ধরা পড়াই ভাল। আমরাই বা তা হলে পালিয়ে থাকব কিসের আশায়?

কানাইয়ের ঠিক বিপরীত কথাও বলেছেন অনুশীলনের আর একজন গৌহাটিতে। আমার ধরা পড়ার খবর নিয়ে গৌহাটিতে যখন একজন

বলেছেন, ভূপেন দত্ত তো গৌহাটির খবর জানে, নলিনী ঘোষ জবাব দিয়েছেন, আমি তাকে অল্পই দেখেছি, কিন্তু যা দেখেছি, তা'তে মনে হয়েছে, দুই দলের আর যে কেউ স্বীকারোক্তি করতে পারে, আমি বিশ্বাস করতে পারি, কিন্তু এ নয়।

তখনকার দিনে কেউ ধরা পড়লে এই রকমই সব আলোচনা চলতো। বাড়ী বদলের হিড়িক লেগে যেত।

লোকে আমার উপর আস্থা রাখে আমি জানি। সেই আস্থাকে চিরদিনের মতো বলি দিয়ে আমায় বেঁচে থাকতে হবে?

পেছেন দিকে একবার ফিরে তাকিয়ে দেখি—ঘরের মাঝখানে সঙ্গীন নিয়ে পাহারাওয়ালাটি তখনও দাঁড়িয়ে। মনে মনে সংকল্প আঁটি: রাতে ওর দিকে চেয়ে বসে থাকব,—একবার না একবার ও ঝিমোতে শুরু করবেই, তখন ওর সঙ্গীন কেড়ে নিয়ে যা করবার করব

মন ক্রমে দৃঢ় হয়ে ওঠে। কিন্তু রাত সাড়ে দশটা আন্দাজ সেলের তালা খুললো, ঘরে ঢুকলো কর্বেট। আবার তার সেই বক্তৃতা। তার উত্তরে আবার আমার ঝাঁঝালো ঝাঁঝালো কথা।

তারপর কর্বেট প্রত্যেকটা জানলায় দরজায় গেল, শিকগুলো টেনে টেনে দেখলো, শক্ত আছে কি না—না, কোনোটাকে ভেঙে বা বেঁকিয়ে আমি সরে পড়তে পারি। পায়খানার ভিতরটাও ঢুকে দেখ্‌লো। তার পর বেরিয়ে গেল। বেরিয়ে যাবার বেলায় সঙ্গীনওয়ালা পুলিশটাকে বাইরে নিয়ে দাঁড়ো করে ঘরে আবার তালা লাগিয়ে তালা বারকতক ঝেঁকে পরখ করে চলে গেল।

ও-আশা ফুরিয়ে গেল।

এর পর একবার পায়খানায় ঢুকলাম প্রস্রাব করতে। ঢুকে সমস্ত দিকটা বেশ করে দেখে এলাম।

সারা রাত ঘুম আর হ'ল না। কখনও শুয়ে কখনও বসে সংকল্পটা দৃঢ় করে নিচ্ছি, সমস্ত পৃথিবীর কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি।

রাত সাড়ে তিনটা আন্দাজ পায়খানায় যাব বলে কনষ্টেবলদের কাছ থেকে এক মগ জল চেয়ে নিলাম। পায়খানার ভিতর একটা কাঠ পড়ে ছিল, সেই কাঠের উপর কমোড্‌টা চাপিয়ে দিতে উপরে জানালার গরাদে হাত পেলাম। জানলায় বসে চাদরটা কোমর থেকে খুলে নিলাম। পাকিয়ে গরাদেয় বেঁধে গলায় পরিয়ে দিলাম।

মেডুলা ভাঙবার তথ্যটা জানা ছিল না, শ্বাসরোধ হয়ে মরার কল্পনাই মনে ছিল। তাই আস্তে আস্তে ঝুলে পড়লাম, পাছে কোনো রকম আওয়াজ হয়। কিন্তু যা ভয় করেছিলাম, তা-ই হ'ল। জানালার নীচের প্লাষ্টারগুলো ছিল পুরানো, হুড়মুড় করে ভেঙে পড়লো কমোডের উপর। আওয়াজ শুনে বাইরে কনষ্টেবলগুলো হাঁউমাউ করে উঠ্‌লো কেয়া হুয়া, কেয়া হুয়া করে।

সার্জেণ্টটা চাবি নিয়ে ছুটে এসে দরজা খুলে ফেল্‌লো। ওরা চেঁচাতে লাগ্‌লো, ছুরি লে আও, ছুরি লে আও করে। তখন আমার গলাটা বেশ শুকিয়ে আসছে। এক একবার মনে হচ্ছে আর বেশী সময় নয়।

কিন্তু সার্জেণ্টটা হঠাৎ বল্‌লো দুজনে ধরে উপর দিকে তোলো। ভয় হ'ল, আর তো বুঝি মরা হয় না!

তখন চেষ্টা করলাম মাথা ঠুকে-যদি মরা যায়। একটা কনষ্টেবলের দুই কাঁধে দুই হাঁটু রেখে ঝুলে একবার জানালার একদিকে মাথার সামনেটা, আর একবার জানালার অপরদিকে মাথার পেছনটা জোরে জোরে ঠুকতে লাগলাম। কয়েকবার ঠোকবার পরই জ্ঞান হারিয়ে ফেললাম।

আর যখন জ্ঞান ফিরলো, তখন শুনছি সার্জেন্টটা জিজ্ঞেস করছে, **Do you think Doctor, it will be necessary to take him to the hospital ?**

Yes, it's better to take him.

কথাগুলো কানে যখন গেল তখন চুপ করেই রইলাম, দেখা যাক্ হাসপাতাল থেকে কোনো সুযোগ পাওয়া যায় কি না।

অ্যাম্বুলেন্স এল। আগের দিনের মতোই পুলিশ পাহারার ব্যবস্থা। রাত তখন ভোর হয়ে গেছে।

চোখ বুজে রয়েছি। চারদিকে কে আছে না আছে, কি ব্যবস্থা, কিছু তখনও বলতে পারিনে। কেবল বুঝলাম, মাথার ও গায়ের ঘাগুলো ধোয়া হচ্ছে, ব্যাণ্ডেজ করা হচ্ছে।

একজন সাহেব ডাক্তার এলেন, নাড়ী দেখলেন। কিছু বুঝতে পারলেন না। চলে গেলেন। একটু বাদে একজন বাঙালী ডাক্তার এলেন। নাড়ীটা টিপে, হাত ছেড়ে দিয়ে হঠাৎ একটা ম্যাচ বের করলেন, জ্বালিয়ে চোখের পাতা টেনে চোখের কাছে ধরলেন। তারপর বললেন, জ্ঞান বোধ হয় হয়ে গেছে। না হলেও এখনই হবে।

বুঝলাম, এর পর আর বেশী সময় ভান করে থাকা ঠিক হবে না। ধীরে ধীরে চোখ মেললাম। প্রথমেই যাকে চোখে পড়লো সে কানাই বসু মল্লিক, আমার ভূতপূর্ব সহপাঠী, তখন মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র। বড়ো মমতার সাথে আমার ঘা-গুলোতে ঔষধ লাগাচ্ছেন, আর ব্যাণ্ডেজ বাঁধছেন। ওঁর এই স্পর্শেই প্রথম মনে হ'ল মাথায় ব্যথা হয়েছে বেশ।

চারদিকে তাকিয়ে দেখি, কয়েকটি ছাত্র ছাড়া ইউনিফর্মপরা এবং ইউনিফর্ম ছাড়া পুলিশই সব—খাটখানিকে ঘিরে রেখেছে। বুঝলাম আর কোনো আশা করা বৃথা।

খানিকটা বাদে ষ্ট্রেচার এল। আবার সেই অ্যাম্বুলেন্স গাড়ী, আবার সেই পাহারাওয়ালা, আবার সেই লালবাজারের সেল।

ঐদিন প্রভাতের প্রথম রৌদ্রের সাথে সাথে কয়েক বছরের মতো বাইরের জগতের উপর যবনিকা পড়ে গেল। আগের দিনই পড়েছিল। এখন মনের আশাটুকু শেষবারের মতো একটু জ্বলে উঠে নিভে গেল। সাথে সাথে মনের উপর চেপে রইলো ঐ শংকা, মরা তো হ'ল না, এর পর কি ? বেঁচে মরে থাকতে হবে না তো ?

প্রথম জেলের অভিজ্ঞতা

লালবাজারে পনের দিন কাটল। খাদ্য তালিকা পনের দিনেরই এক। সকাল সাড়ে দশটা আন্দাজ একটি ব্রাহ্মণ কনেষ্টবল রান্না করে দিয়ে যায় ভাত, মুগের ডাল, পটলের ঝোল—best sauce দিয়ে খাই, অমৃতের মতো লাগে। রাত আটটায় দোকানের চারখানা পুরী এবং ঠোঙ্গার তলায় একটু আলুর ছেঁচ্‌কি। সকালে বিকালে কিছু নয়। ঘরের দরজার সাম্‌নে বসে চারটি কনষ্টেবল, একজন দাঁড়িয়ে বন্দুক ও সঙ্গীন হাতে। কনষ্টেবলরা সন্ধ্যার অন্ধকারে ছোলা ভাজা চিবোতে শুরু করবে—একজন বলে, আপনার তো ক্ষিদে পেয়েছে নিশ্চয়ই, সরকারের নয়, আমার নিজের ছোলা, চারটি দিই, খাবেন ?

পায়চারি করছিলাম, দরজায় একটু দাঁড়িয়ে বল্‌লাম, না ভাই, তোমরা খাও। আমি আমার নিজের ভাবনা, গায়ের ও মাথার ব্যথা ও ব্যাণ্ডেজ নিয়ে ঘুরে বেড়াই। হাতের গুলির ঘা প্রায় শুকিয়ে এসেছে, তখনও ব্যাণ্ডেজ বাঁধা আছে।

প্রথম দিনটি অম্‌নিই কেটে গেল, দ্বিতীয় দিনে বেলা আটটা আন্দাজ বৃদ্ধ সার্জেণ্টটি এল। অম্‌নিতেই একটা বিষণ্ণ চেহারা, আমি গলায় দড়ি দিতে পেরেছিলাম বলে সে এখন আরও বিপন্ন—এ কথা পরে শুনেছিলাম। জিজ্ঞেস করলো—You must be badly needing a bath ?

বললাম, হাঁ।

খুলে বের করে একটা স্নানের ঘরে ঢুকিয়ে দিল। কাপড় গামছা নেই, একটি খাকি জাঙ্গিয়া তখন আমায় পরতে দিয়েছে।

তাই নিয়েই যা করে পারি, ঐ ক'দিন স্নান করতাম। তাতেই তৃপ্তি বোধ হ'ত।

তৃতীয় দিনে সার্জেন্টটি দুপুরে এসে বললে—You have nothing to pass your time with. Shall I ask for some books for you?

Please, do.

সন্ধ্যাবেলায় আর একটি আগাগোড়া খাকিপরা ইউরোপিয়ানকে নিয়ে এল, তার গলায় ঝুলানো একটি বধিরদের কথা শুনবার যন্ত্র। বললে, আপনি বই চেয়েছেন?

I never asked for anything.

সার্জেন্ট বললে, আপনার সময় কাটাবার কিছু নেই।

বললাম, That's true.

Please ask the Deputy Commissioner when he comes round. I too shall speak to him.

ফিরে এসে নিজের জায়গায় বসব ভাবছি, জিজ্ঞেস করলে, আপনার নাম কি?

বললাম।

জিজ্ঞেস করলে, আপনি কোথায় থাকতেন?

পুরানো মেসের ঠিকানা বললাম, পটলডাঙ্গায়।

Where's that?

Near the Amherst Street and Harrison Road crossing.

Did you happen to know শ্রমজীবী সমবায়, অমরেন্দ্র চাটার্জি, মন্মথ বিশ্বাস and all that?

What do you mean by all these questions ?

ফিরবার উপক্রম করছি, বৃদ্ধ Sergeant-টি বল্লে, না, না, ও কিছু নয়, he is only a brother Sergeant.

স্বস্থানে এসে কম্বলের উপর আসন করে বসলাম। ওরা পেছনে দাঁড়িয়ে কি একটু বিড় বিড় করে আলাপ করে সরে পড়লো।

এই পনের দিনের ভিতর দিন তিনেক গোল্ডি সাহেবের আবির্ভাব হল। সে বোধ হয় তখন স্পেশাল ব্রাঞ্চের ডেপুটি কমিশনার। মনে হয়, ধরা পড়ার পর দিনই একবার এসেছিল। বল্লে, You tried to commit suicide ?

What of it ?

But why did you do it ?

Because the sooner I am out of the foreigners' clutches the better.

তারপর চললো ওরও কুতর্কের অছিলায় জেরা, আর আমারও সব বেয়াড়া জবাব। লোকটি কথা বলে ভিজে বেড়ালের মতো মিউ মিউ করে। গাল খেতে বেশ পারে।

ঐ দিনই হবে, কি ওর পরে আর একদিন আমার কোনো কথার জবাবে আমার প্রথম দিনের কথার রেশ টেনে জিজ্ঞেস করলে, সে-ও কি স্বদেশ-প্রেমিক নয় ?

Yes ! But had you been one, you would now be either in Flanders or in Mesopotamia. But I know, you have had it recommended, your services are indispensable here.

একটু ম্লান হাসি হেসে কেটে পড়লো।

পনের দিনের দিন ডাক পড়লো। সকাল সকাল খাইয়ে দাইয়ে ব্ল্যাক মেরিয়ায় ঢুকিয়ে বাঁকশাল ষ্ট্রীট কোর্টে নিয়ে গেল। পুলিশ পাহারার ব্যবস্থা সমানই। কোর্টে নিয়েও কিন্তু ব্ল্যাক্ মেরিয়া আর খোলেই না। যখন খুল্‌লো, দেখা গেল দরজার দুপাশে দুটি সার্জেন্ট, আর সাম্‌নে প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট্ সুইনহো, পাশে দাঁড়িয়ে সরকারী উকিল। কোর্টে আর আমায় নেওয়া হ'ল না, ব্ল্যাক মেরিয়া থেকেও বের করা হ'ল না। উকিল বললেন, আমি চাই আসামীকে পনের দিনের জন্য জেল হাজতে রাখা হোক্। মঞ্জুর করে দিয়ে ম্যাজিষ্ট্রেট আর এক নজর আমার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে চলে গেলেন, আমার গাড়ীও সশব্দে বন্ধ হয়ে কোন্ কোন্ রাস্তা দিয়ে এসে হাজির হল প্রেসিডেন্সি জেলের ফটকে।

সেখানে ছিল এক ইউরোপিয়ান ওয়ার্ডার। সে জেলারকে ডেকে পাঠিয়ে আমার নাম ধাম লিখে নিল। রাশভারী, বিখ্যাত জেলার হিল সাহেব—জেলে নরেন গোঁসাইয়ের হত্যার পর আন্দামানের বিশেষ আমদানী। চেহারাতে শুধু শিক্ষা দীক্ষা নয়, খাদ্য অবধি ধরা পড়ে। রেজিষ্ট্রি খাতায় আমার নামটা পড়েই আপাদমস্তক কট্‌মট করে তাকালো, তারপর যেন হাঁড়ির ভিতর থেকে যে আওয়াজটা বের হ'ল, সেটা হ'ল, "Follow me."

প্রথমটা বুঝতে পারিনি, ভিতরের দিকে খানিকটা এগিয়ে আবার আমার দিকে ফিরে বল্‌লো, "I speak but once."

'ধমকে চমকে উঠিয়া যাইব, আমি যদি সে প্রকৃতির লোক হইতাম, তাহা হইলে আসিতাম না'—"কৃষ্ণকান্তের উইলে"র এই কথাটা হঠাৎ মনে পড়ে গেল, একটু হাসি পেল। ওর পেছন পেছন চললাম। জেলের সিপাই ভিতর দিকের দরজা খুলে দিল। ভিতরের আরও

গোটা দুই দরজা খুললো, বন্ধ হ'ল, তারপর যেখানটায় পৌঁছালাম, সেটার নাম গোরা ডিগ্রি বা ইউরোপিয়ান ওয়ার্ড। এখন এসব স্থান সুপরিচিত, কিন্তু আজ থেকে পঁয়ত্রিশ বছর আগে কে ভেবেছিল, জেলখানায় গিয়ে অমন ঘরে থাকব ?

বারান্দায় বসেছিল একটি ইউরোপিয়ান ওয়ার্ডার। এর নাম ছিল [illegible]। পরে প্রায়ই দেখেছি, কাজকর্ম নেই, বসে বসে প্রেমপত্র লিখতো। ও-শ্রেণীর যতোগুলি জীব তখন প্রেসিডেন্সি জেলে দেখেছি, এই লোকটিকে দেখেছি বেশ ভদ্র।

জেলার সাহেবকে দেখে ধড়মড় করে উঠে দাঁড়াল। হাঁড়ির ভিতর থেকে আবার হুকুম হ'ল সামনের সেলটা খুলবার। উপরে লেখা ৩নং। ওদের দুজনের মাঝখানে আমি ঘরে ঢুকে এক কোণে দাঁড়ালাম। তারপর শুরু হ'ল জেলার সাহেবের দুর্দান্ত অভিনয়—সবটাই অভিনয়—ঐ ধমক চমক।

লোহার খাটটাকে হুড়হুড় করে টেনে দরজার কাছে নিয়ে এল, মশারির ডাণ্ডাগুলো টেনে বাইরে ঝন্‌ঝন্ করে ফেললো। এর ভিতর দুটো কয়েদি ঢুকলো, তারা এসে সাহায্য করে শেষ পর্যন্ত যেটা দাঁড়ো করলো, তাতে আমার শয্যা রইলো চটের একটা গদি, এবং গায়ে দেবারই হোক বা গদির উপর পাতবারই হোক্, একখানি কালো কম্বল, আর মাথার তলার জন্য চটেরই সেকেলে কানবালিশের সাইজের একটি বস্তু। এক কোণে আলকাতরা মাখা একটা টুকরি দেখে মনে হ'ল, মূত্রত্যাগের ব্যবস্থা ঘরেই।

জেলার সাহেব আমার সেই জাজিয়ার পকেটেও হাত দিয়ে তল্লাসী নিলেন। যাবার বেলায় সেই ইউরোপিয়ান ওয়ার্ডারটাকে আদেশ হ'ল, রোজ সকালে বিকালে দুবার তল্লাসী করবে, কড়া নজর রাখবে এবং

সে কাজে সাহায্যের জন্য আর একজন ওয়ার্ডার পাঠাবেন বলে বীর-বিক্রমে বেরিয়ে গেলেন।

বেচারীর দোষ ছিল না। দু'একদিন পরে দেখতে পেলাম, ইউরোপিয়ান ওয়ার্ডারের সাম্‌নে যে একখানি খাতা থাকে—যা'তে লেখা পড়ে, কোন্ ওয়ার্ডার কখন ঢুকলো, কে কখন বেরিয়ে গেল, ইয়ার্ডের ভিতর কে কখন এল বা গেল, দশটা সেলের বন্দীরা কে কখন স্নানের ঘরে গেল, কার জন্য এক টুক্‌রো কাপড় কাচা সাবান বা ফল বা হাসপাতাল থেকে ঔষধ বা আত্মীয় স্বজনের চিঠি এল—সেই খাতার একটি পাতায় তখনকার দিনের অ্যাডিশনাল পোলিটিক্যাল সেক্রেটারী কামিং সাহেবের একখানি টাইপ করা চিঠি আঁটা রয়েছে। তাতে আমার নাম ইত্যাদি দিয়ে লেখা আছে, অত্যন্ত বিপজ্জনক বন্দী, আত্মহত্যা করতে চেষ্টা করেছিল, ইউরোপিয়ান ওয়ার্ডের ৩নং সেলে সার্জেণ্টের সাম্‌নে তাকে রাখবে, অত্যন্ত কড়া নজরে রাখবে এবং তেমন নজর রাখার জন্য এর সামনে আর একজন বিশেষ ওয়ার্ডার নিযুক্ত করবে—ইত্যাদি ইত্যাদি। ঐ কাগজখানার তলায় সব ইউরোপিয়ান ওয়ার্ডারদের সই করতে হয়েছে।

জেলার সাহেব বেরিয়ে যেতে যেন ঝড় থেমে গেল—সারা বাড়ীটা নিঝুম। সাম্‌নে সেই ইউরোপিয়ান ওয়ার্ডারটি চুপচাপ বসে নীল কাগজে চিঠি লিখছে। এর ভিতর দেশী একটি ওয়ার্ডার এল। এই ওয়ার্ডারটিই বিখ্যাত ফতে বাহাদুর খাঁ, প্রেসিডেন্সি জেলের বড় জমাদাররূপে অনেক রাজনৈতিক বন্দীর কাছে পরে সুপরিচিত হয়েছিল। আমার বিশেষ পাহারাদাররূপে এ কিন্তু দেড়মাস আমার সঙ্গে খুবই ভাল ব্যবহার করেছিল। অত কড়াকড়ি পাহারা এবং আমার বেশ দেখে ওয়ার্ডাররা এবং জেলের কয়েদি সবাই

বলাবলি করতো, আমার ফাঁসি হবে। কাজেই সকরুণ ব্যবহারই করতো।

বেলা তিনটে বাজ্‌লো। একটি কয়েদি এসে সাহেবের টেবিল থেকে চাবি নিয়ে উপরে গেল। একটি ফিট্‌ফাট্‌ ভদ্রলোক কোথা থেকে সামনের মাঠের ভিতর এসে নিঃশব্দে জোড় হাত করে নমস্কার করলেন। আমিও প্রতিনমস্কার করলাম। কিন্তু মনে কেমন খট্‌কা লাগ্‌লো। এ কে? কোথা থেকে এল? পুলিশের লোক নয় তো? মিনিট পনের ভদ্রলোক বাইরে ঘুরলেন, তারপর আবার আমায় একটি নমস্কার করে পাশের দিকে কোথায় চলে গেলেন। আবার অম্‌নি আর একটি ভদ্রলোক এলেন। তিনিও মাঠে ঐ পনের মিনিটের জন্য ঘুরলেন কিন্তু তিনি আমার ঘরের দিকেও তাকালেন না। পরে শুনেছিলাম, অজয় নদের তীরে যে বিপ্লবের আয়োজন হয়েছিল, সেই সম্পর্কে এক মামলার কল্পনা ছিল। সেই মামলায় রাজসাক্ষী হবার জন্য তৈরী হয়ে তিনি ওখানে ছিলেন। ইনি চলে গেলে পনের মিনিট পর পর এক একটি ভদ্রলোক দেখে আবিষ্কার করলাম, আমার আশে পাশে এবং উপরে আর যে নয়টি সেল, তার প্রত্যেকটিতেই একজন করে রাজবন্দী আছেন। কিন্তু প্রেসিডেন্সি জেলের তখন এম্‌নি অবস্থা যে, ঐ যে সাড়ে বারোটা থেকে তিনটা পর্য্যন্ত আমি ওখানে কাটালাম এবং তার ভিতর জেলারের ঐ যে সশব্দ অভিনয় হয়ে গেল, তার ভিতর টেরও পাই নাই যে, সবগুলি সেলই ভর্তি। ঐ আড়াই ঘণ্টা ধরে আমার ধারণা ছিল ঐ বাড়ীখানিতে আমিই একমাত্র বন্দী।

ওর ভিতরও সব দিন, সব সকাল, সব সন্ধ্যা একরকম যায় নাই, সব ওয়ার্ডারও একরকম নয়। হলে মানুষকে প্রায় দম বন্ধ হয়েই মরতে হয়। বৈচিত্র্য যে ওর ভিতরও আছে, একটু বাদেই টের

পেলাম। একটি কয়েদি, সে জেলের মেথর, ঘরের প্রস্রাবের টুকরি পরিষ্কার করতে এল—সাহেব ভাল, মেথর নিজে হাতেই চাবি খুলে ঘরে ঢুক্‌লো। কানের কাছে মুখ এনে একরকম শব্দবিহীন আওয়াজে —এ যে কি বস্তু, তা জেলের বন্দী ছাড়া আর কেউ বুঝবে না—বল্‌লো, পায়খানার নাম করে বাথরুমে যান, সেখানে দেয়ালে কি লেখা আছে পড়বেন।

একটু পরে সাহেবকে বললাম, পায়খানায় যাব। দরজা খুলে আমার স্পেশাল ওয়ার্ডার পেছন পেছন চললো। বাথরুম বটে, কিন্তু প্রায় সবই খোলা। স্পেশাল ওয়ার্ডার নজর রাখবার জন্য আর ভিতরে এল না, এইটুকু কৃপা করলো। দেখি, দেয়ালে কয়লা দিয়ে লেখা, ডাক্তার কোথায়, কেমন আছেন? রাসবিহারী বাবু কোথায়? অতুল ঘোষ ধরা পড়েন নাই তো? এখনও বিদেশ থেকে অস্ত্রপাতি আসার সম্ভাবনা আছে কি? এম্‌নি, দেয়ালভরা আরও অনেক প্রশ্ন।

মেথরটি চট্ করে কোথা থেকে এসে এক টুক্‌রো কয়লা হাতে দিয়ে চট্ করে সরে পড়লো। প্রশ্নগুলো জল দিয়ে ধুয়ে ফেল্‌লাম। কে কোথায় আছেন, তা আর লিখলাম না, সবাই যে ভালই আছেন, তা-ই লিখলাম। এবং আর কিছু আশা করবার নেই, সে কথাও। পরে জেনেছিলাম, প্রশ্নগুলো লিখেছিলেন সিলেটের দেবেন চৌধুরী। আমার ঠিক পাশেই ৪নং সেলে ছিলেন।

রাজবন্দীদের বিকেলের খাবার এল—এনামেলের প্লেটে সাজানো ভাত, ডাল, তরকারি, মাছ, ডিম সেদ্ধ ইত্যাদি। আমারও খাবার এল—সে আলাদা—বিচারাধীন বন্দীর খাদ্য, একটা বাল্‌তিতে করে ভাত, আর একটা বাল্‌তিতে ডাল এবং একখানা বড় বাক্সের ডালার মতো একটা পাত্রে তরকারি নামধারী—এক একটা শাকের

ড্যালা। সে কি শাক জানি না, চিবোলে একটু রসের বেশী আর কিছু গলার তলায় যায় না। আমার জন্য এক লোহার থালায় খাবার তুললো।

খাবার যখন এসেছে, বর্তমান সিমলা ব্যায়াম সমিতির অমর বোস তখন বেড়াচ্ছেন। নিঃশব্দে খাবারের থালাগুলোর কাছে এসে দাঁড়ালেন—ইউরোপিয়ান ওয়ার্ডার না দেখার ভাণ করে দেয়ালের দিকে চেয়ে রইলো। ফতে বাহাদুর দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলো, কিছু বল্‌লো না। অমরবাবু কোনো থালা থেকে কিছু ভাত, কোনো থালা থেকে তরকারি, বোধ হয় নিজের থালা থেকেই মাছ ডিম সবটা আমার লোহার থালায় তুলে দিতে কয়েদিটিকে ইঙ্গিত করলেন। দেওয়া হয়ে গেল দেখে আবার বেড়াতে লাগলেন। মনে হ'ল, এঁদের ভাল কাপড়-চোপড় থেকে সন্দেহ করবার কিছু নেই। তখনও তো কারও নাম বা পরিচয় জানিনে।

পরদিন থেকে দেখতাম, হয় অমরবাবু, না হয় ময়মনসিংএর মণি চৌধুরী (বর্তমানে কুষ্টিয়া মোহিনী মিলের সেক্রেটারী) ক্যারিক বা ভিসেন্ট বলে যে ছুটো নাম করা শয়তান ওয়ার্ডার ছিল, তাদের ডিউটি না থাকলে রোজই এই কাজটি করতেন।

ঐ বেলায় আমার খাবার নমুনা দেখে ফতে বাহাদুর বুঝে নিল, বেশ খেতে পারি। সে ডিউটিতে থাকলে লপ্‌সিই হোক্‌, ভালই হোক্‌, প্রচুর পরিমাণে নিয়ে আসতো।

ফলে, ঐ বিচারাধীন একমাসে ১২২ থেকে আমার ওজন দাঁড়ালো ১৪০ পাউণ্ড। অফিসার মহলে একটা হৈ চৈ পড়ে গেল। এটা ব্রিটিশ আমলের জেলের ছিল একটি সনাতন চাতুরী। পুলিশের হাজতে প্রায়শঃ প্রথম ছুই সপ্তাহ কাটাতে হয়। তখন লালবাজারে

যা খাদ্য পেতাম, সে কথা আগে বলেছি। এরপর পেটপুরে খাদ্য পেলে ওজন বাড়বেই। আর বাইরে থেকে জেলের বন্দীদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে যখন প্রশ্ন হ'ত তখনই সরকারী জবাব আসতো, জেলে প্রবেশের সময় বন্দীর ওজন ছিল এত, বর্তমান ওজন এত।

সন্ধ্যাবেলা ৬টায় ওয়ার্ডার বদ্‌লি হ'ল। যে এল তার নাম রবার্টসন, বুড়োমানুষ, রসিক লোক, কিন্তু বদরসিক। তবে একে মাঝে রেখে, এর সঙ্গে আলাপের উপলক্ষ্য করে আশে পাশের রাজবন্দীদের পরস্পরের এবং আমার সঙ্গে আলাপ চল্‌লো। নামে জানতাম অনেককে। এখন পরিচয় হ'ল। এমনকি উপরের ঘরগুলোতে কে কে আছেন পাশের বন্ধুরা তাঁদের পরিচয় দিলেন।

পরদিন অন্ধকার থাকতে ঘরের দরজা খুললো, একজন করে বাথরুমে, আর একজন করে ভোরের একসারসাইজের জন্য বের হতে লাগলেন। সকাল সাড়ে আটটা আন্দাজ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এল—মেজর টম্‌সন্‌, ভারতবাসীর প্রতি ঘৃণা ও ঔদ্ধত্য এবং অসৎ ও অত্যাচারী স্বভাবের জন্য লোকটি খ্যাতি অর্জন করেছিল। একটি অদ্ভুত ব্যাপার দেখলাম—সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট যখন ইয়ার্ডের মধ্যে ঢুকবে, দরজার কাছ থেকে একটি কয়েদি মেট বা পাহারাওয়ালা চীৎকার করে বলবে "সরকার সেলাম।" আর যে যেখানেই থাকুক, সবাইকে দুখানা হাত কনুই ভেঙ্গে বুকের পাশে আঙুল ছড়িয়ে তুলে ধরতে হবে।

আমি ব্যাপারটা জানিনে। লক্ষ্য করলাম, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ঢুকবার বেলায় যিনিই সাম্‌নের মাঠে বেড়ান, তিনিই ঐ রকম করেন। তখন বুঝলাম, ঐটিই রেওয়াজ। আমি ঘরে বন্ধ, দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ব্যাপারগুলো দেখি। হাত যেমন থাকবার থাকে, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এসে দুএকটা কথা বলে যায়, কোনদিন কিছু বলে না, জেলার

ছিলও না। একদিন কোন্ এক ইউরোপিয়ান ওয়ার্ডার এসে বলে, হাত তুলে দাঁড়াবে। মনে মনে বলি, দায় পড়েছে!

আমার ঘরে সারারাত আলো জ্বলে, বেজায় পোকা ঢোকে। ঘুমের ব্যাঘাত আমার বিশেষ কিছুতে কোনো কালেই হয় না। তবু সেদিন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এসে যখন বলে, কিছু চাই? আমি বলি, হয় রাত্তে আলো নিভিয়ে দাও, নয়তো মশারি দাও।

ও বলে, You can have neither.

আমি পেছন ফিরে নিজের জায়গায় এসে বসি, ও চলে যায়।

কিন্তু মজা এমন, সেই দিন থেকেই আলোটা হঠাৎ এমন নিস্তেজ হয়ে গেল যে ঘরে আর পোকা ঢোকে না।

দু এক দিন যায়, আবার এসে একদিন টমসন জিজ্ঞেস করে, Do you want anything?

সোজা বলি, No.

টমসন চলে যাবার পর সেই রবার্টসন হৈ চৈ শুরু করলো। দেবেন বাবুকে বলে, দেখলে, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে কি রকম অপমান করলো? কিছু নেই, সাহেব জিজ্ঞেস করলো, কিছু চাই? বল্লে, না।

আমি বলি, অপমান আবার কিসে করলাম?

দেবেন বাবু বললেন, আপনি বরং মাঠে বেড়াবার অনুমতি চান। তিনিই রবার্টসনকে বললেন, তুমি লিখে পাঠাও যে, উনি বেড়াতে চান।

তাই লেখা হ'ল। আধ ঘণ্টাখানিক বাদে জবাব এল, পুলিশকে জানানো হয়েছে।

আশেপাশের বন্ধুরা একটু আশ্চর্য হলেন, তবে কিছুই আশ্চর্য নয় এমন ভাবও দেখালেন।

একদিন বাদে হুকুম এল, হুকুমখানা সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে লেখা। বার্বার বলে একটি ওয়ার্ডার ছিল তখন ডিউটিতে। সে পড়লো। মর্ম এই, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট যতক্ষণ জেলে হাজির থাকবে, ততক্ষণের মধ্যে দেওয়ালের পাশে এবং দরজায় বিশেষ কড়া পাহারার ব্যবস্থা রেখে পনের মিনিটের জন্য আমায় বের করা যেতে পারে বেড়াবার জন্তে। হিল্ এল। বার্বারকে নিয়ে চারদিক ঘুরে দেখে কি পরামর্শ করলো, কি ব্যবস্থা করে গেল।

হিল চলে গেলে ফত্তে বাহাদুরকে দাঁড়ো করলো ইয়ার্ডের ফটকে, একটা মেটকে বাথরুমের কাছে, আর একটা কয়েদিকে দেয়ালের কাছে এক জায়গায় একটা রান্নাঘর ও কাঁঠালগাছ আছে সেখানে, আর মেথরটিকে দাঁড়ো করলো আর একপাশের দেয়ালের কাছে, তার পর এসে আমায় ঘর খুলে বের করে হেসে জিজ্ঞেস করে, Do you think you can scale over that wall ? আমিও হেসে জবাব দিই, Why not ?

বেচারী চেয়ার ঘুরিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বসে রইলো। ঐ পনের মিনিট আমি একটি প্রদর্শনীয় বস্তু হয়ে ঘুরলাম। এর পর বোধ হয় ২০।২২ দিন ইউরোপিয়ান ওয়ার্ডে ছিলাম। রোজই ঐ ব্যবস্থা।

জেল লাইব্রেরী থেকে বই আসে। আজেবাজে বই যা পাই, তাই পড়ি। ল্যা মিজারেব্ল্খানা আগে পড়েছি, বায়োস্কোপেও দেখেছি। কিন্তু এখন পড়ে যতো ভালো লাগ্লো, তেমন আগে লাগে নাই।

আশে পাশের বন্ধুদের মধ্যে দেখি, এক অমর বোস আর ময়মনসিং এর সুধীন রায় ছাড়া আর সবাই কৌপীনবস্ত্র এবং কাপড় অর্ধেক করে ছিঁড়ে কাছা না দিয়ে পরেন, কেউ কেউ গেরুয়া রং-য়ে ছুপিয়ে।

দেবেনবাবু লম্বা চুলও রেখেছেন। প্রথম যখন বুঝলাম যে, এঁরাও বন্দী, তখন মনে হয়েছিল কোনো আশ্রমের ব্রহ্মচারীদেরই বা ধরে এনে রেখেছে। এঁরা জীবনযাপন প্রায় সেই রকমই করতেন। দেবেনবাবু তো একটা গ্রহণের দিন সমস্তটা ক্ষণ গীতা আর চণ্ডী বেশ উচ্চ স্বরে পড়ে কাটিয়ে দিলেন। এঁদের মুখের উপরও সবারই যেন কেমন একটা ম্লান ছায়া এসে পড়েছে। তবে কাপড় ছিঁড়ে পরার একটা কারণ পরে আবিষ্কার করলাম, প্রেসিডেন্সি জেলে রাজবন্দীদের তখন কাপড় ইত্যাদি দেয় না। চিঠিপত্রও একান্ত বিরল এবং অনিয়মিত। রাজবন্দী হয়ে বাড়ী থেকে কাপড় আনিয়ে পরাও অনেকে অন্যায় মনে করেন।

কেবল অমরবাবুকে আর সুধীনবাবুকে দেখি, ওর মধ্যেও মোটামুটি ফিটফাট, প্রফুল্ল। সুধীনবাবু মাঝে মাঝে মাঠের ভিতর দাঁড়িয়ে বোধ হয় আমার তখনকার দিনের পালোয়ানি চেহারা দেখে বুকের উপর বাঁ হাত রেখে ডান হাত দিয়ে ঠুকে আমায় চ্যালেঞ্জ জানান। আমি নিঃশব্দে হেসে সে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করি।

একদিন দুপুরের পরে ডাক পড়লো জেলের ফটকে। দেখি দশ বারজন বন্ধুবান্ধবকে জেলের বিভিন্ন স্থান থেকে ও অন্যত্র থেকে নিয়ে এসেছে সনাক্ত করাবার জন্যে। তার মধ্যে আছেন অধ্যাপক শরৎ ঘোষ, অধ্যাপক বিপিন দে, সাংবাদিক সুরেন সিংহ এবং আরও কয়েকজন। চোখ মুখের অবস্থা প্রায় কারও সুবিধার নয়। গোল্ডি, হিল এবং জনকতক বাঙালী অফিসারও আছে এক পাশে। আমরা যখন সবাই একত্র জড়ো হয়েছি, একজনকে ধরলাম। জিজ্ঞেস করলাম, "সব স্বীকার করেছ কেন ?"

"কি করব ? দেখুন, অ—বাবু সব বলে দিয়েছেন।"

এই অ—বাবুও সেখানে হাজির ছিলেন।

"অ—বাবু বলে দিয়েছে বলে তোমাকেও বলতে হবে? দালান্দা হাউজে গিয়ে কাগজ চেয়ে নিয়ে আজই লিখে পাঠাবে, যা-কিছু বলেছ, পুলিশের তাড়নায় বলেছ, সব মিছে কথা। আজই লিখবে, তা নইলে মরবে।"

"নিশ্চয় লিখব।"

বন্ধুরা সবাই নীরব। আমিই একা কথা বল্‌ছি। কাজেই সহজেই হিলের নজর পড়েছে আমার দিকে। গট্‌মট্‌ করে এসে জিজ্ঞেস করলে, "You are talking to him?"

"Why should I not?"

তখন এক হাতে আমায় ধরলো, এক হাতে বন্ধুটিকে ধরলো, নিয়ে গোল্ডির কাছে হাজির করলো।

"Mr. Goldie, he was talking to him."

গোল্ডি একবার আমার মুখের দিকে তাকিয়ে চোখ নীচু করে বললে, "All right, I take note of it."

আমরা যত জন, তত জন উড়িয়াকে রাস্তা থেকে ধরে নিয়ে এল। আমাদের এক একজনের পাশে পাশে ওদের এক একজনকে দাঁড়ো করিয়ে দিয়ে ২০।২৫ জনের এক লাইন করলো। এ রকম বাইরের লোক মিশানোর কি অর্থ হয় বুঝলাম না। বাঙালী ভদ্রলোকের আর উড়িয়া ঠাকুর চাকরের তো চেহারা থেকেই আলাদা করে ফেলা যায়। আমার কিন্তু জাঙ্গিয়াটা ঢেকে কোথা থেকে একটা ধুতি আর একটা বোতামহীন সার্ট পরিয়ে দিল। জাঙ্গিয়াও ধুতির ভিতর দেখা যায় আর জামা কাপড় দেখলেই বোঝা যায়, ওসব আমার নয়, অত্যন্ত অস্বাভাবিক রকমে সাজানো হয়েছে।

সাক্ষী যাদের একে একে আন্‌লো, সবাই আমার দিকে বিশেষ-ভাবে তাকালো, কিন্তু কেউই সনাক্ত করলো না। কাউকেই করলো না। কেবল একটি বিহারী ছোক্‌রা কনষ্টেবল বিপিনবাবুকে দেখিয়ে বললো—"আমি এই বাবুকে গুলি ছুঁড়তে দেখেছি।"

গোল্ডি বললে, ভালো করে দেখো। কনষ্টেবলটি জোর দিয়ে বললো, আমি নিশ্চয় দেখেছি।

মামলা কিন্তু কারও নামেই হ'ল না।

দু সপ্তাহ জেলে কাটাবার পর আবার একদিন সকাল সকাল খাইয়ে কোর্টে নেবার জন্য জেল গেটে নিয়ে গেল। পুলিশের ব্ল্যাক মেরিয়া আসতে দেরী হচ্ছে দেখে এক ঘোড়ার গাড়ীতে তুলে দিল। সেই গাড়ীতে আর একজনকেও তুললো। তাঁকে নিয়ে যাবে জোড়াসাঁকো কোর্টে, আমায় নেবে বাঁকশাল ষ্ট্রীটে। ভদ্রলোককে আমি চিনতাম। ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কে দুখানা হাজার টাকার নোট ভাঙাতে গিয়ে, কাঁটাপুকুর ডাকাতির নোট সনাক্ত হয়ে ধরা পড়েছেন।

গাড়ীর ভিতরে ও উপরে পুলিশ পাহারা ছিল। তা গ্রাহ্য না করে ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করলাম, "সব স্বীকার করেছেন কেন?"

তিনি অত্যাচারের এক লম্বাচৌড়া কাহিনী কেঁদে বসলেন। বললেন, গোয়েন্দা সাহেবের বাড়ীতে নিয়ে ব্যাটারি লাগিয়েছে, আরও অনেক কিছু।

বললাম, অত্যাচার করবে, একি জানা ছিল না? অত্যাচার করলেই স্বীকার করতে হবে? স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করতে বললাম। তা তিনি করেন নাই। ফলে, কারাদণ্ড ভোগ করেন।

খানিক দূর যেতে সাম্নে থেকে এক ব্ল্যাক মেরিয়া এসে গাড়ি থামালো। দুজন সার্জেন্ট ছিল। একজন বললো, প্রেসিডেন্সি জেলের কাণ্ড দেখ! এই বন্দী সম্বন্ধে আমাদের লালবাজারে এত সাবধান বাণী শোনালো, আর একটু দেরী না করে প্রেসিডেন্সি জেল একে এই ছ্যাঁকড়া গাড়ী করে পাঠিয়ে দিয়েছে! পাঠিয়েছে কিন্তু হাতকড়ি লাগিয়েই।

কোর্টে নিয়ে গেল। সেদিনও ঐ অবস্থা। অনেকক্ষণ বাদে যখন গাড়ীর দরজা খুললো, সেই প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট, আর সরকারী উকিল সামনে। সরকারী উকিল বললেন, আমি এক মাসের সময় চাই।

ম্যাজিষ্ট্রেট বলে, কেন, সাধারণ এক অস্ত্র আইনের মামলা, বারবার কেন মুলতবী রাখবে?

উকিল বলে, বন্দী আমাদের হাতে নেই (অর্থাৎ আমি পুলিশের হেপাজতে না থেকে জেল হেপাজতে), কাজেই অনুসন্ধানে দেরি পড়ে যাচ্ছে।

ম্যাজিষ্ট্রেট বলে, না, আমি দুই সপ্তাহের সময় দিচ্ছি।

আবার গাড়ী বন্ধ, আবার জেল। কোর্টে যাবার আগেই জেলের বন্ধুরা বলেছিলেন, মাম্লা হবে না, ষ্টেটপ্রিজনার করবে। এবারে তাঁরা আরও জোর করেই বললেন, ষ্টেটপ্রিজনারই হবে। ৪নং সেলের দেবেনবাবুও মশার পিস্তলসহ ধরা পড়েও ষ্টেটপ্রিজনার হয়েছেন। ও-যুগে ওরকম অনেকের বেলায় হয়েছিল। ওরা আশা করেছিল এবং আমাদের অনেকবার বলেওছিল, ষ্টেটপ্রিজনার যাদের করা হয়েছে, তাদের সারা জীবন রাখা হবে।

কথাবার্তা বলা নিষেধ সত্বেও এবং তার সুযোগও বিশেষ না থাকা

সত্ত্বেও নানাভাবে কথাবার্তা ব'লে, বই প'ড়ে আগের মতোই আরও পনের দিন কাটিয়ে দেওয়া গেল। বর্ষা এসে পড়লো। দরজার গোড়ায় ব'সে মেঘ দেখি, আর আমার গলাতেও গাই—

"মেঘের পরে মেঘ জমেছে
আঁধার করে আসে
আমায় কেন বসিয়ে রাখ
একা দ্বারের পাশে।
কাজের দিনে নানা কাজে
থাকি নানা লোকের মাঝে
আজ আমি যে বসে আছি
তোমারই আশ্বাসে।"

এর ভিতর তুদিন তুটো ছোটখাটো ঘটনা ঘটলো। তুটি ইউরোপিয়ান ওয়ার্ডার সংক্রান্ত। তুটিরই নাম পুর্বে বলেছি। ক্যারিক্ ছিল রাজবন্দী কয়েদি সবার সম্পর্কে অত্যন্ত কড়া, কেবল নিজের সম্পর্কে নয়। অশিক্ষিত মনের এইটি শ্রেষ্ঠ পরিচয়। যেদিনই কয়েদীদের জন্ম পাটনাই মটরের ডাল হ'ত, ও রান্না ঘর থেকে আটার রুটি আর ডাল আনিয়ে খেত। মাইনে যেদিন পেত, সেদিন যদি আমাদের ওয়ার্ডে ওর রাতের বেলায় ডিউটি থাকতো, নীচের তলায় কারও আর ঘুমোবার উপায় থাকতো না। মদ খেয়ে এসে বারান্দায় নেচে বেড়াতো আর গান গাইতো।

একদিন সন্ধ্যায় বন্ধ করবার বেলায় আমার ঘরে ঢুকলো তল্লাসী নিতে। আমার জাঙ্গিয়ার পকেটে হাত ঢুকিয়ে আমার তখনকার দিনের চেহারা সত্ত্বেও ওর বোধ হয় মদের ঝোঁকে একটু বদরসিকতার

খেয়াল জেগে উঠলো। আমি ঘরভাঙা চীৎকার দিয়ে বলে উঠলাম, "What's that?" এক দৌড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে তাড়াতাড়ি তালা বন্ধ ক'রে দিল। আর কোনো দিন আমার ঘর তল্লাসী করতে ও আসে নাই।

আর একটি ওয়ার্ডার ডিসেণ্ট। ফতে বাহাদুর ছাড়া আমার আর একজন স্পেশাল ওয়ার্ডার জুটেছিল কেদাররাম। কাজ কর্ম তো কিছুই নেই। সে বসে বসে ঝিমোত। একদিন ডিসেণ্ট তাকে বলে, তুমি বসতে পাবে না, দাঁড়িয়ে ডিউটি দেবে।

কেদাররাম বলে, তুমিও ওয়ার্ডার, আমিও ওয়ার্ডার। তুমি আমায় হুকুম করবার কে?

ডিসেণ্ট চীৎকার ছেড়ে বলে, আমি হুকুম দিচ্ছি, তুমি দাঁড়িয়ে ডিউটি দেবে। কেদাররাম কথার ঝোঁকে একবার উঠে পড়েছিল। এখন সে সমানই চীৎকার করে বললো, আমি বসে ডিউটি দেব, তুমি যা করবার কর।

ব'লে বসে পড়লো।

এ নিয়ে আফিসে কি হয়েছিল জানি না। কিন্তু সে ডিউটি থেকেও সরলো না, দাঁড়িয়েও প্রায় কোনোদিন ডিউটি দিল না, ডিসেণ্টও আর কোনো দিন ওকে ঘাঁটালো না।

একদিন বাথরুমে যাবার পথে কেদাররাম আমায় বলে, আপনার যদি কারও কাছে চিঠিপত্র দেবার থাকে দেবেন।

কুন্তল, চারু, অমর চাটার্জি—ওঁদের খবরের জন্য আমি ব্যস্ত ছিলাম। চিঠিও দিয়েছিলাম, জবাবও পেয়েছিলাম, কোনো গোলমালও তা নিয়ে হয় নাই। কুন্তলের জবাবের সংকেতে বুঝলাম, অমরদা তখন নিরাপদে গৌহাটিতে পৌঁছে গেছেন।

কেদাররাম বড়ো কৃতজ্ঞভাবে জানাল, যাঁর কাছে চিঠি নিয়ে গিয়েছিল তিনি ওকে খুব খাতির যত্ন করে খাইয়েছেন, এবং দুটি টাকা দিয়েছেন। দরকার মতো আবার খবর নিয়ে যেতে বলেছেন। বারবার পাঠানো তখনকার দিনে সুবিধার ব্যাপার নয় বলে আর পাঠাইনি।

এর পরে যেদিন কোর্টে নিল, সেদিন কিন্তু ব্ল্যাক মেরিয়ার দরজা খুলে আমায় কোর্টের ভিতরই নিয়ে গেল। কোথা থেকে যে ছয়টি সার্জেন্ট বাছাই করে এনেছিল জানিনে—ইংরেজের চেহারা নয়, জার্মান চেহারা, সাড়ে ছয় ফুট করে লম্বা—সবগুলোই প্রায় সমান। দু'জন আগে, আর চারজন পেছনে। আসামীর কাঠগড়ায় আমায় ঢুকালো না, জীবন্ত কাঠগড়া হয়ে ওরাই দাঁড়ালো। ওদের ফাঁক দিয়ে দেখলাম, আমার নাম ডাকতে, উকিলদের মাঝখানে বাবা উঠে দাঁড়ালেন, আমায় দূর থেকে দেখতে চেষ্টা করছেন।

কিন্তু দু' মিনিটের বেশী আমার কোর্টে থাকা হল না। এই কোর্টে ম্যাজিষ্ট্রেটটি বাঙালী, তবে তাঁকে বিশেষ কিছু করতে হয়নি। সরকারী উকিলই এসে বললেন, You are discharged. হাতের হাতকড়ি খুলে দিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বুকের উপর একটি চাপড় দিয়ে বললেন, But you are re-arrested under the Defence of India Act.

সেই সার্জেন্টরা আবার আমায় ফিরিয়ে নিয়ে এসে ব্ল্যাক মেরিয়াতে ঢুকালো। নতুনের মধ্যে হ'ল হাতকড়িটি খসে গেল।

এবারে নিয়ে গেল আবার সেই ইলিশিয়াম রোতে (বর্তমান লর্ড সিংহ রোড)। কয়েকটি অফিসারের মাঝখানে একখানা খালি চেয়ারে বসতে দিল। ইসমাইল বলে একটি অফিসার কয়েকখানি ফটো নিয়ে আমার পাশে দাঁড়িয়ে বললো, এঁদের চেনেন?

আমি বললাম, একবারেই তো বলে দিয়েছি, আমি কোনো প্রশ্নের জবাব দেব না।

সাম্‌নের একটা চেয়ারে বসে নলিনী মজুমদার মোটা একটা খাতার পাতা উল্টাচ্ছিল। বলে উঠলো, There are more than 50 statements against Bhupen Datta. সাহেবকে ব'লে দিন "regulate" করে দিতে। এই ছিল ওদের তখনকার দিনের ভাঁওতা ও ভাষা। More than 50 statements বললে ঘাবড়ে যাব, আর "regulate" করা মানে Regulation III-তে সারা জীবন ষ্টেট প্রিজনার করে রাখবে।

একটি মারাঠী অফিসার ঘরে ঢুকলো। আমার দিকে দেখিয়ে পাশের একটি লোককে জিজ্ঞেস করলো, Why has he been arrested ?

সে জবাব দিল, ওঁকেই জিজ্ঞেস কর, he speaks English perhaps better than you do.

তখন ন্যাকামি করে আমায় জিজ্ঞেস করে, Why have you been arrested ? What's the charge against you ?

আমি বলি, You know that better than I do.

আর কথা না বলে সরে পড়লো। এর পর ফটো তুললো, আঙুলের টিপ সই নিল। তারপর উপরে নিয়ে গেল গোল্ডির কাছে। সে বলে, You still refuse to answer questions by a foreign Government's officers ?

Yes.

এর পর বোধ হয় আমার নামে Defence Actএর অর্ডার সই করতে করতে বলে—"Will you tell me where is Nawab Habiulla Saheb ?"

আমি চুপ করে রইলাম।

নবাব হবিউল্লা সাহেব আমাদের ভিতর কারও নামই ছিল না। দালান্দা হাউসে তখন ছিলেন এক বন্ধু, টাকি-সৈদপুর বাড়ী, শ্রীআশুতোষ রায় চৌধুরি। তিনি পুলিশের সঙ্গে এবং অন্যান্য বন্ধুদের সঙ্গে ডাঃ যাদুগোপাল মুখার্জি সম্পর্কে পুলিশ যত রকম খবর পেয়েছে, সব সংগ্রহ করে গোপনে আমায় পাঠিয়েছিলেন—যাদুদার নামের বদলে নবাব হবিউল্লা সাহেব নামটি ব্যবহার করেছিলেন। যে-বৃহস্পতিবার আমি ধরা পড়ি, তার পরের শনিবার আমার গৌহাটিতে যাবার কথা ছিল, সেখানে যাদুদার সঙ্গে দেখা হবে, চিঠিটা তাঁকে দেখাবো ব'লে নষ্ট না করে পকেটেই রেখে দিয়েছিলাম, ধরা পড়ার সময় চিঠিটাও ধরা পড়ে। তবে তা'তে অন্য অনিষ্ট হবার মতো কিছু ছিল না।

নীচে নিয়ে এল। গাড়ী তৈরি করছে, আমি দাঁড়িয়ে আছি। ইন্স্পেক্টার কালিসদয় ঘোষাল বললে, ভূপেনবাবু, রোদে দাঁড়িয়ে আছেন কেন? এখানে ছায়ায় এসে দাঁড়ান। কাছে যেতে বললে, অনিষ্ট হয় এমন কিছু আমি বলতে বলছিনে, দু'একটা প্রশ্ন আপনাকে করবো?

আমি বললাম, Have you been asked to interrogate me?

ও বল্লে, আমার authority কিছু আছে কি না যদি জানতে চান, তা হলে বলি, আছে।

তারপর একটু ঢোক গিলে মৃদুস্বরে বললে, জিজ্ঞেস করতে পারি?

You may not.

আচ্ছা, থাক্, থাক্।

আবার জেল। বন্ধুরা উৎফুল্ল, কারণ, মামলা গেল, এখন হয়তো খালাস পাবেন।

একটু বাদে কিন্তু জেলার এল। আমায় নিয়ে চললো অন্ত কোথায়। এই যে কথা প্রায় না বলেও বন্ধুত্ব, সেই বন্ধুত্বের মায়া ছেড়ে যেতে একটু কেমন লাগলো। যে দুটো ঘরের দিকে একটু দৃষ্টি দিতে পারি, তার অধিবাসীদের সঙ্গে চোখে চোখে বিদায় হয়ে গেল।

এসে ঢুকলাম বিখ্যাত ৪৪ ডিগ্রীতে। দেখলাম আমার আগে আগে একটি মেট সব সেলের সাম্‌নেকার কাঠের দরজাগুলো বন্ধ করে দিতে দিতে চলেছে। ওখানকার ঐ রেওয়াজঃ কথা তো বলতে পাবেই না, কেউ কারও মুখও দেখতে পাবে না। আমায় নিয়ে যে-ঘরটায় ঢুকালো, সেটা ২১নং সেল, ফাঁসির কামরা। সেলে ঢুকবার পর আধ মিনিটখানিকের জন্য আমার সেলেরও দরজা বন্ধ হয়ে গেল। বুঝলাম, আমার এই ঘরে আর কেউ ছিলেন, আমাকে ঢুকাবার আগে তাঁকে ২২নংএ ঢুকিয়েছে। তার পর তাঁকে আমার ঘরের সাম্‌নে দিয়ে অন্যত্র চালান করেছে। আমার ঘরের সাম্‌নে দিয়ে যেতে যে-সময়টা লেগেছে, সেই সময়টা আমার ঘরেরও দরজা বন্ধ হল। পরে শুনলাম তাঁকে নিয়ে গেল ইউরোপিয়ান ইয়ার্ডে আমি যে-সেলে ছিলাম, সেই সেলে। এবং তিনি আমাদের কিরণ দা—কিরণ মুখার্জি।

আরও শুনলাম, মেদিনীপুর জেলে একটা ছয় দিনের হাঙ্গার ষ্ট্রাইক হয়ে গেছে। তখন অনেককে সব অন্যান্য জেলে সরিয়ে দিয়েছে। তার ভিতর কিরণদা এসেছেন প্রেসিডেন্সিতে।

একটু বাদে সেই ইউরোপিয়ান ওয়ার্ডার রবার্টসন এল। এসে বলে, দেখুন, এই যে ভদ্রলোক ছিলেন এখানে, বয়স্ক লোক, হাত ভাঙ্গা, পা ভাঙ্গা। ওঁর যাতে কোনো অসুবিধা না হয়, সর্বপ্রকারে আমরা সেই চেষ্টা করতাম, আর উনি করেছেন কি জানেন?" সেলের তালা

বন্ধ করার জায়গায় যে একটা ঘুলঘুলি মতো থাকে, সেইটে দেখিয়ে বলে, "উনি এখানে পা দিয়ে ঐ অ্যান্টিসেলের দেয়ালের উপর দিয়ে ওপাশের সেলের লোকের সঙ্গে কথা বলতেন। আপনি যেন আবার ঐরকম দুষ্টুমি করবেন না।"

মনে মনে বললাম, পাগলা সাঁকো নাড়িস্ নে। বেশ পন্থাটা দেখিয়ে দিলে।

এইবারে সত্যি সত্যি সেলে এলাম। বোধ হয় হাত সাতেক লম্বা, হাত পাঁচেক পাশে এক একটা ঘর। সামনে লোহার গরাদে দেওয়া দরজা, তার সামনে অতটা সাইজেরই একটা দেয়ালে ঘেরা জায়গা, তার উপরে ছাদ নেই। এইটেরই নাম অ্যান্টিসেল। তারই সাম্‌নে ঐ কাঠের দরজা—যা অপর রাজনৈতিক বন্দী যাবার আসবার সময় দিনে পঞ্চাশবার বন্ধ হয় আর খোলে।

আমার স্পেশাল ওয়ার্ডার থাকাতে সুবিধা ছিল—আমার সেলের দরজা নেহাৎ ভিসেণ্ট বা ক্যারিক থাকলেই বন্ধ করতো।

সেলের মেজেতে যুগযুগান্তের স্বাস্থ্যরক্ষার চেষ্টায় অথবা বড় সাহেব আর জেনারেল সাহেবকে দেখাবার চেষ্টায় এক ইঞ্চি দেড় ইঞ্চি পুরু করে চুণের পোঁচ পড়েছে। হাওয়া প্রবেশের জন্য সামনের ঐ দরজাই যতোটা সাহায্য করে—তারও সমান্তরাল কোনো জান্‌লা নেই, আবার অ্যান্টিসেলের একটু পরেই জেলের বাইরের উঁচু দেওয়াল। কাজেই হাওয়ার বালাই সেলে প্রায় নেই। যা আছে, তাতে বরং অসোয়াস্তিই বেশী সৃষ্টি হয়। কারণ, এখানে আলাদা বাথরুম না থাকাতে ঘরের টুক্‌রিই সম্বল—হাওয়া যেটুকু ঢুকতে পারুক বা না পারুক, ওরই সুবাস বহন করে আনে। এই হাওয়ার অবস্থা। আর আকাশ দেখতে হলে খাটখানাকে টেনে দরজার সামনে

নিয়ে আসতে হবে। তাই নিয়ে আসতাম, কারণ, জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়ের গরম। একখানা হাতপাখা অবশ্য দিয়েছিল।

রাত্রে পড়বারও এখানে উপায় ছিল না। কারণ, হারিকেন থাক্‌তো ঘরের বাইরে। দরজার কাছে খাটে চীৎ হয়ে শুয়ে সেই আলোতেই পড়াশুনো যা করবার করতে হ'ত।

ঘরে খাবার জলের একটা কুঁজো ছিল। কিন্তু সারা দিনের স্নানের, কাপড় কাচার, বাসন মাজার জন্য এক বাল্‌তি জল ঐ অ্যাণ্টিসেলে দিয়ে যেত। আমার আরও একটা সুবিধা ছিল। বাসন মাজার কাজটা আমার নিজের করতে হ'ত না—স্পেশাল ওয়ার্ডার ওটা কোনো কয়েদিকে দিয়ে করিয়ে নিত। কাপড়ের বালাই তো ছিলই না। জাঙ্গিয়া ছাড়া একটা তোয়ালে দিয়েছিল।

সেইদিন সন্ধ্যাতেই বাবা এলেন দেখা করতে। জেল গেটে ডাক পড়লো। বাবা জালের দরজার ওপাশে, আমি এপাশে, আর আমার পাশে দাঁড়িয়ে বনবিহারী মুখার্জি—তখন বোধ হয় সাব ইন্‌স্পেক্টার।

অন্য কথার ভিতর বাবা বললেন, ওঁরা বলছেন, তুমি যা জান, সব যদি স্বীকার কর, তা হলে তোমায় স্বগৃহে আবদ্ধ রাখবেন।

বনবিহারী মাথা নীচু করে বল্‌ছে, হাঁ সেরকম আমরা ক'রে থাকি।

ওর এই মাথা নীচু করে থাকার সুযোগ নিয়ে বাবা সঙ্গে সঙ্গে সজোরে মাথা ও চোখ নেড়ে সাবধান করে দিলেন, খবরদার, কিছু যেন না স্বীকার কর।

আমি বললাম, আচ্ছা, সে দেখা যাবে।

সেইদিন আমার সম্পত্তি হল। বাবা একটা ট্রাঙ্কে করে কিছু কাপড় জামা জুতো, বাসনপত্র ও রামায়ণ মহাভারত এবং অন্যান্য কিছু বই দিয়ে গেলেন।

থালা বাটি এল, বই গেল সেন্সারে, এবং এখন আমি কাপড় পরতে পারি কি না, তার অনুমতি সাপেক্ষে কাপড়গুলো গেটে জমা হ'ল। পরদিন পুলিশের অনুমতি নিয়ে সেগুলো আমায় পাঠিয়ে দিল।

৪৪ ডিগ্রির ব্যাপার সব আলাদা। প্রথম এগারটা সেলে তখন থাকে দলের মধ্যে যারা নেতৃস্থানীয় ছিল, কিন্তু স্বীকারোক্তি করেছে, তেমন সব লোক। সিপাই কয়েদির কাছে জানলাম, এদের কয়েকজনকে মাঝে মাঝে দুপুরবেলা জেলগেটে ডেকে নিয়ে যায়—সি. আই. ডি. অফিসাররা খাবার, কাপড় জামা সব নিয়ে আসে—আর এদের কাছ থেকে জেলের অন্যান্য বন্দীদের সম্পর্কে সব খবর সংগ্রহ করে নিয়ে যায়। সিপাই কয়েদিরা ওদের অত্যন্ত ঘৃণা করে। অন্য ইয়ার্ডে যে সব ইউরোপিয়ান ওয়ার্ডারের ব্যবহার ভাল, এদের ভয়ে এখানে তাদের ব্যবহারও খারাপ।

এর ভিতর একজন ছাড়া আর সবাই ছিল একটা ভিন্ন দলের লোক। কাজেই নাম শুনেও কাউকে চিনতে পারলাম না।

এদের এগারটা সেল বাদ দিয়ে ছিলেন চারজন মুসলমান রাজবন্দী। এঁরা সবাই মৌলানা আজাদের পরিচিত কর্মী—দুজনের বাড়ী বোধ হয় ছিল রাজসাহীতে।

তার পরের সেলগুলিতে ছিলেন সঞ্জীব ব্যানার্জি—রাসবিহারী মনে করে এঁকে পূর্ব এসিয়া অঞ্চলে সমুদ্রের ভিতর কোনো জাহাজে ধরেছিল। ধরে রেঙ্গুন জেলে দশমাস আটক রাখে, তারপর এখানে পাঠিয়ে দেয়। বেশ শিক্ষিত, সদাচঞ্চল, হাসিখুসি, সুপুরুষ ভদ্রলোক। আর ছিলেন রাধাকান্ত বোস, আমার পূর্বপরিচিত, রাসবিহারী বাবুর আত্মীয়, এবং চন্দননগরে এঁরা এক বাড়ীতেই থাকতেন। আমি প্রেসিডেন্সি জেলে থাকতেই ওঁকে কোন্ দ্বীপে অন্তরীণ করবার জন্য

নিয়ে যাচ্ছিল। শিয়ালদ' ষ্টেশনে পুলিশের অমনোযোগের সুযোগ নিয়ে এক ট্যাক্সি ভাড়া করে বরাবর চন্দননগরে পৌছে যান। এবং শেষ পর্যন্ত চন্দননগরেই থাকেন। আর ছিলেন সুরেশ দাসের সম্পর্কিত দুই ভাই। সুরেশবাবু মাকে ও স্ত্রীকে নিয়ে চন্দননগরে এক বাড়ী ভাড়া করে ছিলেন পলাতকদের আশ্রয় দেবার উদ্দেশ্যে, আর ভাই দুইটি ঘিয়ের ব্যবসা করতেন। এঁরা রাজনীতির কিছুই জানতেন না। কাজেই অত্যন্ত ম্রিয়মাণ থাকতেন। এঁরা চারজন ছিলেন Ingress into India Act.-এর বন্দী।

আমার ঠিক পাশের সেলে থাকতো রাণাঘাটের একটি ছেলে, ভারতরক্ষা আইনের বন্দী, এক মাস জেলে থাকবে, তারপর বাইরে অন্তরীণ হয়ে যাবে। প্রথম রাত্রে সে দেয়ালে পাখার ডাঁটা দিয়ে ঠুকে ঠুকে জিজ্ঞেস করলো আমার নাম কি, কোথায় ধরা পড়েছি ইত্যাদি।

আমিও ঐ উপায়ে জবাব দিলাম, বোধ হয় সে সব ধরতে পারলো না। শেষ রাত্রে দরজা খুলে দিতে শুনি গান গাইবার অছিলায় ঐ সব প্রশ্নই জিজ্ঞেস করছে। আমার স্পেশাল ওয়ার্ডার থাকায় সেভাবে জবাব দেবার সুযোগ হল না। পাখার এক অংশ ভেঙ্গে নিয়ে, আগের দিন সন্ধ্যায় একটি ছোট পেরেক কুড়িয়ে পেয়েছিলাম, তাই দিয়ে সব লিখে এক ফাঁকে দেয়ালের উপর দিয়ে ফেলে দিলাম।

এখানে বেড়াবার ধরন দেখলাম স্বতন্ত্র। তখন ষ্টেট প্রিজনারদের দুটো শ্রেণীতে ভাগ করেছে, X Class আর Y Class, অধিক আর অল্প বিপজ্জনক। X Class-এ ঐ ইউরোপিয়ান ইয়ার্ডের ওঁরা—কারও সাথে কারও বাক্যালাপ নিষেধ। আর Y Class এই ৪৪ ডিগ্রিতে যাঁরা আছেন তাঁরা। এঁরা সকাল বিকাল যখন বেড়াতে বের হতেন তখন কথা বলতে পেতেন, কিন্তু সবার সঙ্গে সবাই নয়।

ঐ প্রথম দিককার সেলে যে ১০।১১ জন ছিলেন, তাঁদের সেলগুলো যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে সামনের দেয়ালে মোটা করে একটা চুণের দাগ দেওয়া। ওঁরা ঐ অতটা জায়গা ধরে বেড়াতে পারবেন, আর পরস্পরে কথা বলতে পাবেন। তার পরের মুসলমান চার জনের জন্য ঐ রকম ভিন্ন ব্যবস্থা এবং তারপরের চারজন Ingress into India Act-এর বন্দী—তাঁরাও ভিন্ন। এঁরা দুই দল পরস্পরের সঙ্গে কথা বলতে পারবেন না, কিন্তু ঐ চুণের দাগ মেনে বেড়াতে ও নিজেরা কথা বলতে পারবেন। আর আমি আর ঐ রাণাঘাটের ছেলেটি ভারত রক্ষা আইনের বন্দী। আমরা ঐ যার যার অ্যান্টি-সেলটুকুর বাইরে যেতে বা কথা বলতে পাব না। একদিকে ১ থেকে ২২ নং পর্যন্ত সেল, অপর দিকে ২৩ থেকে ৪৪নং পর্যন্ত। মাঝখানে বসে আছে ইউরোপিয়ান ওয়ার্ডার। আইন ভেঙ্গে কথা বলতে দেখলেই কয়েদি মেটকে বলে—আর সে চীৎকার করে, "অ্যাই, বাত মাৎ করো।" আর রাজবন্দীরা সব মুখ ঘুরিয়ে যে যার বেড়াতে থাকে।

আমাদের অ্যান্টিসেলের দরজা বন্ধ থাকবার কথা। কিন্তু স্পেশাল ওয়ার্ডার আমার সেল খুলেই রাখতো। আর সেই সুযোগে সঞ্জীববাবু, রাধাকান্তবাবু, মহেন্দ্র ও বিমল (সুরেশবাবুর দুই ভাই) আমার দরজা পর্যন্ত এসে ফাঁকে ফাঁকে কথা বলে যেতেন। মহেন্দ্র ও বিমল যেন আমায় ওখানে পেয়ে খুব একটা বল পেল। রাধাকান্তবাবুও ভারি খুসী। সঞ্জীববাবু বেশ স্বাস্থ্যবান লোক, আমার চেহারা দেখে সেই ইউরোপিয়ান ইয়ার্ডের সুধীনবাবুর মতো কুস্তির চ্যালেঞ্জ জানিয়ে যান। ভদ্রলোকের নিজের কতকগুলো ভাল ভাল বই ছিল। লাড্রি ব'লে একটি নতুন ইউরোপিয়ান ওয়ার্ডার এসেছে। সে ওখানকার কর্তৃপক্ষের কাছে ভাল ব্যবহার পেতনা। আমার কাছে এসে

সুখদুঃখের কথা কইতো। সে-ই আইন ভঙ্গ ক'রে সঞ্জীববাবুর কাছ থেকে বই এনে আমায় পড়তে দিত। রাজবন্দীরা পরস্পরের বই পড়তে পাবে না, এই ছিল টমসন সাহেবের অথবা আই. বি.রই হুকুম। খবরের কাগজ তখন রাজবন্দীর পক্ষে বিষ। লাভ্রি মাঝে মাঝে স্টেট্‌সম্যান এনে দিত।

আমার স্পেশাল ওয়ার্ডার কেদাররাম হঠাৎ একদিন বদলি হয়ে গেল। তার জায়গায় এল এক সাঁই পালোয়ান—নাম জগদেও তেওয়ারি। এ লোকটিও দরজা খুলে রাখতো, কিন্তু বেশ নজর রাখতো, আমি কার সঙ্গে কথা বলি, সেই দিকে। বিমল আর মহেন্দ্র আমার সঙ্গে কথা বলবার সুযোগ খুঁজে নিত। আর, জগদেও জিজ্ঞেস করতে সুরু করলো, এরা নিশ্চয়ই আপনার চেনা। আমি যতো বলি, এখানেই চেনা হয়েছে, ও ততো আমায় জেরা করে। আমার কাছ থেকে জবাব পেয়ে শেষ পর্যন্ত যখন খুসি হ'ল না, তখন বেড়াবার সময় হলেই ও বাইরে থেকে দরজাটি বন্ধ করে দিত। এই লোকটির বোধ হয় জেলবিভাগ ও গুপ্ত পুলিশ বিভাগ দুই দিক থেকেই অর্থাগম হ'ত।

ভারতরক্ষা আইনে সপ্তাহখানেক থাকবার পর একদিন গোল্ডি এল আমার সেলে। একখানা কাগজ বের করে হাতে দিল। তাতে পনের বিশটা নাম আছে যাদের সঙ্গে আমি রাজ্যধ্বংসের ষড়যন্ত্র করেছি, আর, এ করেছি, তা করেছি এই রকম পাঁচসাতটা চার্জ। আমি বললাম, I refuse to answer these charges. বল্লে, তাই লিখে দিন। লিখে দিলাম, ও চলে গেল।

পঁচিশ দিন ভারতরক্ষা আইনে থাকবার পর একদিন জেলার এসে জানাল, আমি ১৮১৮ সালের ৩নং আইনে ষ্টেট প্রিজনার হয়েছি।

তখনই আমায় ঐ ৪৪ ডিগ্রিরই অপর দিকে ২৬নং সেলে নিয়ে গেল। সন্ধ্যার আগে, অপরেরা তখনও বেড়াচ্ছেন। একটা অসাবধানতার ব্যাপার হয়ে গেল। তাঁদের বন্ধ না করেই আমায় বের করে ফেললো।

বিমল আর মহেন্দ্র করুণভাবে চেয়ে রইলো, রাধাকান্ত আগেই চলে গেছেন এবং সরে পড়েছেন। সঞ্জীববাবু নমস্কার জানালেন, আমি সবার প্রতি একটি ক্ষুদ্র নমস্কার জানিয়ে অপর পাশে নির্বাসিত হ'লাম। শুনলাম, সেদিকে অপর কোন রাজবন্দী ছিল না। সেইদিনই সকালে যাঁকে এনেছে, তাঁর নাম অমৃত সরকার। পরদিন ভোরে এলেন অন্নদা মজুমদার (বর্তমানে অমৃতবাজার পত্রিকায় কাজ করেন)—আমার পুর্বপরিচিত।

পরদিন সকালে ওঁদের সঙ্গে আলাপের সুযোগ হ'ল না, ওঁদের বেড়াবার সময়ই সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট এসে পড়লো। আমার ঘরে এসে জিজ্ঞেস করলো, Suppose, you are kept in this cell for the rest of your life, what will you be doing ?

"I shall be praying for the downfall of this Empire."

সেইদিন বিকেলেই আমাকে আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে চালান করে দিল।

আলিপুর জেলে

আলিপুর জেলের ভিতরের চেহারাটাই আলাদা। মাঝখানে চওড়া লাল রাস্তা জেলের ফটক থেকে অপর প্রান্তে গোশালা পর্যন্ত গেছে, দুই পাশে লাল লাল ব্যারাকগুলো, মাঝখানে ফুলের কেয়ারি করা বাগান।

দুপুরবেলা। আপিসে জেলার বা রাজবন্দীদের ভার যে ইউরোপিয়ান সার্জেণ্টের উপর—তারা কেউ উপস্থিত নেই। আর একজন সার্জেণ্ট আমায় নিয়ে গেল ম্যাজিষ্টেরিয়াল সেলে। বলে গেল, আপাততঃ এখানে থাকুন, তার পর জেলার বা সার্জেণ্ট-ইন্-চার্জ এসে যেখানে নেবার নেবে।

একটা গাছের ছায়ায় সবুজ ঘাসে ঢাকা একটা লনে শুয়ে বসে কয়েকজন কয়েদি গল্প করছে, দু'একজন ভিজে ছোলা গুড় দিয়ে খাচ্ছে। প্রেসিডেন্সি জেলে ঐ দুই মাস কাটাবার পর এদের এই নিশ্চিন্ত আরাম দেখে একটু আশ্চর্য হচ্ছি। একজন দেশী সিপাই এসে কাছে দাঁড়ালো। কয়েদিরা অপর জেলের সুপারিন্টেণ্ডেণ্টকে এক বিশেষ কুটুম্বে পরিণত করে ব্যাখ্যা করলো, টমসনের রাজত্বের চেয়ে এখানে আমরা অনেক সুখে আছি। মুলভেনি সাহেব বেজায় কড়া সাহেব, কিন্তু অমন সাহেব হয় না। এটা কি জেল বাবু? এটা আমাদের শ্বশুরবাড়ী। ঘণ্টা দুই এদের সঙ্গে গল্পে বেশ কাটলো।

চারটের সময় রায়ান সাহেব এলেন। অল্প কথার মানুষ, বল্লেন Please come with me, Babu.

কাছেই Misdeamnant Yard—এখন সেটার নাম হয়েছে

বোমা ডিগ্রি। দরজা খুলতেই যে দৃশ্য দেখলাম, সে আমার কল্পনার অতীত। একটি মোটাসোটা বোল সতের বছরের ছেলে চীৎকার করে লাফিয়ে এসে আমায় জড়িয়ে ধরলো, টানতে টানতে বারান্দায় তুললো। পরে জানলাম, এ আমাদের হরিদার ভাই মাখন চক্রবর্তী। হ্যারি এণ্ড সন্সে ধরা পড়েছে।

বারান্দায় উঠতে একজন বৃদ্ধ শিখ (হাওড়া গুরদোয়ারার দেওয়ান সিং) কতকটা যেন আশীর্বাদ করার ভাবে কাঁধে হাত দিয়ে ধরলেন। আর একজন দীর্ঘাকৃতি শিখ (কর্পোরেশন স্ট্রীট ডাকাতির চেৎ সিং) ভজন গাইছিলেন আর চুলের জটা ছাড়াচ্ছিলেন—একটা প্রাণখোলা হাসি দিয়ে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন।

ইতিমধ্যে বারান্দার অপর প্রান্ত থেকে খড়ম পায়ে, শুধু গা, মাঝারি-রকমের ভুঁড়ি আর কাঁচা পাকা গোঁপ নিয়ে সিগারেট টানতে টানতে হেসে আর চীৎকার করে মাখনকে ধমকাচ্ছিলেন, এদিকে নিয়ে আয় না! তিনি সেদিক ছেড়ে আসতে পারেন না—সামনে বড় এক ঝুড়ি লুচি, একখানা থোরায় ভরা রাবড়ি, আর সব বিভিন্ন পাত্রে কাটা পাঁউরুটি, ভাত, তরকারি, মাংস। ইনি খিদিরপুরের শিক্ষক দুর্গাচরণ বোস। রাজবন্দীদের খাওয়া দাওয়া দেখাশুনো করার ভার নিয়েছেন, সম্প্রতি রাতের খাবার বণ্টনে ব্যস্ত।

পাশে আরও দু'জন বসে। এর মধ্যে একজন হাওড়া শিবপুরের ননী গুপ্ত। এঁর কথা পরে বলব, সম্প্রতি বলার সময় নেই।—ওদিকে পেছনের দুটো দোতলার বারান্দা থেকে সমবেত কণ্ঠে বিষম চীৎকার চলছে।

পেছনের দরজার দিকে মাখনই নিয়ে গেলেন। রায়ান সাহেব মাঝের দরজাটি খুলে ধরলেন। এই বে-আইনী কাজটি এই অত্যন্ত

ধর্মভীরু আইরিস রোম্যান-ক্যাথলিক কর্মচারীটি প্রায়ই করেন। সবার সঙ্গে পরিচয় হ'ল, কোলাকুলি হ'ল। কয়েকজন সুপরিচিত নামের বয়োজ্যেষ্ঠ। তাঁদের পায়ের ধূলো নিলাম—এঁদের ভিতর ছিলেন ময়মনসিংএর হেমেন্দ্র কিশোর আচার্য চৌধুরি—পায়ের ধূলো নেওয়াতে এঁর ভীষণ আপত্তি এবং সে আপত্তি লাফ দিয়ে পেছনে সরে গিয়ে বজায় রাখলেন, তার বদলে দিলেন বুকজোড়া আলিঙ্গন। আর ছিলেন যশোরের বিজয় রায়, বা সে যুগের বিখ্যাত কবিরাজ মশায় এবং সিমলার অতীন বোস—এঁরই ছেলে অমরকে দেখে এসেছি প্রেসিডেন্সি জেলে। বাপ বেটা দু'জন দু'জেলে আটক আছেন—অথচ মুখভরা সে কি আনন্দ!

ওদিকে, ওপাশের দোতলা থেকে চীৎকার করছেন আর কয়েকজন। তাঁরা ষ্টেট প্রিজনার নন—Ingress into India Act and Foreigners' Ordinance-এর বন্দী। সবাই চন্দননগরের লোক। তাঁরা রাজবন্দীদের সঙ্গে মিশতে পারেন না। তাঁদের আমার সঙ্গে দেখা করাতে হলে একটা ইয়ার্ডের ভিতর দিয়ে নিয়ে যেতে হয়। রায়ান সাহেব ঠিক অতটা সাহস পান না।

এঁদের ভিতর ছিলেন শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস। পলাতকদের আশ্রয় দেবার জন্য তিনি সপরিবারে চন্দননগরে থেকে এক ব্যবসা শুরু করে-ছিলেন। তাই রাজবন্দী না হয়ে Foreigners' Ordinance-এ বন্দী হয়েছেন। তিনি চীৎকার করছিলেন, "ভূপেন, ভূপেন, কবে ধরা পড়লা? কুন্তল কই (কোথায়)?"

এঁর ঠিক বিপরীত—আমার পুরোনো সহপাঠী সৌরীন (সুপরিচিত নির্যাতিত বিপ্লবী নেতা অবিনাশ চক্রবর্তী মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র), ষ্টেট প্রিজনারদের অধিকৃত দোতলার বারান্দায় শ্রীরামপুরের জিতেন

লাহিড়ী ও ঢাকার প্রতুল গাঙ্গুলির পেছনে দাঁড়িয়ে চোখমুখ ও হাত সমানে নেড়ে ক্রমাগত ইসারা করছেন, তিনি যে আমার পরিচিত, তা যেন আমি কাউকে না জানতে দিই। গুপ্ত সমিতির সংস্কার!

আমি তাঁর ইঙ্গিতের নিষেধ না মেনে জিজ্ঞেস করলাম, সৌরীন, কেমন আছ?

মুখের ভাব পরিবর্তনে বুঝিয়ে দিলেন যেন সর্বনাশ হয়ে গেল।

বাইরের সংবাদে বহুকাল বঞ্চিত বন্দীরা আমায় প্রশ্নের পর প্রশ্নে জর্জরিত করে তুললেন। অধিকাংশ প্রশ্নই করলেন জিতেনবাবু, তিনি আমার বন্ধুবান্ধব অনেককেই চেনেন। সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সমীচীন মনে হ'ল না। সেগুলো পাশ কাটিয়ে গিয়ে অনেকেরই সংবাদের ক্ষুধা যথাসম্ভব মিটালাম।

রায়ান সাহেব ইতিমধ্যে দরজা বন্ধ করে দিয়ে চলে গেছেন। দেয়ালের উপর দিয়ে পরস্পরকে দেখা এবং কথাবার্তা চল্‌ছে।

অনেকের প্রশ্ন ফুরিয়ে গেছে, অনেকে মনে করলেন, এখন তো আমি থাকবই, পরে নিভৃতে সব জেনে নেবেন। গুর্খা সিপাই সঙ্গে নিয়ে প্রায় সবাই সামনের সেই রাস্তাটা দিয়ে বেড়াতে বেরিয়ে পড়লেন। প্রেসিডেন্সি জেলের অবস্থা ও ব্যবস্থা থেকে সবই পৃথক। এবং প্রেসিডেন্সি জেল থেকে আসছি বলেই দুর্গাবাবু আর মাখন আদর ক'রে ডেকে কিছু খাওয়ালেন। খেতে খেতেও কতো সংবাদের আদান প্রদান হল।

তারপর দরজার ফাঁকে ডাক পড়লো। মাখন এসে বললো, মনোরঞ্জনদা (গুপ্ত) ডাকছেন। দলের নেতৃস্থানীয় এঁর কথা আগেই জানতাম। কে কোথায় আছেন এটা বলা আমাদের তখনকার দিনের স্বভাবের বাইরে ছিল। সে কথা মনোরঞ্জনদা জিজ্ঞাসাও

করেন নাই। আর সব কথাই তিনি আমার কাছে সবিস্তারে জেনে নিলেন।

যাঁরা বেড়াতে বেরিয়েছিলেন তাঁরা ফিরলেন, হাত মুখ ধুয়ে সবাই যাঁর যাঁর সেলে রাত্রের মতো বন্ধ হলেন। রায়ান সাহেব ঘরে ঘরে তালা লাগিয়ে সবাইকে Good-night জানিয়ে সে দিনের মতো বিদায় হলেন।

ঘরের ভিতর ডেক চেয়ার যার যার দরজার কাছে টেনে নিয়ে মাখনের সঙ্গে অনেক রাত অবধি গল্প চললো। এই গল্পের ভিতরই জেনে নিলাম: হরিদা, পাটনার ভগবান দাস গুপ্ত, খিদিরপুরের শিক্ষক আশুতোষ ঘোষ, শ্রমজীবী সমবায়ের রামচন্দ্র মজুমদার এবং বালেশ্বর ইউনিভার্সাল এম্পোরিয়ামের শৈলেশ্বর বসুর ভাই শ্যাম দুই তিন দিন আগেই ওখান থেকে বদলি হয়ে ঢাকা জেলে গেছেন। শৈলেশ্বরবাবু কটক জেলে থাইসিসে ভুগছেন।

আর জানলাম, হরিদা, মাখন, যশোহরের বিজয় রায়, শ্রমজীবী সমবায়ের সুধাংশু মুখার্জি, মনোরঞ্জন গুপ্ত এবং উপরে আর যাঁদের নাম বলেছি—যাঁরা সব ভারত-জার্মান ষড়যন্ত্র সম্পর্কে গোড়ার দিকেই ধরা পড়েছেন, এঁরা সব কিছুকাল পূর্ব পর্যন্তও কঠোর নির্জন কারাবাসে নানাভাবে এতকাল ধরে বারাকপুরে এবং প্রেসিডেন্সি জেলে অত্যন্ত দুর্গতির জীবন যাপন করেছেন। এঁদের ভিতর বিজয়বাবু ও সুধাংশুবাবু ছিলেন আলিপুর জেলে। তাঁদের সম্পর্কে মুলভেনি সাহেব রিপোর্ট করেন, এভাবে মানুষ বেশী দিন থাকলে পাগল হয়ে যাবার সম্ভাবনাই বেশী।

এই রিপোর্টের পরে জেলবিভাগের কর্তার সঙ্গে মুলভেনি সাহেবের বেশ বিবাদ হয়। পরে কিন্তু বাংলা সরকার সার সায়ক্স

হুদাকে পাঠান কলকাতার জেল ছুটিতে রাজবন্দীদের অবস্থা দেখতে। ফলে, অল্পদিনের মধ্যে আলিপুর জেলে রাজবন্দীদের অবস্থা অনেকটা বদলায়। রাজবন্দীদের পরস্পর কথা বলা তখনও আইনবিরুদ্ধ। কিন্তু সরকারের অনুমোদন নিয়ে মুলভেনি সাহেব ব্যবস্থা করেছেন, ষ্টেট প্রিজনাররা, ম্যাজিষ্টেরিয়াল সেলে থাকবেন না, ইউরোপিয়ান সেলে থাকবেন—দুপুরে তিন ঘণ্টা এবং রাত্রে ছাড়া অন্য সময় বারান্দায় ডেক চেয়ারে বসে পড়াশুনো করতে পারবেন। জেলারকে বলে দিয়েছেন, পরস্পর কথা ওঁরা বলবেনই, শুধু বলে দিও, আমার সামনে বা কোনো বাইরের ভিজিটরের সামনে যেন কখনও পরস্পর কথা না বলেন। এ ছাড়া ইয়ার্ডের বাইরে রাস্তায় বেড়াবার ব্যবস্থা হয়েছে, খাওয়াদাওয়ার তত্ত্বাবধানের ভারও নিজেরা পেয়েছেন।

মাখনের মুখে আর শুনলাম ননীবাবুর কথা। ঢাকা জেলে একবার, আলিপুরে একবার নিজের সিগারেট খাবার ম্যাচ দিয়ে নিজের গায়ে আগুন ধরিয়ে দিয়েছেন। কোনো গতিকে বাঁচানো হয়েছে। প্রায়শঃ চার পাঁচ দিন ধরে কিছু খান না। তারপর একদিন হয়তো তিন চার মগ চা, একখানা দুখানা বড় পাঁওরুটি খেয়ে নিলেন। এই ভাবেই বছরখানেক ধরে কাটাচ্ছেন। বন্ধুবান্ধবরা খাবার জন্য সাধাসাধি করেন। আমি আলিপুর জেলে যাবার কিছুদিন পরে ননীবাবু ভারত সরকারকে ছয় সাত পাতা জুড়ে এক দরখাস্ত লিখলেন। তার মধ্যে অনেক বিদ্যার পরিচয় আছে, কিন্তু আমি তার অর্থ সব বুঝলাম না। এক জায়গায় লিখেছেন মুসলমান ধর্মের উদ্ভব অথর্ব বেদ থেকে—অথর্ব বেদের অললা স্তোত্র থেকে 'আল্লা' শব্দের উৎপত্তি। এই সব বাদ দিয়ে দরখাস্তের মর্মকথা এই, তাঁর

বন্ধুবান্ধব তাঁকে খাবার জন্য পীড়াপীড়ি করেন যেন ইংরেজ সরকার যুদ্ধে হেরে যায়। তিনি যদি নিয়মিত খেতে আরম্ভ করেন, তা হলেই ইংরেজ হেরে যাবে। তিনি তা চান না, তাই ইংরেজ যদি জিততে চায়, তা হলে ভারত গবর্ণমেণ্ট যেন দেখে যে তাঁর বন্ধুরা তাঁকে খাবার জন্য পীড়াপীড়ি না করেন।

ইতিপুর্বেই মুলভেনি সাহেব গবর্ণমেণ্টকে জানিয়েছেন, ননীবাবুর মাথা খারাপ হয়ে গেছে—খালাস দিয়ে দিলে ভালও হয়ে যেতে পারেন। তাঁকে যেন খালাস দেওয়া হয়।

সরকার ননীবাবুকে ছাড়তে চায় না, তাই—বুকানন সাহেব ছিল ইনসপেক্টার জেনারেল অব প্রিজন্‌স্‌—তাকে পাঠালো ননীবাবুকে দেখতে। মুলভেনি সাহেব সঙ্গে এলেন। ননীবাবু সাধারণভাবে যা আলাপ করতেন তাতে তাঁকে পাগল বলে মনে হ'ত না। বুকাননও দেখেশুনে বল্‌লো—এ তো বেশ ভালো আছে।

ভালো আছে তো তুমি এসে চার্জ নাও, আমি পারব না—মুলভেনি সাহেব বলে বসলেন আমাদের সাম্‌নেই।

কয়দিন পরে ননীবাবুর খালাসের হুকুম এল।

আলিপুর জেলে ঢুকবার পরদিন থেকে আমার নিয়মিত জেল জীবন সুরু হ'ল। যে-ইয়ার্ডটায় থাকি, সেখানকার সাতটা সেল Y class, অর্থাৎ, কম বিপজ্জনক রাজবন্দীদের জন্যে। বন্ধুরা বলেন, আমাকে ওখানে রাখবে না।

কয়েকদিনের মধ্যে ভারত গবর্ণমেণ্টের হোম মেম্বার সার উইলিয়াম ভিন্‌সেণ্ট এল জেল দেখতে। সঙ্গে এল তখনকার বাংলা গবর্ণমেণ্টের অ্যাডিশনাল সেক্রেটারি কামিং, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মুলভেনি এবং আরও কে কে দু'এক জন। আমরা সব যার যার সেলে বন্ধ। ভিন্‌সেণ্ট

আমার নাম জিজ্ঞেস করলো। বলতে বললো, কবে ধরা পড়েছিলেন? তারিখ বলতে বলে, Repeat your name please.

ঘোড়ার মতো মুখে হ হ করে হাসতে হাসতে বলে, Ah, you were arrested somewhere near the Esplanade! You tried to kill the men who arrested you!

আমি বলি, না।

You tried to commit suicide! হ হ করে বিজয়ের হাসি হাসে, আর আমার এ কীর্তি ও কীর্তির উল্লেখ করে।

ওর হাসির ফাঁকে ফাঁকে শুনি, কামিং মুলভেনিকে জিজ্ঞেস করছে, "Why is this man here?

মুলভেনি বলে, কি করব? X class-এর ওসব cell তো ভর্তি।

ওরা সবার সাথে দু'এক কথা আলাপ করে চলে গেল। দু'তিন দিন বাদে হুকুম এল সাতুদা (২৪-পরগণা মাহিনগরের সাতকড়ি ব্যানার্জি) অনেকদিন থেকে অসুস্থ হয়ে জেল হাসপাতালে আছেন, তাঁকে Y class করে আমার এই ঘরে পাঠিয়ে দেওয়া হবে, আর আমায় তাঁর ঘরে পাঠাতে হবে। সেই দিনই পেছনের বাড়ীর ৫নং সেলে আমায় নিয়ে যাওয়া হ'ল। মাখন বেচারি একটু দমে গেল। তার হৈ চৈ করার সাথী রইলো না।

এ বাড়ীতে এসে পাশের ঘরে পেলাম সত্যেনদাকে। মাগুরার সত্যেন সেন পিংলেকে সঙ্গে নিয়ে আমেরিকা থেকে ফেরেন। কিছুকাল বাদে লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় এঁদের বিচারের জন্ত নিয়ে যায়। আমেরিকা ফেরত রাজসাক্ষী পিংলেকে সনাক্ত করে, পিংলের ফাঁসি হয়ে যায়। কিন্তু নানা ব্যক্তিগত ঋণে আবদ্ধ ছিল ব'লে সত্যেনদাকে সনাক্ত করে নাই, তিনি মামলায় ছাড়া পেয়ে রাজবন্দী

হন। দৃঢ়তায় কোমলতায় মেশানো সত্যেনদার মতো মানুষ হয় না। যেমন ভীমকায় তাঁর দেহ, তেমনি বিশাল তাঁর হৃদয়। যে সর্বক্ষণ তাঁর বিরোধিতা করছে তার সম্বন্ধেও তাঁর মুখে একটি নিন্দার কথা নেই। শত্রুমিত্র সবারই হীনতাকে উপেক্ষা করে তিনি এদিক দিয়ে যেন তাঁর নেতা যতীন মুখার্জির গুণটিকে আয়ত্ত করে নিয়েছেন।

দিনরাত সত্যেনদার সঙ্গে দুষ্টুমি করি। সন্ধ্যা বেলা প্রায় ঘণ্টাখানিক ধরে নিজের সেলে বসে ধ্যান করেন। তারপর খেয়ে দেয়ে ঘর অন্ধকার ক'রে ডেক চেয়ারটা টেনে সেলের দরজার সামনে বসেন। রাত্রে খাবার জন্য ২৫ খানা করে লুচি দেয়, অত কে খায়? ওর এক একটা নিয়ে ড্যালা করে ওঁর ঘরের ভিতর ছুঁড়ে মারি, সত্যেনদা বলেন, দাঁড়া, সকাল বেলা দেখাব'খন।

গায়ের জোরে ওঁর সঙ্গে পারিনে। হয়তো মাঠে বসে আছেন, হঠাৎ পা দুটো ধরে ঘাসের উপর দিয়ে খুব খানিকটা হড় হড় করে টেনে ছেড়ে দেই। তাড়া করে ধরে এক একদিন যা মার লাগান!

বিজয়বাবু, অতীনবাবু, জিতেনবাবু, সত্যেনদা—এঁরা এক কোণে এক কুস্তির জায়গা করে নিয়েছেন—মাঝে মাঝে রায়ান সাহেবকে দিয়ে দরজা খুলিয়ে সুরেশবাবুও এসে জোটেন। সবাই এঁরা পাকা কুস্তিগির। হেমেনদারও কুস্তিতে খুব উৎসাহ, কিন্তু তখন হাঁপানিতে ভুগছেন। তিনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেন। আমায় নিয়ে এঁরা টানাটানি করেন। কিন্তু কুস্তিতে চিরদিন আমার একটা বিতৃষ্ণা। আমি যাই না।

ভোরে উঠে ঘণ্টাখানেক ব্যায়াম করি, দু'বেলা বেড়াই, ইয়ার্ডের রাস্তায় মাঝে মাঝে দৌড়াই। শরীর তখন বেশ ভাল হয়ে উঠ্ছে।

আলিপুরে গিয়ে দেখি, পড়াশুনোর খুব উৎসাহ। এর কেন্দ্র ছিলেন হেমেনদা। সকালে স্থপারিন্টেণ্ডেণ্ট আসতেন আটটা আন্দাজ। সবাইকে জিজ্ঞেস করতেন, **Are you all right? Are you happy?** যদি কেউ **happy** নয় বলতো, নানা কথাবার্তায় তার সঙ্গে খানিক সময় কাটিয়ে যেতেন। কিছু চাইতে হলে, চিঠিপত্র লিখতে হলে এই সময় বলতে হ'ত। মুলভেনি ছিলেন রসিক লোক। সাতুদার মাথায় ছিল মস্ত টাক। একদিন তিনি জবাকুসুম তেল চেয়েছেন, মুলভেনি জিজ্ঞেস করেন, **King Edward VII**-এর ছবি দেখেছেন? (এখানে বলে রাখি, ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি ও টাকের জন্য বাইরে আমাদের কর্মীদের মধ্যে সাতুদার নাম ছিল **Edward**)। কোন তেল মাখলে যদি টাক যেত তা হলে **Edward VII** অনেক রকম তেল লাগাতে পারতেন, তা তো স্বীকার করেন?

স্থপারিন্টেণ্ডেণ্ট চলে যাবার পর হেমেনদার ঘরের সামনে একখানা কম্বল বিছানো হ'ত, আশে পাশে তিন-চারখানা চেয়ার জমতো। জিতেনবাবু সীজারের ইকনমিক্‌স্ পড়াতে স্থরু করলেন।

হেমেনদা আগে যা-ই থাকুন, ইদানীং হয়ে উঠেছেন ইউরোপীয় ন্যাশনালিজমের গোঁড়া ভক্ত। ভগবান ও ধর্ম-প্রবণতার বিরুদ্ধে তীব্র বিদ্রোহী। আমরা এ পর্যন্ত ধর্ম-প্রবণতার মধ্যে দিয়েই গড়ে উঠেছি, হেমেনদার কথাগুলো সমস্ত সংস্কারের বিরুদ্ধে আঘাত দেয়, কিন্তু তিনি যা বলেন, খোলা মনে বুঝতে চেষ্টা করি। লেকি, বাক্‌ল্—এই সব পড়া হয়। তাছাড়া, হেমেনদার কাছে আছে ডারুইন, হাক্‌স্‌লি প্রভৃতির বই, এবং রাজনীতির ও রাষ্ট্রের গঠনতন্ত্র সম্পর্কে লেকক, ব্লুণ্ট্‌স্লি, লাওয়েল, উড্রো উইলসন ইত্যাদি। নিজেকে দেখি—কলেজে লেখাপড়া কিছুই শিখি নাই। সবই পড়তে ইচ্ছা করে।

ওদিকে মেজদা (চন্দননগরের বসন্ত ব্যানার্জি) আছেন অন্য ইয়ার্ডে। তিনি প্রায় ধর্ম প্রচারকের উৎসাহ নিয়ে ফরাসী ভাষা শেখাতে চান সবাইকে। তাঁর কাছ থেকে শার্দেনাল নকল করে ইংরেজী থেকে ফরাসীতে অনুবাদ সুরু করি।

আমি আলিপুরে এসে দেখি, এই পড়াশুনোকে উপলক্ষ্য ক'রে এক দলাদলি সুরু হয়ে গেছে। আলিপুর জেলে তখন আমরা যে বাইশ জন ছিলাম, তার ভিতর অপর দলের লোক মাত্র দু'জন। কিন্তু এদিকে সেই দু'জনাই দু'শ'। এঁর একজনের সাথে আমি পরে আরও অনেক বার জেলে কাটিয়েছি। প্রতিবারেই জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। পড়াশুনোর ভিতর এঁরা দু'জনও থাকেন। কিন্তু কয়েক দিনেই দেখলাম. পড়াশুনোটা এঁদের উপলক্ষ্য মাত্র। লক্ষ্য—আমাদের নিজেদের ভিতর দ্বন্দ্ব লাগিয়ে একদলকে তাঁদের দিকে টানা যায় কি না। এটা ওঁদের একটা চিরকেলে পদ্ধতি।

বিজয়বাবু, মনোরঞ্জনদা, সত্যেনদা, সাতুদা আমাদের এই পড়াশুনোর সার্কেলের র‍্যাশনালিজ্‌মের উগ্রতা পছন্দ করেন না। তাঁরা ধ্যান ধারণা করেন। এবং যাঁর যাঁর ঘরে ব'সে পড়াশুনো করেন।

কিন্তু দলাদলিটা এমন জায়গায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে যে, সুযোগ থাকা সত্ত্বেও পরস্পর পরস্পরের ঘরে যান না। অথবা এক সার্কেলের লোক আর এক সার্কেলের লোকের ঘরে যান না।

দুই পক্ষে সবাই এঁরা আমাদের আপনার লোক। দৃষ্ট্বেমান্ স্বজনান্ যুযুৎসূন্ সমবস্থিতান্—নবাগত আমার অবস্থা কতকটা কুরুক্ষেত্রের অর্জুনের মতো। তেমনি বিপন্ন বোধ করেন দেখি অতীনবাবু। তিনি কোনো পক্ষেরই কোনো কথার ভিতর থাকেন না, দুই পক্ষেরই সবার সঙ্গে আত্মীয়তা বজায় রেখে চলেন।

তখন আমাদের খবরের কাগজের ভিতর দেওয়া হয় বাংলা সরকারের ছাপা অপাঠ্য বাংলায় লেখা "সাপ্তাহিক যুদ্ধবার্তা" বলে একখানি বেনেতি পুঁটুলি বাঁধা কাগজ। অন্যভাবে কাগজ সংগ্রহ করতে হয়। এ কাজ আমাদের জন্যে করেন অনুশীলনের বিখ্যাত কর্মী বীরেন চাটার্জি। তিনি তখন কয়েদ ভোগ করছেন। জেলের ছাপাখানায় কাজ করেন। সেখান থেকে "দৈনিক বসুমতী" সংগ্রহ ক'রে বিকালে হাতমুখ ধোবার জায়গায় যান। আমরা তখন বেড়াতে বের হই। নিয়ম, একজনের পেছনে আর একজন থাকবে, সবার পেছনে থাকবে গুর্খা সিপাই। রাস্তার পাশে লোহার শিক দেওয়া বেড়া, অপর দিকে কয়েদিরা বেড়ার পাশে দাঁড়িয়ে আমাদের দেখে, বীরেনবাবুও সেইভাবে দেখতে দেখতে এক ফাঁকে কাগজখানা আমাদের কাউকে দিয়ে দেন, প্রায়ই সেটা সত্যেনদার ল্যাঙ্গোটের তলায় অদৃশ্য হয়ে যায়।

এই কাগজ থেকে ক্রমে আবিষ্কার হ'ল, অ্যানি বেশান্ট ধরা পড়ে অন্তরীণ হলেন, তা নিয়ে খুব হৈ চৈ হল। আরও জানা গেল, সেক্রেটারী অব ষ্টেট্ মিঃ মণ্টেগু ভারতে আসছেন। দুটো নিয়েই বাইরে তখন খুব উত্তেজনা। অ্যানি বেশান্ট অল্পদিনে খালাসও হলেন। তাঁকে কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট করা নিয়ে কংগ্রেসের নরমদলে গরমদলে হাঙ্গামার কাহিনী পাওয়া গেল।

প্রায় এমনি সময় বোধ হয় একই সংখ্যা প্রবাসীতে পাওয়া গেল রবীন্দ্রনাথের "কর্তার ইচ্ছায় কর্ম" এবং সম্পাদকীয় মন্তব্যে রুশ বিদ্রোহের পর হাজার হাজার বিপ্লবী কর্মীদের নির্বাসন থেকে দেশে ফিরবার কাহিনী ও সঙ্গে সঙ্গে সাফ্রেজিষ্ট বন্দীদের অনশন ব্রতের কথা। রবীন্দ্র নাথের লেখায় পেলাম, "সহ্য না করিলেও যখন চলে এবং সহ্য না করিলেই যখন ভাল চলে, তখন সহ্য করি কেন?"

মনে পড়ে, সেই রাত্রিটির কথা। প্রথম রাত্রে চিরকালই আমায় ঘুমে অবশ করে আনে। কিন্তু সেদিন দরজার সামনে ডেক চেয়ারটিতে বসে অন্ধকার ঘরে নানা কথা মনের ভিতর তোলপাড় করছিল, অনেক রাত হয়ে গেল, ঘুম আসছিল না।

মনে হচ্ছিল, এখানে তো আমরা মুলভেনি সাহেবের কল্যাণে খেয়েদেয়ে গল্পগুজবে আনন্দেই দিন কাটিয়ে দিচ্ছি। অথচ ওখানে প্রেসিডেন্সি জেলে দেখে এলাম, রাজবন্দীরা কি অবস্থায় দিন কাটাচ্ছেন। শুনেছি, বহরমপুর জেলে, ফরিদপুর জেলে, হুগলি জেলে, রাজসাহী জেলে জীবন আরও দুর্বহ, নির্জন কারাবাস আরও কঠোর—রাজসাহী জেলে দু'মাস, ছ'মাসেও একজন আর একজনের মুখ দেখতে পান না।

এর উপর আছে অপমান। নিজেও নানারকম দেখে এসেছি। আর শুনেছি, প্রেসিডেন্সি জেলে কয়েদি মেট রাজবন্দীর ঘাড় ধরে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে যায় সাহেবের (ইউরোপিয়ান ওয়ার্ডার) সাম্‌নে ওজন নেবার জন্য। রাজসাহী জেলে সুপারিন্টেণ্ডেন্টের সাম্‌নে জমাদার রাজবন্দীকে বলে, 'বাবুগিরি ছুটিয়ে দেব।' অপরাধ—সিপাই রিপোর্ট দিয়েছে—তাকে অগ্রাহ্য ক'রে ষ্টেট প্রিজনার রাতের অন্ধকারে এক সেল থেকে ডেকে আর এক সেলের ষ্টেট প্রিজনারের সঙ্গে কথা বলেছেন। এম্‌নি সব ব্যবহারের ফলে অধ্যাপক মণি শেঠ, অধ্যাপক জ্যোতিষ ঘোষ আরও কত জন পাগল হয়ে গেছেন।

মনে হ'ল, সহ্য করি কেন ?

শুনেছিলাম দালান্দা হাউজের কথা। এক বন্ধুকে শীতের রাতে জলে চুবিয়ে রেখেছিল স্বীকারোক্তি করাবার জন্য। কত বন্ধুকে—অমর ঘোষ, অন্নদা মজুমদার, অরুণ গুহ, জীবন চ্যাটার্জি—আরও কত

জনকে কীড্ স্ট্রীট পুলিশ অফিসে অমানুষিক মার মেরেছে, দিনের পর দিন না খেতে দিয়ে সর্বক্ষণ দাঁড়ো করে রেখেছে, তার উপর হাত পা বেঁধে রাতের পর রাত রুল দিয়ে পিটিয়েছে। জীবন ১০৪ ডিগ্রি জ্বর নিয়ে ধরা পড়েছেন। সেই অবস্থায় তাঁকে নিয়ে, তিন চার জনে মদ খেয়ে এসে শেষ রাত অবধি ঘরের এদিক থেকে ওদিকে, ওদিক থেকে এদিকে ঠেলে ঠেলে ফেলে টেনিস খেলেছে। আরও যা করেছে ভদ্রলোকের মুখের ভাষায় তা বেরোয় না। জীবন টেগার্ট অথবা লোম্যান—কার কাছে নালিশ করেছিলেন। জবাব পেয়েছেন, **No, they couldn't beat you, there's no such law,** মুখের এই জবাবের সঙ্গে পেয়েছেন বুটজুতো পরা পায়ের লাথিও !

মনে হ'ল, সহ্য করি কেন ?

আরও কতো বন্ধুর কথা শুনেছি—গ্রামে, জঙ্গলে, সমুদ্রের চরে—সাপে, বিছায় ভরা ঘরে একা একা নির্জন জীবন যাপন করছেন—গ্রামের লোক একটা সহানুভূতির কথা পর্যন্ত তাঁদের বলতে পাবে না, অসুখে বিসুখে একবার কাছে পর্যন্ত আসতে পাবে না। অশিক্ষিত কনষ্টেবলরা আঠার বিশ বছরের ছেলেদের অসৎ জীবন যাপন করতে প্ররোচিত করছে—তাদের ইচ্ছায় সায় বা সাড়া না দিলে সত্য মিথ্যা রিপোর্টে, আরও নানাভাবে জীবন দুর্বহ করে তুলছে। এর উপর আছে দুই চার দিন ব্যাপী আই. বি. অফিসারদের বহুরূপী যোলাকাত—প্রলোভন, শাসানি, ধমকানি, পরিবার পরিজনকে নিঃস্ব, নিঃশেষ করে দেবার—আতঙ্ক সৃষ্টির চেষ্টা। ফলে কত জনের আত্মহত্যার খবর তখন কানে আসছে—বন্ধু সুরেন কর আগেই মারা গেছেন, শচীন দাসগুপ্তের করুণ কাহিনী তখনই শুনলাম।

বসে বসে ভাবি, সহ্য করি কেন ?

কি করতে পারি? মনে হয়, সাফ্রেজিষ্টদের মতো আমরাও কেন প্রায়োপবেশন করি না? দুটি বাধার কথা মনে আসে। প্রথমত—দুর্ব্যবহার হচ্ছে অন্য জেলে, আলিপুরেই আমরা সব চেয়ে ভাল ব্যবহার পাই। আর এখানেই যদি আমরা প্রায়োপবেশন করি, ভাল ব্যবহার করাই যে অন্যায়, এইটেই আমরা প্রমাণ করব, এবং যে মূলভেনি সকল রাজবন্দীদের প্রতি ভাল ব্যবহারের চেষ্টা করছেন, তাঁরই দুর্নাম হবে। একটি উপায় মনে এল—একসঙ্গেই তো সব জেলে না হোক্, অন্ততঃ অনেকগুলো জেলে হাঙ্গার স্ট্রাইক করা চলে। হাঙ্গার স্ট্রাইক করতে হলে মণ্টেগু যখন বাংলায় আসবেন, তখন করতে হবে। তার এখনও কয়েক মাস দেরী। ইতিমধ্যে অন্যান্য জেলে খবর পাঠিয়ে সর্বত্র একই দিনে হাঙ্গার স্ট্রাইক করলে ওদের যে অত নির্জন কারাবাসের ব্যবস্থা, তার গোমরও ভাঙবে এবং আলিপুর জেলের অবস্থা, ব্যবস্থা ও তার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মূলভেনির সুনামের উপরও অকারণ আঘাত পড়বে না। ভেবে দেখা গেল, আলিপুরে যাঁরা আছেন, তাঁদের অনেকের ভাই বা ছেলে বা অন্য নিকট আত্মীয় অপরাপর জেলে আছেন, দেখাসাক্ষাতের জন্য বাড়ীর মহিলাদের ডেকে পাঠিয়ে তাঁদের মারফত বিভিন্ন জেলে খবর দিয়ে মণ্টেগুর আসার সময় একই দিনে অন্ততঃ অনেক জেলে হাঙ্গার স্ট্রাইক সুরু করা চলে।

দ্বিতীয় বাধা মনে হ'ল, বয়োবৃদ্ধ এবং রুগ্ন রাজবন্দীরা। মান্য করলে বৃদ্ধ দেওয়ান সিং, বিজয় রায়, হেমেন্দ্র আচার্য, অতীন বোস, দুর্গাচরণ বোস, সাতকড়ি ব্যানার্জি শুনবেন এমন ভরসা হ'ল না—আমরা সবাই না খেয়ে থাকব, আর তাঁরা খাবেন—এ প্রকৃতির লোক এঁরা কেউ নন। অথচ এরকম উপবাসের ভিতর এঁদের টেনে নেওয়া

অত্যন্ত অন্যায় কাজ হবে। তবু ঠিক করলাম, অনুরোধ, মিনতি করে দেখা যাবে ওঁরা যেন যোগ না দেন।

পরদিন সকালের আসরে কথাটা পাড়লাম। বয়সে প্রৌঢ় কিন্তু প্রকৃতিতে তরুণ হেমেনদা উৎসাহে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন, বললেন, যে-জিনিস সম্পর্কে ওদের আতঙ্ক এমন তীব্র, সেই ওদের প্রেষ্টীজে ভীষণ ঘা পড়বে, তিনি সবাইকে ডেকে আলোচনা সুরু করলেন।

বললাম, আপনারা করতে পাবেন না।

হেমেনদা হেসেই উড়িয়ে দিলেন—বললেন, আপনাদের চেয়ে আমার গায়ে চর্বী বেশী, আমার কষ্ট কম হবে। আর, আমরা তো বুড়ো হয়েছি, বরং আপনারা বেঁচে থাকলে কাজ হবে।

বৃদ্ধ দেওয়ান সিংতো চটেই আগুন। অতীনবাবু তাঁর স্বভাব-সিদ্ধ প্রাণ-খোলা হাসি হেসে বললেন, "সে হয় না বাবা, তোমরা সব কালকের ছেলে, তোমরা না খেয়ে থাকবে, আর আমি খাব?" কবিরাজ মহাশয়ের মৃদু হাসি, দুর্গাবাবুর শ্লেষভরা হাসি আর রুগ্ন সাতুদার শান্ত নম্র দৃঢ়তা বেশ স্পষ্ট করে জানিয়ে দিল—তাঁদের অনুরোধ করা বৃথা।

দেখা গেল, বৃদ্ধদের উৎসাহ যুবকদের চেয়ে বেশী। কয়েকদিন দিনরাত ধরে তুমুল আলোচনা চললো। তার পর, দুটো বাধারই গুরুত্ব এত বেশী মনে হ'ল যে, কিছু দিনের মতো কথাটা চাপা পড়ে গেল।

ইতিমধ্যে মুলভেনি সাহেব এক মাসের ছুটিতে গেলেন। গ্রে ব'লে জেলের ফ্যাক্টরি ম্যানেজার—সে হ'ল জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট।

মুলভেনি কখনও পুলিশের লোককে, এমনকি, পুলিশ কমিশনারকে পর্যন্ত রাজবন্দীদের ইয়ার্ডে ঢুকতে দিতেন না। তাঁর অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে একদিন এসে উপস্থিত কর্বেট, গোল্ডি ও লোম্যান।

পুলিশের হাজতে থাকতে এদের যেসব কথা শুনিয়েছি, যেন তাই নিয়ে চিম্‌টি কাট্‌তেই দল বেঁধে এরা এসেছে। বেশীর ভাগই আমার বন্ধুবান্ধব কে কোথায় কি দুর্বলতা দেখিয়েছেন, তাই নিয়ে আমায় কথা শোনাতে সুরু করলো, আর তাঁদের কার কাছ থেকে পেয়েছে আমি কোথায় ম্যাটসিনির ক্লাস করতাম, কোথায় অস্ত্র রাখতাম ইত্যাদি। দুএক কথা বলতে না বলতে সুরু হ'ল আমার গর্জন। কথা যে খুব বেশী বলবার ছিল, তা নয়। তবে আমার গলার আওয়াজ আর চোখ মুখের ভঙ্গী বোধ হয় ছিল প্রচণ্ড। দু'এক কথার পরই রণে ভঙ্গ দিয়ে সরে পড়লো। জেলকর্মচারীরা যারা সঙ্গে ছিল, তারা পরে বল্‌লো, আমার রকমসকম দেখে ভয় পেয়েই গিয়েছিল।

হেমেন দাকেও দমে যাবার মতো দুএক্‌টা কথা শুনালো। সত্যেনদাকে ও জিতেন লাহিড়ীকে বল্‌লো, বার্লিন পর্যন্ত তাঁদের ক্রিয়াকলাপের সন্ধান তারা পেয়েছে।

এ পর্ব গেল। কিন্তু মুলভেনি সাহেবের অনুপস্থিতিতে জেলের অন্য কর্মচারীদের সঙ্গে আমাদের খিটিমিটি লেগে গেল। X class এবং Y class-এর রাজবন্দী আর Ingress Into India Act-এর বন্দী আমরা পাশাপাশি তিনটি ইয়ার্ডে থাকি। সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট আসবার আগে এবং পরে আমাদের দরজার ফাঁকে ফাঁকে কথা চলে। মাঝখানের সেলগুলোর দোতলার বারান্দায় এক জন কেউ পাহারা থাকেন—শিশ দিলে বা পায়ে দমাদম আওয়াজ করলে বোঝা যায় কেউ আসছে, আমরা সরে পড়ি।

গ্রাণ্ট ব'লে একটা ওয়ার্ডার আমাদের পেছনে লেগে গেল। কথা বলতে দেখলেই সে গিয়ে জেলারকে রিপোর্ট দিত। জেলার এসে হৈ হৈ লাগিয়ে দিত। দু'এক দিন সহ্য করার পর আমরাও কড়া কড়া

কথা শুনিয়ে দিতাম। বেশীর ভাগ দিনই ঝগড়া হ'ত মনোরঞ্জনদার সঙ্গে। জেলে ঝগড়া করতে তখনকার দিনে মনোরঞ্জনদার জুড়ি ছিল না। আর কথা বলতে গিয়ে তিনি শিশ বা পায়ের আওয়াজ প্রায়ই শুনতে পেতেন না। তার পর জেলার যখন দাঁতমুখ খিঁচিয়ে আসতো, মনোরঞ্জনদাও রুখে দাঁড়াতেন। যা বলতেন, তার মর্মকথা এই—কথা বলি, বেশ করি, তুমি যা করবার কর গিয়ে।

এই সব বিবাদের ফলে পরে আর গ্রাণ্টের দরকার হ'ত না। ইয়ার্ডে যে গুর্খা সিপাই সর্বক্ষণ থাকতো, সে-ই কথা বলায় বাধা দিতে সুরু করলো। মন ক্রমে বিষিয়ে উঠ্ছে।

ইতিমধ্যে মুলভেনি ফিরে এলেন। চন্দননগরের আর যাঁরা ছিলেন, তাঁরা একে একে বাইরে অন্তরীণ হয়ে গেলেন, রয়ে গেলেন মাত্র বসন্ত বাবু আর সুরেশবাবু। Y class রাজবন্দীদের তখন সেই ইয়ার্ডে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সাম্নের সাতটি সেলে তখন নতুন এসেছেন শৈলেশ্বর বসুর আর এক ভাই কানাই। এঁদের ভিতর এখন আর কেউ বেঁচে নেই—একে একে তিনটি ভাই-ই খালাসের পর থাইসিসে মারা গেছেন।

কানাই বেচারী দিন রাত একলা থাকে। আমি যখনই সুযোগ পাই গিয়ে তার সঙ্গে কথা বলি।

একদিন কথা বল্ছি—দূর থেকে গুর্খা সিপাই কখন আপত্তি করেছে, আমি খেয়াল করিনি, তখন সে তেড়ে এসেছে আমায় ধরবে ব'লে।

বিকেল বেলা—সবাই বারান্দায় বসে আছেন—সিপাইকে ঐ ভাবে আসতে দেখে সামনে থেকে হেমেনদা, সত্যেনদা, উপর থেকে জিতেন-বাবু, অতীনবাবু, বিজয়বাবু, এমনকি পাশের বাড়ী থেকে সুরেশবাবু

প্রভৃতি হ্যাই সিপাই, হ্যাই সিপাই, ব'লে এমন চীৎকার দিয়ে উঠেছেন যে, বেচারী ঘাব্ড়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে। আমিও ফিরে দাঁড়িয়েছি। তখনকার আমার চেহারায় ঐ রকম দাঁড়ানোই যথেষ্ট। ইতিমধ্যে ভাষাও দু'একজন একটু ওদিক থেকে প্রয়োগ করেছেন।

পরদিন সকালে বেড়িয়ে ফিরছি, ইউরোপিয়ান ওয়ার্ডার দরজা খুলে দাঁড়িয়েছে···দেখি দরজার সাম্‌নে একসঙ্গে তিন চার জন গুর্খা দাঁড়িয়ে, তাদের হাওয়ালদার সঙ্গে, তাদের খাপে কুকরি ঝুলছে।

রকম দেখে আমরা সবাই দরজার সাম্‌নে দাঁড়িয়েছি। হাওয়ালদার কুকরি বের করতে করতে তার সিপাইকে বলছে, 'শালা' কৌন বোলা থা ?

কেউ কোনো কথা বলার আগেই সত্যেনদা হাওয়ালদারের হাতের কবজিটা এমন মুচড়ে ধরেছেন যে, কুকৃরি তার হাত থেকে খসে পড়ে গেল—অতীনবাবু কুকৃরিখানা তুলে নিয়ে এমন এক ধমক লাগালেন যে, গুর্খারা পালাতে পারলে বাঁচে। আমাদের সবাই তখন আক্রমণ-মুখো, সত্যেনদা ততক্ষণে কুকৃরিখানা অতীনবাবুর হাত থেকে নিয়ে নিয়েছেন। ইউরোপিয়ান ওয়ার্ডার মাঝখানে পড়ে গুর্খাদের বের করে দিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল। তারপর কাকুতি মিনতি করে কুকৃরি নিয়ে অফিসে চলে গেল।

জেলার অ্যাট্‌কিন্‌সন মুলভেনি সাহেব ফিরে আসার পর থেকে একেবারে ভাল মানুষটি। আমাদের জিজ্ঞাসাবাদ ক'রে, 'বড় অন্যায়', 'বড় অন্যায়' বলতে বলতে অফিসে চলে গেল।

দু'মিনিট যেতে না যেতে জেলারকে আর ইউরোপিয়ান ওয়ার্ডারকে নিয়ে মুলভেনি এসে হাজির। যেমন জেলার বলেছে, কুকৃরি নিয়ে আক্রমণ করেছিল

'Kukri? Who allowed him inside with Kukri?'

বলতে বলতে মুলভেনি সাহেবের রাগে গোঁফগুলো খাঁড়া হয়ে উঠলো। আমাদের কাউকে কিছু জিজ্ঞাসা না করে বেরিয়ে চলে গেলেন।

গুর্খারা দলশুদ্ধ সেই দিনই সাস্‌পেণ্ড হ'ল, এবং তাদের মিলিটারী আইনে বন্দী করে বিচারের জন্য ঢাকায় পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল।

এতেও কিন্তু আমাদের মনটা যে এতদিন ধরে উত্তেজিত হয়ে উঠ্‌ছিল, তা' শান্ত হ'ল না।

এই উত্তেজনায় বরং ইন্ধন দিল ভিতরের যে দলাদলির কথা আগে বলেছি, সেই দলাদলি।

দিনের পর দিন এক দলকে আর এক দলের বিরুদ্ধে উস্কানো চলছে। অনাবশ্যক সকলের মন তিক্ত হয়ে উঠ্‌ছে।

ইতিমধ্যে ব্যারিষ্টার বি. সি. চাটার্জি এলেন একদিন অপর দলের দু'জন নেতার ভিতর একজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। মণ্টেগুর আসা উপলক্ষ্যে মডারেট দল তখন তৈরী হচ্ছেন। তাঁর সঙ্গে কি কি বিষয় নিয়ে আলাপ করবেন তারই সব মালমশলা সংগ্রহ করছেন। বি. সি. চাটার্জি বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলায় এই ভদ্রলোকের পক্ষ সমর্থন করেছিলেন। সেই উপলক্ষ্যেই এঁদের পরিচয়।

জেল অফিসে দেখা হয়ে যাবার পর বীড্‌ল্‌ নামে যে ইউরোপিয়ান ওয়ার্ডারটি এই রাজবন্দী বন্ধুকে নিয়ে গিয়েছিল, সে গোপনে এসে সত্যেনদাকে জিজ্ঞেস করলে, ওঁর সঙ্গে কি আপনার আর লাহিড়ির বিবাদ আছে?

সত্যেনদা জিজ্ঞেস করলেন, কেন, বিবাদ থাকবে কেন?

তা না হলে আপনারা যাঁরা জার্মানীর সঙ্গে ষড়যন্ত্র করেছিলেন তাঁরা খালাস না হন, এমন কথা উনি বললেন কেন?

ও জেলে তখন সত্যেনদা আর জিতেন লাহিড়িই মাত্র ছিলেন বিদেশ-প্রত্যাগত। তাই বীড্‌ল্‌ মনে করেছিল, ওঁরা দু'জনই মাত্র ভারত-জার্মান ষড়যন্ত্রে লিপ্ত।

সত্যেনদা বললেন, দূর! তুমি কি বুঝতে কি বুঝেছ।

তা নয়, আমি সামান্য যা শুনেছি, তা'তে তাই বুঝেছি, তারপর পুলিশের লোকও তো তা-ই বল্‌লো।

সত্যেনদা বীড্‌ল্‌কে বললেন, না, একথা সত্যি হতে পারে না। আমায়ও বললেন, এ নিয়ে আর ঘাঁটাঘাঁটি করিস্‌নে! ও কি বুঝতে কি বুঝেছে।

আমিও তখন তা-ই মনে করেছিলাম। কথাটা ভুলেই গিয়েছিলাম। কিন্তু পরে মণ্টেগু তাঁর Indian Diaryতে B. C. Chatterjeeর সঙ্গে Interviewএর কথা উল্লেখ করতে গিয়ে যা লিখেছেন তা পড়ে মনে হ'ল বীড্‌লের কথাটা হয়তো মিথ্যা নয়!

রাজবন্দীদের মুক্তি দেবার জন্য অনুরোধ জানাতে গিয়ে B. C. Chatterjee যা বলেছিলেন তার উল্লেখ করেছেন মণ্টেগু এইভাবে: "He is not now talking of those bought with German gold, but his friends are friends who want, he says, not to destroy the British connection, but to get rid of this administration……"

কথাটা ভাবি, আর সত্যেনদার মহত্বের কথা মনে পড়ে। সত্যেনদা আর তাঁর বন্ধুদের বিরুদ্ধে প্রচারেই এই ভদ্রলোক আমাদের সকলের জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছিলেন। অথচ আমি কাছে ছিলাম ব'লে, তা না হলে বীড্‌লের কথা বোধ হয় তাঁর কোনো নিকট বন্ধুকেও বলেন নাই। দলাদলির ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত এমন এক জঘন্য স্তরে

গিয়ে নাম্‌লো যে, একদিন হেমেনদার চোখ খুলে গেল। সেই দিনই এই দলাদলির জড় মারবার উদ্দেশ্যে যেসব ঘরে এতকাল তিনি যেতেন না—তিনি সাধারণতঃ জেলের আইন মেনে নিজের তীক্ষ্ণ আত্মসম্মান বজায় রাখতেন এবং কারও ঘরেই সচরাচর যেতেন না—এখন সেই সব ঘর একবার করে ঘুরে এলেন ও এতদিনের দলাদলির জন্য সকলের কাছেই দুঃখ প্রকাশ করলেন।

সেদিন আমাদের আর আনন্দের সীমা রইলো না।

কিন্তু এতদিন ধরে বিবিধ কারণে আমাদের মনটা যে তিক্ত হয়ে উঠেছিল, তার জের মিটলো না। এবং তারই জের স্বরূপ সেই স্ট্রাইকের প্রস্তাবটার আবার জোর আলোচনা চল্‌লো।

প্রথম হাঙ্গার স্ট্রাইক

তখন মণ্টেগুর আসবার সময় হয়ে গেছে। আর, বিভিন্ন জেলে খবর পাঠিয়ে হাঙ্গার স্ট্রাইক করবার সুযোগ নেই। অথচ, সবাই যেন একটা কিছু করবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন।

দিনরাত আলোচনা চললো। রাতের বেলায় তেমন সুযোগ হয় না। কথাটা গোপন রাখতে হবে—রাতের বেলায় ভিন্ন ভিন্ন সেলে বন্ধ থাকি, ডাকাডাকি করে কথা বললে পাছে জানাজানি হয়ে যায়, তবু ইসারায় ইঙ্গিতে কথা চলে। দিনের বেলায় তিনবার চারবার ক'রে যতো জন পারি, একত্র হই। তাছাড়া, এখানে ওখানে দুইতিন জনের কমিটি মিটিংও চলে।

এর আগে অবশ্য একটা ছয় দিনের হাঙ্গার স্ট্রাইক হয়ে গেছে মেদিনীপুর জেলে—হেমেনদা তার পরই মেদিনীপুর থেকে এসেছেন কিন্তু আমরা যে হাঙ্গার স্ট্রাইকের আলোচনা করছি, তার হেতু বহু ব্যাপক—আমাদের কথা, বিনাবিচারে আটক রাখা চলবে না—আর, আটক রাখলে, ব্যবহার সর্বদিক দিয়ে ভদ্র করতে হবে সব জেলে সব বিনাবিচারে বন্দীদেরই প্রতি।

এরকম হাঙ্গার স্ট্রাইকে গবর্ণমেণ্ট সহজে নতি স্বীকার করবে না, কাজেই দুপাঁচজনের মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হতে হবে। তার দায়িত্ব তো সহজ নয়। সবাই অবশ্য নিজের নিজের দায়িত্বেই উপবাসের পণ করবে। কিন্তু শুধু হঠকারিতার বশে কোনো সহকর্মী বন্ধুর নিষ্ফল মৃত্যু হবে, তার গ্লানি তো সমস্ত জীবনেও নিজের মন থেকে মুছে ফেলতে পারব না।

তাছাড়া, সবাইকে এক সঙ্গে ওরা রাখবে না—বিভিন্ন জেলে একা একা হয়তো পাঠিয়ে দেবে। তখনও সংকল্প বজায় রাখতে হবে। কত মিথ্যা খবর ওরা বলবে—হয়তো জানাবে, অপর সবাই ছেড়ে দিয়েছে, তুমি একাই না খেয়ে মরছ। এই ধরনের খবর পেয়ে, অথবা নিজের মনে দুর্বলতা এসে বিভিন্ন জেলে যদি দু'পাঁচজন ছেড়ে দেয়, যারা তখনও টিকে থাকবে, তাদের দুঃখভোগ আরও দীর্ঘতর হয়ে উঠ্‌বে। এই সব নিয়ে আশা-নিরাশার অনেক কথাই হ'ল। নিরাশার দিকেই পাল্লা ভারী।

পরের কথা—বয়স্ক ও রুগ্ন বন্ধুরা কি করবেন? তাঁরা পিছপাও কিছুতেই হবেন না। অনেক সাধ্যসাধনার পর স্থির হ'ল, দেওয়ান সিং তিন দিন না খেয়ে থাকবেন, তারপর খেতে সুরু করবেন। অন্য যে চার পাঁচজন ছিলেন, তাঁরা যখন খুসি, স্ট্রাইক ছেড়ে দিতে পারেন।

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মুলভেনি সম্পর্কে আমাদের যে সংকোচ ছিল, সে-সম্বন্ধে কথা হ'ল, আমাদের জিজ্ঞেস করলে আমরা সবাই বলব, বিশেষ ক'রে আলিপুর জেলের ব্যবহার নিয়ে আমাদের কোনো নালিশ নেই।

১লা ডিসেম্বর মণ্টেগু কলকাতায় আসবেন। ৩০শে নবেম্বর থেকে আমাদের হাঙ্গার স্ট্রাইক সুরু হবে। স্থির হ'ল হাঙ্গার স্ট্রাইক আরম্ভ হবার পুর্বে বাইরে যতো লোককে পারি, আমাদের সংকল্প ও রাজবন্দীদের সমস্ত অবস্থা জানিয়ে দেওয়া হবে। বাংলার নরম গরম দলের নেতৃস্থানীয় তখন রবীন্দ্রনাথ, সুরেন ব্যানার্জি, বিপিন পাল, সি. আর. দাস, ব্যোমকেশ চক্রবর্তী, মতিলাল ঘোষ, ফজলুল হক, আবুল কাশেম, হীরেন দত্ত, রামানন্দ চাটার্জি, বি. সি. চাটার্জি, অশ্বিনী দত্ত, অম্বিকা মজুমদার, অনাথ বন্ধু গুহ, যাত্রামোহন সেন,

বৈকুণ্ঠ সেন, শ্রীশ চাটার্জি—এঁদের সবাইকে, এবং আমাদের আত্মীয়স্বজন—যাঁদের খবর দিলে একটু লোক জানাজানি হতে পারে, স্থানীয় আন্দোলন হতে পারে—তাঁদের সবাইকে চিঠি দেওয়া স্থির হ'ল।

দীর্ঘ চিঠি—বিনাবিচারে আটক রাখার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, দালান্দা হাউসে, কীড্ ষ্ট্রীটে ও অন্যত্র অমানুষিক নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ. রাজবন্দীদের প্রতি অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ—প্রায় আট পাতা চিঠি। লিখলেন জিতেন লাহিড়ি। আমরা চার পাঁচজন রাত্রে রাত্রে ঘরে বসে আমাদের হাতের লেখা ধরতে না পারে, এমন ক'রে নকল করলাম।

বিয়াল্লিশ খানা চিঠি। ২৯শে তারিখে বাইরে পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল। ডাকে দেবার ব্যবস্থা করলেন বীরেন চাটার্জি। ৩০শে বেলা ১০টা আন্দাজ দোতলার বারান্দায় সৌরীন ইঙ্গিতের অপেক্ষায় ছিলেন। যেমন জানা গেল, চিঠিগুলো ডাকে দেওয়া হয়েছে, অমনি আমাদের উপবাস সুরু হ'ল। জেল আফিসে জানিয়ে দেওয়া হ'ল, আমরা সেই মুহূর্ত থেকে হাঙ্গার স্ট্রাইক করছি।

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এলেন—জিজ্ঞাসাবাদ ক'রে জেনে গেলেন, কেন স্ট্রাইক করছি। তাঁর জেলের বা ব্যবহারের বিরুদ্ধে আমাদের নালিশ নেই যখন জানলেন, তখন আমাদের বলবার তাঁর বিশেষ কিছু ছিল না। তবু ঘরে ঘরে গিয়ে বললেন, এতে লাভ কি হবে? তোমরা খাও, আমরা বললাম, না। আমাদের দৃঢ়তা বুঝে আর বেশী পীড়াপীড়ি করলেন না।

রায়ান সাহেবকে পাঠিয়ে দিলেন। রায়ান পাচকদের ডেকে ঘরে ঘরে খাবার পরিবেশন করালেন। আমাদের দুর্গাবাবু রোজ একাজটি

করতেন। তাঁর সঙ্গে রায়ানের একটা হৃদ্যতা ছিল, খুব হাসিঠাট্টাও চলতো। তিনি যখন বাংলায় বললেন, ওগুলো নষ্ট করবে কেন সাহেব, কয়েদিদের ডেকে দিয়ে দাও, রায়ান মুখ ফিরিয়ে নিলেন। তারপর যখন আমাদের ঘরে ঘরে তালা লাগিয়ে যাচ্ছেন, তখন তাঁর চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছে। আমার ঘরের সাম্‌নে ধ'রে জিজ্ঞাস করলাম, কেন অমন করছেন? শিশুর মতো কেঁদে ফেললেন। রুমাল দিয়ে চোখ ঢেকে চলে গেলেন। সত্যেনদা অনেক বুঝাতে চেষ্টা করলেন।

পরের দিন। আলিপুর জেলের মাঝখানে একটা গীর্জা আছে। তার ভিতর টেবিল চেয়ার সাজিয়ে বসেছেন তখনকার বাংলা সরকারের অ্যাডিশনাল সেক্রেটারী ষ্টীফেনসন, টেবিলের দুইপাশে বসেছেন ইনস্পেক্টর জেনারেল অব প্রিজন্‌স্ বুকানন এবং সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মুলভেনি।

একে একে আমাদের ডাক পড়লো। সবাইকেই প্রায় একই ধরনের প্রশ্ন—কেন হাঙ্গার স্ট্রাইক করেছি? আমাদের নালিশ কি—ইত্যাদি।

আমাকে বিশেষ প্রশ্ন করলো, তুমি ত সেদিন এসেছ, তোমার কি নালিশ থাকতে পারে? আমি বললাম, আমার ব্যক্তিগত নালিশ আর কি থাকতে পারে? তোমরা বিনাবিচারে ধরে রাখবেই বা কেন? আর প্রেসিডেন্সি জেলে যা দেখে এলাম রাজবন্দীদের সঙ্গে সে রকম ব্যবহারই বা করবে কেন?

আমার যখন জবানবন্দী চলছে, তখনই দুর্গ থেকে গুড়ুম গুড়ুম আওয়াজে জানিয়ে দিল, মণ্টেগু আর চেম্‌স্‌ফোর্ড এসে হাওড়ায় পৌঁছাল। ষ্টীফেনসন আমায় জিজ্ঞাসা করে, এই দিনেই হাঙ্গার স্ট্রাইক করার পরামর্শ তোমাদের কে দিল? আমি বলি, পরামর্শ আবার কে

দেবে? বেচারীর তো ধারণা, আমরা খবরের কাগজ পড়তে পাই না!

মনোরঞ্জনদা খুব কড়া কড়া কথা শুনিয়ে দিলেন। মেজদাকে (চন্দননগরের বসন্ত ব্যানার্জি) যেমন বলেছে, তুমি কি মনে কর, তুমি আত্মহত্যার ভয় দেখাবে, আর সেই জবরদস্তিতে গবর্ণমেণ্ট তোমায় ছেড়ে দেবে, মেজদা জ্ব'লে উঠ্‌লেন, বললেন, না যদি দেয় তো বুঝব, Government have committed nothing but murder, murder, murder on me."

এ পর্ব শেষ হ'ল। নিজেদের জায়গায় ফিরে এসে পরস্পরের নোট মিলিয়ে বোঝা গেল, কপালে দুঃখ আছে। হয়তো, হয়তো কেন, নিশ্চয়ই ছড়িয়ে পড়তে হবে। তখন কি করা হবে, না হবে—আর একবার ক'রে সবার সংকল্প দৃঢ় ক'রে নেওয়া হ'ল।

পরে শুনেছি, ঐ দিন রাত্রে লাটভবনে এক কনফারেন্স হয়। তখন বাংলার নতুন গবর্ণর লর্ড রোনল্‌ড্‌শে। তিনি বলেন, রাজবন্দীরা যখন জেলেই বন্ধ থাকবে, তখন জেলে তাদের সব কিছু সুযোগ সুবিধা কেন দেওয়া হবে না? জেলে যেখানে খুসি, কেন ঘুরে বেড়াতে পারবে না? ইন্‌স্পেক্টর জেনারেল বুকানন বলে, তা যদি করা হয়, তা হলে আর আমি জেলের আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখতে পারব না। এর পর স্থির হয়, আমাদের অনেককে ভারতবর্ষের বিভিন্ন জেলে একা একা পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

ইতিমধ্যে আমরা আমাদের পূর্বসংকল্প অনুযায়ী কুঁজো থেকে জল গড়াই আর খাই। আর, ওরা ওদের কর্তব্যের ধারা অনুযায়ী সকাল সন্ধ্যা ঘরে ঘরে খাবার যেমন দেবার দিয়ে যায়। সকালেরটা বিকেলে, সন্ধ্যারটা সকালে যেমনকার তেমন তুলে নিয়ে যায়।

যে কয়েদীরা তুলে নিয়ে যায়, তারাও চোখের জল ফেলে, হা হুতাশ করে।

২রা ডিসেম্বর। দুপুর বেলা, হঠাৎ হেমেনদার আর মনোরঞ্জনদার ডাক পড়লো মালপত্রসহ জেল আফিসে যাবার। বিকেলে শুনলাম, তাঁদের পাঠানো হ'ল যথাক্রমে দার্জিলিং ও বর্ধমান জেলে। যুগান্তর দলের শ্রেষ্ঠ নেতাদের মধ্যে এঁরা দু'জনই তখন ছিলেন ঐ জেলে। তাছাড়া, হেমেনদা মেদিনীপুর থেকে প্রথম হাঙ্গার স্ট্রাইকের অভিজ্ঞতা নিয়ে এসেছিলেন, এবং মনোরঞ্জনদা পদে পদে রাজবন্দীদের অধিকার নিয়ে জেলকর্তৃপক্ষের সঙ্গে, জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট প্রেন্টিসের সঙ্গে ঝগড়া করেন। প্রথমেই এঁদের বিদায় করবার অর্থ একরকম বোঝা গেল।

বিপদের দিনে এই বিচ্ছেদে সকলেই একটু বিষণ্ণ হয়ে পড়লেন।

সেই দিন বিকেলে একটি ঘটনা ঘটলো। উপবাসে আছি, কিন্তু আমরা সকাল বিকালের বেড়ানোটা বন্ধ করিনি। এর স্বাস্থ্যের দিকও ছিল—তাছাড়া, বের হলে অন্য রাজনৈতিক কয়েদীদের সঙ্গে দেখা হয়, খবরাখবরও আদান প্রদান করা যায়। তাঁদের মুখেই শুনলাম, আমাদের চিঠি সব কাগজে কাগজে বেরিয়ে গেছে।

বেড়িয়ে ফিরছি—গেটের সামনে দেখা ইউরোপিয়ান কয়েদীদের সঙ্গে। তাদের ভিতর Topps নামে একটা ওলন্দাজ কয়েদী ছিল। লোকটি একটি আন্তর্জাতিক ঠক। আটটি বিভিন্ন ভাষায় পড়তে লিখতে ও কথা কইতে পারে। সে জার্মান ভাষায় জিতেনবাবুকে আমাদের হাঙ্গার স্ট্রাইক সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো, সহানুভূতি জানালো। জিতেন-বাবুও যা বলবার বললেন।

সেদিন ওয়ার্ডার ছিল সেই শয়তান গ্রান্ট। সে জিতেনবাবুকে বলে, কথা বলছ কেন?

বলছি, বেশ করেছি, তোর যা করবার কর গিয়ে যা।

গিয়ে সেই জেলার অ্যাট্‌কিন্‌সন্‌কে ডেকে নিয়ে এল। তার কথা বলার রকমই ছিল যেন ধমকানি। জিতেনবাবু বললেন, না খেয়ে তিলে তিলে মরতে যাচ্ছি। তুই কি ভয় দেখাতে এসেছিস রে? যা খুসি কর্‌ গিয়ে।

জেলার গিয়ে মুলভেনিকে ডেকে নিয়ে এল।

মুলভেনি কথা পাড়তেই যেন বারুদস্তুপে আগুন পড়লো। জিতেনবাবু জেলারকে দেখিয়ে বললেন, তুমি কি জাননা, বরাবর এই কুকুরের বাচ্চা আমাদের পেছনে লেগে রয়েছে?

শুনে মুলভেনি আর দাঁড়ালেন না। যেতে যেতে জেলারকে ধমক দিয়ে বল্‌লেন,—অন্য ঘরের বন্ধুদের কানে গেল,—এ সময়ে এদের মেজাজ স্বভাবতঃই খারাপ থাকবে। কেন এখন এইসব ছোটখাটো ব্যাপার নিয়ে কথা তোল?

পর দিন ভোরে অন্য ব্যাপার। আমার ঘরটা এক পাশে। অন্ধকার থাকতেই ঘর খোলে, আমি বেরিয়ে ইয়ার্ডে বেড়াই। রায়ান সাহেব ডাকলেন—Mr. Datta, please come with me. ইয়ার্ডের দরজা খুলে আপিসে নেবে, কি হাসপাতালে নেবে—প্রথমটা ঠিক বুঝতে পারিনি। শেষে দেখি ম্যাজিষ্টেরিয়াল সেল যে গুলো আছে, অর্থাৎ সাম্‌নে ঘেরা, সাধারণ কয়েদীদের মধ্যে বিশেষ অপরাধী যারা তাদের থাকবার জন্য খারাপ সেল, সেই দিকে নিয়ে চলেছে। আগে আমাদের নিজেদের মধ্যে একবার কথা হয়েছিল, ঐ সেলে আমাদের নিতে চাইলে, আমরা বিনা বাধায় যাব না, বলপ্রয়োগ করলে যাব,—বলপ্রয়োগ অবশ্য ঠিক ধ্বস্তাধ্বস্তি পর্যন্ত নেব না—গায়ে হাত দেওয়া অর্থই বলপ্রয়োগ ধরে নেব।

কথাটা মনে পড়তে দাঁড়িয়ে গেলাম, জিজ্ঞেস করলাম, ওখানে নিয়ে চলেছ কেন? রায়ান বললেন, order. আমি বললাম, জোর না করলে যাব না। রায়ান সাহেব একটু বিপদে পড়লেন, ইতস্ততঃ ক'রে, একটু দূরে গীর্জার কাছে বসে জেলার গনতি মিলাচ্ছিল তাকে গিয়ে রিপোর্ট দিলেন।

জেলার ভুঁড়ি দোলাতে দোলাতে ছুটে এল, পেছনে জমাদার। বল্‌লো, ও-সেলে যাবে না?

Not unless I am forced.

আগের দিনের রাগটা সর্বাঙ্গে গর্‌গর্‌ করছে। তারপর ভোরবেলা একটু বোধ হয় টেনেও এসেছে। কিন্তু রাগ বেশী প্রকাশ করার সাহস আর নেই। শুধু হাতপা চোখের ভঙ্গীতে বিক্রম প্রকাশ করে বললো, জমাদার, লে যাও পাকড়কে।

জমাদার আমার পাশে এসে একখানা হাতে আস্তে হাত লাগিয়ে বললে, চলিয়ে বাবুজী!—সেলে ঢুকলাম।

একে একে অনেককেই ওখানে নিয়ে আসা হ'ল। এই সেলে আনবার বেলায় এই রকম প্রতিবাদের যে একটা কথা ছিল, তা বোধ হয় আর কারও খেয়াল ছিল না।

সকাল বেলায় যখন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এলেন বন্ধুদের পরামর্শক্রমে নালিশ করলাম জেলারের বদ মেজাজ ও অসদ্ব্যবহারের (bad temper and manners) জন্য। কি ঘটনা ঘটেছিল মুলভেনি জানতে চাইলেন। সমস্তটা শুনে বললেন, But you had no business to disobey orders.

তারপর শুনতে পেলাম, জেলারকে বলতে বলতে যাচ্ছেন, এদের এ সেলে নিয়ে আসার কোন প্রয়োজন ছিল না। জেলার জবাব

দিচ্ছে, সার, আমার আশংকা হয়েছিল, এরা যদি violent হয়ে ওঠে, আমি জেলের শৃঙ্খলা বজায় রাখতে পারব না।

এর জবাবে মুলভেনি কি বলেছিলেন জানি না। কিন্তু খানিকটা বাদে জেলার আমার সেলে এসে বললে, আমি যদি আপনাকে কোন আঘাত দিয়ে থাকি, আমি তার জন্য দুঃখিত, আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাই।

ঐ সেলেও সারা দিন রাত সেল থেকে সেলে ডাকাডাকি ক'রে হৈচৈ ক'রে দুটো দিন আমাদের কাটলো। বেছে বেছে আমাদের জনকতককে নিয়ে এসেছে। খুব লাগলো। কিন্তু যাঁরা আগেকার সেলে পড়ে রইলেন, তাঁরা বয়োবৃদ্ধ। তাঁদের লাগলো আরও অনেক বেশী। কয়েদীরা চারবার ক'রে খাবার আর চা নিয়ে আসে, তাদের মারফত খবরাখবর চলে।

পরদিন এল আই. জি. বুকানন। হাউ হাউ ক'রে কথা বলে। আমরা ওকে বলতাম বোকানন্দ। সব ঘরের সামনে খাবার পড়ে রয়েছে। সবাইর কাছে গিয়ে একই প্রশ্ন করে, Why are you spoiling all this good food ?

একে তো সরকারী দপ্তরের ফাইল মাফিক কাজ, তার উপর মণ্টেগু এসেছে। হাঙ্গার স্ট্রাইকের ভিতর নতুন লোক এসে পড়ে তার হিসাব নেই। পাছে কোথাও থেকে কিছু জানাজানি হয়ে যায়—ওরা দালান্দা হাউস খালি ক'রে দীর্ঘকাল সেখানে যে সব বিনাবিচারের বন্দীদের রেখেছিল—সব এজেলে ওজেলে পাঠিয়ে দিল। আমাদের যেদিন হাঙ্গার স্ট্রাইক আরম্ভ, তার আগের দিন রাত্রে এলেন [illegible] কর্মী সিরাজগঞ্জের সতীশ দে, আর যে দিন হাঙ্গার স্ট্রাইক সুরু হয়ে গেছে, সেই দিন সন্ধ্যা বেলায় ইয়ার্ডের সামনে রাস্তায় বেড়াচ্ছি, এমন সময় এলেন পালং-এর আশু কাহালি।

দুইজনই হাঙ্গার স্ট্রাইকে যোগ দিলেন। সতীশ দে রাত্রে এসে শুনলেন, পরদিন থেকে আমাদের হাঙ্গার স্ট্রাইক সুরু। খুব উৎসাহ, বেশ বীরত্বের ব্যঞ্জনা দিয়ে আমাদের গান শোনালেন—

সভা যখন ভাঙ্গবে

তখন শেষের গান কি যাব গেয়ে?

একটু একটু শীত পড়েছে, সতীশবাবু নতুন এসেছেন, শীতের কাপড় পান নাই, তাঁকে গায়ে দেবার জন্য আমার আলোয়ানখানা দিয়েছি। বাবার দেওয়া আমার একখানা এণ্ডি চাদর ছিল, আমি সেইখানা গায়ে দিয়েছি।

ম্যাজিষ্টেরিয়াল সেল থেকে বুকানন যখন আমাদের সাথে দেখা ক'রে ফিরে যায়, সাম্‌নের দরজার একটু ফাঁক দিয়ে চোখে পড়লো, বুকাননের সঙ্গে সঙ্গে যেন আমার আলোয়ানখানাও চলে গেল।

ওরা চলে যেতে আমার এক পাশের সেলে প্রতুল গাঙ্গুলি, অপর পাশে রমেশ চৌধুরী—ওঁদের ডেকে জিজ্ঞেস করি, কে? সতীশ দে চলে গেল না? ওঁরা বললেন, তাইতো মনে হ'ল। পরে, কয়েদী ও সিপাইদের মুখে শুনলাম, ও বাবু খেতে রাজী হয়েছেন, তাই ওঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হ'ল। ভদ্রলোকের কিন্তু আমাদের চেয়েও কম বয়স, বেশ জোয়ান চেহারা।

ওদিকে ইউরোপিয়ান ইয়ার্ড থেকে সাতুদা (২৪ পরগণা মাহিনগরের সাতকড়ি ব্যানার্জি) ও দুর্গাচরণবাবু খবর পাঠাচ্ছেন, তিন দিন হয়ে গেছে, তবু বৃদ্ধ দেওয়ান সিংকে কিছুতে খাওয়ান যাচ্ছে না। অথচ খুব দুর্বল হয়ে পড়েছেন। বলছেন, আমার বাচ্চার মতো সব সোনার চাঁদ ছেলে—ওরা না খেয়ে থাকবে, আর আমি খাব?

আমরা সকলে মিলে অনুরোধ করে পাঠালাম, পরদিন থেকে খেতে আরম্ভ করলেন।

রাত্তির বেলায় পেছনের সেল থেকে কয়েদীরা কেউবা দুঃখ করে, কেউবা খোদার কাছে আমাদের জন্য দোয়া মাগে, কেউবা বলে, আমাদের জয় সুনিশ্চিত।

পরদিন সকাল বেলা সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এলেন, আমার নাড়ী পরীক্ষা করলেন, বুকে চোঙা একবার লাগালেন, তারপর আমার টিকেটে লিখলেন, Fit for travel. জিজ্ঞেস করলাম কোথায় পাঠাচ্ছেন ?

বললেন, তা জানিনে। তবে এইটুকু বলতে পারি, কাল এমন সময় আপনি বাংলার সীমানা থেকে বহু দূরে। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট চলে গেলে জানা গেল, আমরা ছয় ব্যক্তি একসঙ্গে অপর কোথাও যাচ্ছি—প্রতুলবাবু, রমেশবাবু, সত্যেন দা, জিতেন লাহিড়ি, বসন্ত ব্যানার্জি ও আমি।

দুপুরবেলা অফিসে ডাক পড়লো। আর এক নম্বর করুণ বিদায়ের পালা—দুই ইয়ার্ডেরই যত জনের কাছ থেকে সম্ভব হ'ল বিদায় নিলাম।

আপিসে যেতে মুলভেনি বললেন, শুনছি আপনাদের সব চিঠি কাগজে কাগজে ছাপা হয়েছে। এ সব চিঠি নিশ্চয় আমার জেল থেকে যায় নাই!

কথার ইঙ্গিতটি বুঝলাম—বললাম, তা কি করে সম্ভব ?

সত্যেন দা জিজ্ঞেস করলেন, কি মতলবে চালান করে দিলেন ?

জানি না, হয়তো জোর করে নল চালিয়ে খাওয়াবে।

এ ক'রে কতদিন বাঁচিয়ে রাখবে ?

বহু মাস।

হাওড়া স্টেশনে গিয়ে দেখি দুদিকে দুগাছা দড়ি ধরে পুলিশ জন কতক দাঁড়িয়ে রয়েছে—যে পথ দিয়ে আমরা ট্রেন পর্যন্ত যাব, তার সীমানার ভিতর কোনো লোক ঢুকতে দিচ্ছে না।

দূর থেকে বহু লোক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখ্‌ল—আমরা ছয় জন তিনখানা ইণ্টার ক্লাসের গাড়ীতে উঠলাম। গাড়ীটা বোধ হয় নাগপুর প্যাসেঞ্জার। আমাদের এক একটা গাড়ীতে চারজন ক'রে পুলিশ। একজন বুড়ো মতো ইউরোপিয়ান ইনস্পেক্টার ওদের দলপতি, আর রইলো আই. বি.র একজন সাব-ইন্‌স্পেক্টার।

স্টেশনে স্টেশনে নামি—পরস্পরকে জিজ্ঞেস করি, কোথায় যাব? হদিস পাইনে। এই অনিশ্চয়তাটাই পীড়া দিচ্ছে। জিতেনবাবু আই. বি.টার সাথে খাতির জমান—কোন লাভ হয় না।

আমরা গল্প করি, বুড়ো কোনো আপত্তি করে না। বরং চা খাব কি না, অন্য কিছু খাব কি না জিজ্ঞেস করে। কিন্তু একটা স্টেশনে—বোধ হয় খড়্গপুরে—প্রতুলবাবু যখন বলেন, তার চেয়ে বরং একখানা কাগজ কিনে দাও, ও বলে, কাগজ তো তোমরা পড়তে পাবে না।

দীর্ঘ পথ, পাসেঞ্জার গাড়ী, ছ্যাকড়া গাড়ীর মতো চলছে, পাঁচদিনের উপোস—অনেকেই একটু ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন—বিশেষ ক'রে জিতেনবাবু ও মেজদা (বসন্তবাবু), আমি আর সত্যেনদা প্রায় শেষ পর্যন্তই নামি আর গল্প করি।

পরদিন বিকেলের দিকে। বুড়ো ইন্‌স্পেক্টার পকেট থেকে একখানা শ্লিপ কাগজ বের করে। আমাদের কয়জনের নাম লেখা। প্রথম নামটাই আমার। জিজ্ঞেস করলো—**Who is Mr. Bhupendra Kummar Dutta?** বললাম, আমি। ও বললে, আর এক ঘণ্টা বাদে আপনাকে নামতে হবে, তৈরী থাকবেন।

ও পথে তখনও অতদূর যাওয়া আসা করিনি। কেউই ধারণা করতে পারলেন না, আমায় কোথায় নামাবে।

বিলাসপুর স্টেশন, আসন্ন সন্ধ্যা। আবার সবার কাছ থেকে বিদায়ের পালা। এ বিদায়ের অর্থ কি, ভুক্তভোগীরা ছাড়া আর কেউ বুঝবে না। শিশু—মা নয়, বাবা নয়—সর্বক্ষণ যার সঙ্গে থাকে, যার উপর নির্ভর করে, যে ভালবাসে, তারই কাছ ছাড়া হতে হু হু করে কেঁদে ওঠে। দিন রাতের, সুখ দুঃখের, বিপদ আপদের সব সঙ্গী—যাদের আপনার বলতে আর কেউ নেই, আছে হয়তো, কিন্তু আর কখনও কাছে পাব কি না অনিশ্চিত—একত্র এই আজ যারা আছে, তারাই আমাদের আপনার। তারা পরস্পরকে ফেলে যাচ্ছে—হয়তো এজীবনে এই শেষ দেখা।

সন্ধ্যার অন্ধকারে একখানা ছ্যাকড়া গাড়ী ক'রে ঢুকলাম বিলাসপুর সহরে।

পরে জেনেছি—ষ্টেট প্রিজনারদের বেলায়, সর্বদা যেমন করে—নাম, ওয়ারেণ্ট প্রভৃতি, যে জেলে বদলি করবে, আগে থাকতে সেই জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কাছে পাঠায়, আমাদের ক্ষেত্রে সে সব কিছুই করে নাই। ভারত গভর্ণমেণ্টের হোম মেম্বার, হোম সেক্রেটারী—সব তখন মণ্টেগুর সঙ্গে সঙ্গে কলকাতায়। ওরা মধ্য-প্রদেশ গভর্ণমেণ্টকে তার করে দিয়েছে, তোমাদের ছয়টি জেলে ছয় জন বাঙালী রাজবন্দী রাখতে হবে। সেই অনুযায়ী ওখানকার ইন্‌স্পেক্টার জেনারেল অব্‌ প্রিজন্‌স্‌ বিলাসপুর, রায়পুর, নাগপুর, অমরাবতী, জব্বলপুর ও সাগর জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টদের প্রত্যেককে তার করে দিয়েছে, একজন বাঙ্গালী ষ্টেট প্রিজনার আসছে, তাকে রাখবে। যথাক্রমে এই কয়টি জেলে গেলাম আমি, প্রতুলবাবু,

রমেশবাবু, সত্যেনদা, জিতেন লাহিড়ি ও মেজদা। সাহেব ইন্‌স্পেক্টারটি যেমন নামের লিষ্ট করেছে, যা পেয়েছে, তেমনি ভাবে পর পর এক এক জনকে এক এক জায়গায় নামিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। সব জায়গা ঘুরতে ঘুরতে মেজদার সাগর পৌঁছাতে ছয় দিন লেগে গেল।

ঐ ব্যবস্থা যুক্তপ্রদেশের ছয়টি জেলেও করা হ'ল।

আমাদের পরদিন সেখানে গেলেন সাতকড়ি ব্যানার্জি, সুরেশ দাস, যশোরের বিজয় রায়, সৌরীন, হরিদার ভাই মাখন ও আশু কাহালি।

জেলে যখন পৌঁছালাম, তখন রাত হয়ে গেছে, জেল বন্ধ হয়ে গেছে। খানিক বাদে জেলার তার বাসা থেকে এল। নাম জিজ্ঞেস করলো। বললাম। সঙ্গের বাক্স, বিছানা দেখে জিজ্ঞেস করে—এ কি আপনার সঙ্গেই থাকতো, না, অফিসে থাকতো? আমি বললাম, সঙ্গেই থাকতো।

জিজ্ঞেস করে, কোন ধারায় আপনার শাস্তি হয়েছে?

কোন ধারায় নয়।

তবে?

বিনাবিচারে আটক করে রেখেছে।

কোন আইনে?

Regulation III of 1818

1818? What is that?

যা বলবার বললাম। জিজ্ঞেস করলো, যে জেল থেকে আসছেন, সেখানে আপনাকে কোথায় রাখতো?

বললাম, ইউরোপিয়ান সেলে।

ও বললে, আমাদের তো ইউরোপিয়ান সেল ব'লে কিছু নেই, সাধারণ সেল যা আছে তারই একটি খালি ক'রে দিই। সেখানে আপনার বিছানা দিচ্ছি, কিন্তু বাক্স আপনি পাবেন না।

কেন ?

জেলের আইনে নেই। তবে কাল সকালে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আসুন—তাঁকে জিজ্ঞেস ক'রে যা দরকার করব। এখন আপনি কি খাবেন ?

জল ছাড়া আর কিছু না।

খেয়ে এসেছেন ?

না, হাঙ্গার স্ট্রাইক করেছি।

সে আবার কি ?

অনশন ব্রত নিয়েছি, বিনাবিচারে বন্দী করে রাখার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে।

ও যা বুঝবার বুঝলো।

খানিকটা বাদে একটি সেলে নিয়ে ঢুকালো। যেমন ছোট, তেমনি কদর্য, তেমনি আলো বাতাসের প্রবেশপথ শূন্য। প্রেসিডেন্সি জেলের ৪৪ ডিগ্রির কথা আগে বলেছি। তার ভীষণতা আছে, কিন্তু আশে পাশে মানুষ আছে এই অনুভূতিটা থাকে—এর এই ছমছমে ভাবটা সেখানে নেই।

ছোট্ট জেল, মাত্র ১২০ জন কয়েদীর থাকবার জায়গা, জেলে দুইটি মাত্র সেল। তা-ও এক জায়গায় নয়, একটি ইয়ার্ডের দুই পাশে দুটি। মানুষের স্পর্শ থেকে মানুষকে যতোখানি দূরে রাখা যায়, তারই ব্যবস্থা।

পরদিন সকালে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এল। আমার কাছ থেকে জেরা ক'রে যা যা জানবার জেনে নিল। তার পর গেল জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের

বাসায়। আলাপ আলোচনা ক'রে ফিরে এল—বেলা ছুটো আন্দাজ দেখি, এক কয়েদীর মাথায় আমার বাক্স নিয়ে অ্যাসিষ্টাণ্ট জেলার এল। কয়েদীটি রয়ে গেল, আমার কাজকর্ম্ম যা থাকবে, করবে।

একখানি ডেক চেয়ার এল। তাতেই বসে বসে দিন কাটে। বাক্সে বই ছিল একখানি গীতাঞ্জলি, একখানি রামায়ণ, একখানা অধ্যাত্ম রামায়ণ, একখানা Immitation of Christ, একখানা Trineএর In Tune with the Infinite, একখানা Millএর Liberty ও Representative Government, এমনি আর ছু'এক খানা পড়া বই ও ছু'তিন খানা খাতা।

হাতে নিয়ে বসতাম প্রায়ই গীতাঞ্জলিখানা, কিন্তু আকাশের দিকে চেয়েই দিন কাটত। আকাশের দিকে চাইবার অবকাশ পর দিন থেকে হ'ল। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কি ভেবে চিন্তে পর দিন সেল থেকে আমায় মুক্ত করলেন। পাশের ওয়ার্ডটায় প্রায় চল্লিশজন কয়েদী থাকতো, তাদের অন্যত্র সরিয়ে দিলেন। ওয়ার্ডের ভিতর কয়েদীদের শোবার যে মাটির ঢিবিগুলো, তার মাঝখানে একটা জানালার সামনে আমার লোহার খাটখানা পড়লো। দিনের বেলায় ওয়ার্ডের তিন দিক ঘেরা বারান্দার কোনো না কোনো দিকে ডেক চেয়ারে বসে কাটতো।

রাতের বেলায় ছুইপাশের ছুটো সেলে ছুজন কয়েদি থাকতো। সারাদিন সমস্ত জায়গাটা নিয়ে থাকতাম আমি, আমার কাজকর্ম করবার সেই কয়েদিটি—যার করবার কিছুই ছিল না, সারাদিনে এক কুঁজো করে জল ভরা, ডেক চেয়ারখানা পেতে বা সরিয়ে দেওয়া, আর স্নানের পর কাপড় আর তোয়ালেখানা ধুয়ে শুখোনো ছাড়া। আর থাকতো আমার উপর নজর রাখবার এক সিপাই। এদের সঙ্গে গল্পে আর কতটুকু সময় কাটে? তাও গল্প করার নিয়ম ছিল না।

জেলার বা সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এসে পড়তে পারে, এমন সময়গুলো বাদ দিয়ে ওরা তবু ওরই ভিতর সময় সময় গল্প করতে চাইতো।

আর, খুব ভোরে জেলের গুনতি নিতে এসে অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট জেলার চন্দ্রিকাপ্রসাদ এক মিনিট আধ মিনিটের জন্য দু'একটা কথা ব'লে যেতেন। লোকটির প্রথম দিন থেকেই আমার প্রতি একটা সহানুভূতি এসে গিয়েছিল। কিন্তু মারাঠী জেলার ভেঙ্কট রাও ও মহারাষ্ট্র ব্রাহ্মণ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ডাঃ পরঞ্জপে এই যুক্তপ্রদেশের লোকটিকে বিশ্বাস করতো না। কাজেই ইনি ভয়ে ভয়ে থাকতেন। সারাদিনের খাটুনির পরে সন্ধ্যাবেলায় একটু ছুটি পেতেন। তখন এক ক্লাবে যেতেন। সেখানে স্থানীয় বাঙালীদের সঙ্গে দেখা হ'ত। বাঙালীরা ওঁর কাছে আমার খোঁজখবর নিতেন। আমি যে ঐ জেলে প্রয়োপবেশনে আছি সে-খবরও কাগজে বের ক'রে দেন ওঁরাই।

ভোরবেলাটা ইয়ার্ডের কাঁকরের উপর দিয়ে একটু বেড়াতাম। সেই সময়েই চন্দ্রিকাপ্রসাদ আসতেন। যা খবর থাকতো দু'এক কথায় ব'লে চলে যেতেন। বেশী সময় থাকতেন না, পাছে সিপাই জেলারকে ব'লে দেয়।

একলা বসে আকাশপাতাল কতো কথা ভাবি। মনে পড়ে, একদিন মরতে চেয়েছিলাম—ক্ষুদিরামের মতো, কানাইয়ের মতো ফাঁসির কাঠে। ছেলেবেলা থেকে মালা গাঁথতে ভালবাসতাম। কতো যত্নে এঁদের ছবিগুলোকে মালা দিয়ে সাজাতাম, অন্যের অলক্ষ্যে ছবি খুলে নিয়ে বুকে চেপে রাখতাম—জিজ্ঞেস করতাম, তোমাদেরই মতো কি জীবনকে সার্থক করতে পারব না?

আর এক দিনের কথা মনে পড়ে। যতীনদা বসেছেন উদার আকাশের নীচে দৌলৎপুর কলেজ হোষ্টেলের দোতলার খোলা

বারান্দায়। গভীর রাত। আমি একলা ওঁর দিকে চেয়ে বসে। যতীনদার ঐ মুখখানা, ঐ চোখ দুটো, ঐ বুকখানার সঙ্গে ঐ আকাশখানার কোথায় যেন যোগ আছে, কোথায় যেন মিল আছে। আকাশের রবিকে রবীন্দ্রনাথ মিতা বলে ডেকেছেন, ঐ আকাশখানাও যেন যতীন্দ্রনাথের মিতা।

চোখ নামিয়ে বললেন, প্রফুল্ল, ক্ষুদিরাম, সত্যেন, কানাই—একে একে মরে দেশকে জাগিয়ে গেছে। এখন আর একে একে নয়, আমরা ঝাঁকে ঝাঁকে যুদ্ধ ক'রে মরে দেশকে জাগাব।

বার বছর বয়সে মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত পড়ে রঘুনাথজী হাবিলদারকে করেছিলাম জীবনের আদর্শ। ভোরের দিকে যতীনদা চলে গেলেন। রাস্তায় তুলে দিয়ে ফিরতে ফিরতে নিজেকে প্রশ্ন করলাম, রঘুনাথজীর মতোই তোমার পাশে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করতে পাব তো? যুদ্ধে মরে জীবন সার্থক করতে পারব তো?

মনে পড়ে, যতীনদার কথাগুলোয় মনটা তখনও ভরপুর। বেলা প্রায় দুপুর। মেসে সহপাঠীদের খাবার জন্য তরকারির বাগান করেছি। তাই ঘিরবার জন্য জিওল গাছের ডাল কাটতে যাচ্ছি। কাঁধে গামছা, হাতে একখানা কাটারি। সমস্ত কথাগুলো যেন নিজের ভিতর ওলটপালট করছে, নিজেকে যেন আর ধরে রাখতে পারছি নে। ভৈরবের ধারে একটা গাছের ছায়ায় বসলাম। একে একে জীবনে প্রিয় সবার কাছ থেকে বিদায় নিলাম। শুধু মায়ের কাছ থেকে বিদায় নিতে চোখের জল সামাল দিতে পারলাম না। সে চোখের জল আমার কালে কালে শুকিয়ে গেল।

মনে পড়লো, আরও একদিন মরতে গিয়েছিলাম—এই সে দিন—নিজের গলায় নিজে ফাঁসি পরে—পাছে নিজের অজ্ঞাতেও নিজেকে দিয়ে দেশের কোন ক্ষতি হয়।

মরা হয় নাই। আজ আবার এক মরার দিন সামনে—একটা গুলিতে বা ফাঁসির দড়িতে এক মুহূর্তে নয়। তিলে তিলে দীর্ঘ দিন ধরে শুকিয়ে শুকিয়ে। পারব তো? আমার জন্যে বন্ধুদের যন্ত্রণা বাড়বে না তো? কলঙ্ক বইতে হবে না তো?

স্বপ্নের বিলাসের মধ্যেই বাস্তব তার কঠোর রূপে এসে দেখা দেয়। সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট এসে বলে, রায়পুর জেলে আপনার যে বন্ধু আছেন, তাঁর ঘরে জল না রেখে দুধ রাখা হত। তিনি দুধ খেতে সুরু করেছেন।

বেশ।

আপনার ঘরেও জল রাখা হবে না, দুধ থাকবে।

ভালো কথা। অসহ্য হলে নিজে মূত্রত্যাগ করেও খেতে পারব।

কি ভেবে চিন্তে সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট জল ও দুধ দুইই রাখতে হুকুম দিয়ে গেল।

আরও একদিন বাদে। সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট এসে শুনালো, আই. জি. হুকুম দিয়েছেন, যদি আপনি না খান আপনাকে যা যা সুবিধা দেওয়া হয়েছে, সব কেড়ে নেওয়া হবে।

সুবিধা কি কি, জানতাম না। দেখলাম, রাত্রে আমায় আবার ওয়ার্ড থেকে সেই সেলে নিয়ে যাওয়া হ'ল, এবং ট্রাঙ্ক, কাপড়, জামা,—এমনকি পায়খানার মগটি পর্যন্ত নিয়ে গেল। রেখে গেল শুধু বিছানা, তোয়ালে, আর খাবার জলের কুঁজো ও গ্লাসটি। কাপড় স্নানের সময় এনে দিত, আবার শুকোলে নিয়ে যেত। পায়খানার জন্য জল দিত কয়েদিদের খাবার একটা লোহার বাটিতে।

দু'দিন এইভাবে কাটলো। তারপর দিন ভোরে চন্দ্রিকাপ্রসাদ খবর দিয়ে গেলেন, গতকাল ভোরে অমৃতবাজার পত্রিকায় বেরিয়েছে

আপনার এই অবস্থার কথা, আর রাত্রে টেলিগ্রাম এসেছে—আপনার সমস্ত জিনিস ফিরিয়ে দেবার হুকুম হয়েছে।

জেল খুলবার পর আধ ঘণ্টাও যায় নাই, দেখি, বড় জমাদার পেছনে, আর তার আগে আগে এক কয়েদির মাথায় ট্রাঙ্ক, হাতে আমার কাপড় ইত্যাদি ফিরে এল। কিন্তু রাত্রের বাসস্থান আমার সেই সেলই রয়ে গেল। দিনের বেলায় ডেক চেয়ার ওয়ার্ডের বারান্দায় পড়তো, সারাদিন সেইখানেই কাটাতাম। এটা বোধ হয় স্বাস্থ্যের খাতিরে।

আর একদিন গেল। উপবাসের সেটা তের দিন। সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট একটা টেলিগ্রাম হাতে নিয়ে এল। আই. জি. টেলিগ্রাম করেছে, **If persuasion fails resort forced feeding.** বললে, আপনাকে দিনটা ভাব্‌বার সময় দিচ্ছি। সন্ধ্যার মধ্যে যদি না খান, আমাকে হুকুম তামিল করতে হবে।

ভাল।

সন্ধ্যার পরে জেলে তালা বন্ধ হয়ে গেছে, সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট এসে জিজ্ঞেস করলো, কি স্থির করলেন ?

বললাম, নতুন কিছু স্থির করিনি।

চলে গেল। খানিক বাদে আবার এল, সঙ্গে জেলার, ডাক্তার, বড় জমাদার, হাওয়ালদার, আর বাছা বাছা জোয়ান সিপাই ছয় জন। ডাক্তারের হাতে একটি কাঁচের ফ্লাস্ক, তাতে নল লাগানো। দুধতো একটি পিতলের হাঁড়িতে ঘরেই ধরা আছে।

হুকুম হ'ল, জমাদার প্যাক্‌ড়ো।

হাত ধরতেই, একটা ঝট্‌কা মেরে ছাড়িয়ে নিলাম। তখন সিপাই, হাওয়ালদার সবাই মিলে লেগে গেল। আন্দাজে বলি, বোধ হয়,

পনের মিনিট ঝাপটাঝাপটি চললো, এর ভিতর আমার কনুয়ের ধাক্কায় দুইবার দুই সিপাই অ্যান্টিসেলের দুই দেয়ালে পড়ে গেল। আমারও গা হাতপা মাথা অনেক জায়গা ছড়ে গেল। তবে একথাও বলি, ওরা আমায় কেউ মারেনি, বরং আমি ব্যথা না পাই, তারই চেষ্টা করেছে।

তখন আমায় বেশ চেপে ধরেছে। আমি দাঁত চেপে আছি, ডাক্তার নলটি মুখের সাম্‌নে ধরে আছেন। ওরা চোয়াল চাপাচাপি করতে চোয়াল কেটে মুখ দিয়ে রক্ত গড়াতে থাকলো।

ততক্ষণে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, জেলার চেঁচামিচি ক'রে হুকুম শুনাতে শুনাতে, আর আমার দুর্বার অবাধ্যতায় উত্তেজিত হয়ে উঠেছে।

আমার দাঁত খুলতে না পেরে হাওয়ালদার বলে উঠ্‌লো, দাঁত নেহি খুলতা।

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বলে বসলো, মারো দু লপ্পট, খোল দেগা।

আমি এক ঝাঁকানি দিয়ে মাথা মুখ ছাড়িয়ে নিয়ে চীৎকার ক'রে উঠলাম, What!

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট দু'পা পিছিয়ে দরজার কাছে চলে গেল। বললো, ছোড় দোও।

আবার সেলের ভিতর ঢুকিয়ে দিয়ে দরজা বন্ধ ক'রে ওরা সদলবলে চলে গেল।

পরদিন সকাল বেলা জমাদারকে বললাম, জেলারকে ডেকে দিতে। জেলার আসতে বললাম, চারখানা সাদা কাগজ পাঠিয়ে দাও।

কি করবেন?

দরখাস্ত লিখব।

কি ব্যাপার নিয়ে, কার কাছে?

তাতে তোমার প্রয়োজন নেই, তুমি কাগজ পাঠাবে কি না, তাই আমি জানতে চাই।

না, তা নয়, কাগজ কেন পাঠাব না? আমি অমনিই জিজ্ঞেস করছিলাম—যদি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট জানতে চান।

India Governmentকে দরখাস্ত দেব, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের ব্যবহার সম্পর্কে।

খানিক বাদে কাগজ পাঠিয়ে দিল। আমি তখন লিখছি, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এসে বললো, আমি বড়ই দুঃখিত, কাল আমি মেজাজ ঠিক রাখতে পারিনি। আমার ওরকম কথা বলা অন্যায় হয়েছে। আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি।

আচ্ছা বেশ। কর্তব্য যা করবার করবেন, কিন্তু কথাবার্তা ভদ্রভাবে বলবেন।

ষ্টেট প্রিজনারদের সম্পর্কে একটা নিয়ম ছিল, জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট হোক্, ডেপুটি কমিশনার হোক, প্রতিমাসে একবার ক'রে দেখে যাবে; কিন্তু বিলাসপুরে আমি যে পাঁচ মাস ছিলাম, তার ভিতর ইউরোপিয়ান ডেপুটি কমিশনারটি একবারও আসে নাই। দু'একবার জেলের অফিস পর্যন্ত এসে ফিরে গেছে, শুনেছি। আমার কাছে আসতেন একজন অ্যাসিষ্টাণ্ট কমিশনার—বাঙালী যুবক—এস. পি. সান্যাল। বেশ ভদ্র এবং শিক্ষিত।

সেদিন সকালের মধ্যেই দ্বিতীয়বার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের আবির্ভাব; সঙ্গে ইনি। ইনি কে, তখনও তা জানিনে। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ওঁকে বললে, কাল তো বাঘের মতো লড়াই করেছেন; কিন্তু আমাকে আমার কর্তব্য করতেই হবে। ভদ্রলোক নীরবে আমার দিকে কিছু সময় তাকিয়ে থেকে চলে গেলেন।

প্রথম হাজার স্ট্রাইক

বেলা বারোটা আন্দাজ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট আবার এল—পেছন পেছন জেলার, ডাক্তার, গত রাত্রের সেই সব সিপাই জমাদার, আর তাদের পেছনে একজন কালাপাগড়ি নিয়ে জোড়ায় জোড়ায় মোট পঁচিশটি কয়েদী। কয়েদী চালাবার জন্যে সিপাই জমাদারের নীচে তিন শ্রেণীর কয়েদী অফিসার থাকে। এর ভিতর সর্বনিম্নস্তরে পাহারাওয়ালা, ওরাই কিছু পুরানো হলে হয় মেট, আর বহু পুরানো মেটদের মধ্যে দু'পাচজন হয় কালাপাগড়ি।

বড় ঘরটায় একখানা আলাদা খাট দিয়েছিল দিনের বেলায় বিছানাটা সেখানে এনে দিত। শুয়ে ছিলাম, জানালা দিয়ে ওদের দেখে গণে নিলাম, এবং আসন্ন যুদ্ধের জন্য মনে মনে তৈরী হয়ে নিলাম; কিন্তু উঠবার কোনো লক্ষণ দেখালাম না।

আগের রাত্রে ঝটাপটির সময় চশমাটা ছিট্‌কে পড়ে গিয়েছিল। আজ এসে সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট প্রথমেই চোখ থেকে চশমা খুলে নিয়ে হুকুম দিল, 'পাকড়ো'। সিপাই জমাদাররা যখন আমার হাত পা চেপে ধরেছে, কয়েদীরা তখন একে একে আমার পায়ের ধূলো নিচ্ছে।

দাঁত চেপে ছিলাম। ডাক্তার কি একটা পিতলের যন্ত্র বের ক'রে আমার দাঁতের ফাঁকে ঢুকাতে চেষ্টা করলো। তখন হাত পা মাথায় ঝাঁকানি দিয়ে ওদের ছাড়িয়ে উঠে বসলাম। সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট বললে তুলে ডেক চেয়ারে নিয়ে যেতে। তখন আবার এক ধ্বস্তাধ্বস্তি; ধুতিটা এদিক থেকে ওদিক পর্যন্ত ফেড়ে বেরিয়ে গেল।

তখন বেশ খানিকটা ক্লান্তও হয়েছি—এটা উপবাসের চৌদ্দ দিন। সর্ব অঙ্গেই প্রায় মানুষের হাত চেপে রয়েছে। ডাক্তার সেই পিতলের যন্ত্রটা দাঁতের ফাঁকে যখন ঢুকাচ্ছে, তখনও মাথা ঘোরানো ফেরানো চলছে। একটা স্ক্রু ঘোরাতে ঘোরাতে দাঁত ফাঁক হয়ে গেল! দাঁতের

ফাঁকে একটা কাঠের টুক্‌রো ঢুকিয়ে দিল, তার মাঝখানে একটা ছ্যাদা, দুপাশে দুটো ফিতে বাঁধা—সে দুটোকে মাথার পেছনে বেঁধে দিল। এটাকে ওরা বল্‌তো Gag.

গ্যাগের মাঝখানের ছ্যাঁদা দিয়ে একটা নল চালিয়ে দিল। নলটা যেন বেত দিয়ে বোনা, বেশ শক্ত। গলার ভিতরে না ঢুকে সেটা তালুতে খোঁচা মারতে লাগলো। কশ বেয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়লো। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট নলটা টেনে নিয়ে খানিকটা বেঁকিয়ে আবার ঢুকিয়ে দিল, এবারে গলার বদলে বুকে খোঁচা মারতে সুরু করলো। আর বেশী দূর ঢুকলো না।

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বল্‌লে, এইবারে দুধ ঢালো। নলের বাইরের মুখে একটা কাঁচের ফানেল ছিল। তা দিয়ে খানিকটা দুধ ঢেলে দিল। বুকের কাছে তখন বেশ ব্যথা করছে।

দুধ খাওয়ান হয়ে যেতে ছেড়ে দিল। তখন গলার ভিতর আঙ্গুল ঢুকিয়ে দু'একবার ঘুরাতে রক্তে দুধে মিশে বেশ খানিকটা দই আর লাল জল যেন পড়ে গেল। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট খানিকটা তাকিয়ে দেখে সদলবলে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল। বুকে তখনও বেশ ব্যথা, বমি ক'রে আরও বেড়ে গেল।

একটু বাদে স্বল্পবাক্‌ পার্শি ডাক্তার মোডি ঘুরে এলেন। বৃদ্ধা বিধবার মতো চেহারা, বৃদ্ধা বিধবার মতোই অন্তঃকরণটা সহানুভূতিতে ভরা। বল্‌লেন, রাস্কেলটাকে বল্‌লাম, জোর ক'রে খাওয়াবার মতো যে রবারের নল, তা আমাদের নেই, এ নল দিয়ে খাওয়ান উচিত হবে না। তবু কথা শুন্‌লো না। আপনার বুকে ব্যথা করছে নিশ্চয়ই। হেসে বল্‌লাম, 'একটু'।

চেষ্টা করব যাতে কাল আপনাকে খাওয়ান না হয়। দুবার

খাওয়াবার কথা ছিল, ওবেলা খাওয়ান হবে না, বলেই গেছে। আর, এরকম করে খাইয়েই বা লাভ কি হবে? আপনি তো আরও জীর্ণ হয়ে পড়বেন।

পরদিন সকালে আবার এসে বললেন, আপনাকে জোর করেই তো খাওয়ান হচ্ছে, আপনি নল চালানোতে বাধা দেবেন না। অত ধ্বস্তাধ্বস্তি ক'রে অত রক্ত পড়ে আপনি আরও তাড়াতাড়ি দুর্বল হবেন।

হেসে বললাম, আমি কি সবল হতে চাইছি?

সে কথা বলছি না। আপনি স্বেচ্ছায় না খেলেই তো হ'ল। আপনি চেয়ারে ব'সে থাকবেন, আমরা নল চালিয়ে খাইয়ে যাব।

সে হয় না।

ক্ষুণ্ণমনে ডাক্তার চলে গেলেন। ওঁর মুখখানা সর্বদাই যেন বিষাদে ভরা।

ডাক্তারকে বললাম, 'সে হয় না।' কিন্তু নিজের ভিতরটা দেখছিলাম। বিলাসপুরে পৌঁছাবার পর থেকে পরশু পর্যন্ত এই জোর ক'রে খাওয়াবার ঝঞ্ঝাট জোটে নাই। নিরিবিলি আপনাকে নিয়ে আপনি থাকতাম। তিলে তিলে শুকিয়ে মরতে কতোখানি সয়ে মরতে হবে, তার কল্পনা করতাম। ধীরে ধীরে মনের পর্দার পরে পর্দা সরে গিয়ে কখন যে অন্য কল্পনা এসে পড়েছে, তা টেরও পাইনি। গভর্ণমেণ্ট যেন আমাদের দাবী মিটিয়ে দিয়েছে আমরা আবার খেতে স্থরু করেছি। সেই যে খেতে স্থরু করা, তার ভিতর যতোরকম লোভনীয় খাদ্য, যতোরকম যা কিছু পুষ্টিকর খাদ্য বলে জানতাম, তার ছবি যেন একটার পর একটা আসছে, যাচ্ছে। এটা নয়, ওটা; এরকম নয়, ওরকম। একরকম ফর্দ তৈরী করছি, মনঃপূত হচ্ছে না, অন্যরকম ফর্দ করছি।

ঝাঁ ক'রে মনটাকে একটা ঝাঁকানি দিতে গিয়ে দেখছি, এই যে ক্ষুধায় দুর্বলতা, এই ভাঙা দরজার পথে মনের যতো দৈন্য, যতো চাপা-পড়া ক্লেদ সব যেন ধরা দিচ্ছে।

নিজের অভিমানে জোর একটা ধাক্কা খেলাম। এই আমি? এই আমার সারা জীবনের সাধনা? কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং।

জীবনে যাদের ভালবেসেছি, জীবনে মহৎ যা-কিছুর স্বপ্ন দেখেছি, একে একে আবার তাদের মনের পর্দার উপর টেনে নিয়ে আসি। বলি, আজ আমি নিঃস্ব, নিঃসম্বল, নিরলম্ব। আজ আমার কোনো কাজ নেই, খাওয়াপরাও নেই, আজ আমার অবাধ ছুটি। আজ আমার জীবন ভরে তোমরাই শুধু থাক। তোমাদের সবাইকে নিয়ে যাকে পেয়েছি—সেই 'কেবল তুমি, কেবল তুমি।'

কিন্তু মানুষের মনটা যে একটা কতো বড় দুর্বার স্রোতে ভেসে চলে! কোনো খোঁটায় ওকে এক জায়গায় বেশী সময় বেঁধে রাখা চলে না। ছুটতে ছুটতে কোন্ এক অনবধান মুহূর্তে আবার এসে রক্ত-মাংসের খোঁটায় আটকে যায়।

এম্‌নি মুহূর্তে এল ডাক্তারের কথাটা: 'আপনি চেয়ারে বসে থাকবেন, আমরা নল চালিয়ে খাইয়ে যাব।' এত দিনের উপোসের পর দু'দিনের এই ধ্বস্তাধ্বস্তিতে শরীরের সব গিরোয় গিরোয় ব্যথা হয়েছে। গলা দিয়ে আজ সকালেও রক্ত পড়েছে, বুকে বেশ ব্যথা।

পরক্ষণেই মনে পড়লো, রবীন্দ্রনাথের কথাটা, উপস্থিত মতো মানুষ যা পারে, সেখানেই তার সীমা নয়। তা যদি হ'ত তা হলে যুগযুগান্তর ধরে মানুষ মৌমাছির মতো একই রকম মৌচাক তৈরী ক'রে চলতো।

যা পারি, তারই সীমার মধ্যে নিজেকে টেনে নামাবার এ চেষ্টা কেন? আমরা না জাতকে গড়ে তুলবার কাজে ব্রতী? মানুষের

শক্তিকে রবীন্দ্রনাথ দুটো ভাগে ভাগ করেছেন—এর একটার নাম 'পারে', আর একটার নাম 'পারবে'। 'পারে'র দিকটা মানুষের সহজ, 'পারবে'র দিকটায় তার তপস্যা।

এই 'পারবে'র দিকটা যখন সইতে পারি না, তখনই আমরা আদর্শকে বলি, আমি আর তোমার দিকে যাব না, তুমিই আমার দিকে নেমে এস। এখানেই খুলে গেল নরকের দ্বার।

শিউরে উঠি। মন স্থির হয়ে যায়।

পরদিন আবার সেই খাওয়াবার পালা। ঐ দু'দিন ধরেই গলা দিয়ে রক্ত পড়ছে। ডাক্তার দুবেলাই রক্ত দেখে যাচ্ছেন।

দুপুর বেলায় আবার সেই ত্রিশ পঁয়ত্রিশ জনের বাহিনী। সেদিন কাপড়টা ছিঁড়ে গিয়েছিল। আজ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ঘরে ঢুকে নিজে চশমা তুলে নিল, জমাদারকে বললো, কাপড় খুলে নিতে। নইলে, সরকারী পয়সায় কাপড় কিনে দিতে হবে তো!

অতগুলো লোকের সামনে ঐ উলঙ্গ অবস্থায় ধ্বস্তাধ্বস্তি করছি—যেন একটা বন্য জানোয়ার! পরে কতবার ভেবেছি, কি ক'রে পারতাম?

পুর্বদিনের সেই অভিনয়েরই পুনরভিনয় হ'ল। নলটা আজ প্রথমেই বেঁকিয়ে নিল। কিন্তু তবু রক্ত পড়তে কোনো বাধা হ'ল না। আজও যা খাওয়াল বমি ক'রে ফেললাম।

এইরকম খাওয়ান, বমি করা আর রক্ত-পড়া আরও তিন চারদিন চললো।

বুকের ব্যথাটা খুবই বাড়লো। তার পর আর একদিন যখন খাওয়াতে এল, কিসে কি বুদ্ধি জুটলো, জানি না। এদিন খাওয়াল মলদ্বার দিয়ে। নলটা যখন চালিয়ে দেয়, কি অসহ্য ব্যথা! যখন বের

করে নিল, আরও বেশী অসহ্য। সেইদিন থেকে যে রক্ত পড়তে সুরু হ'ল, তাতে অনেক বছর ভুগেছি। এই ঘা শুখোবার জন্যে পরে প্রায় এক বছর ধরে প্রতিদিন জোলাপ জাতীয় কিছু না কিছু খাইয়েছে। এখান থেকেই জীবনের সঙ্গী জুটলো কোষ্ঠবদ্ধতা।

ওরা সমস্ত অবস্থা সম্পর্কে টেলিগ্রাম করেছিল। এসে পড়লো মধ্যপ্রদেশের ইন্স্পেক্টার জেনারেল অব প্রিজন্স্, কর্ণেল বেন্স্‌লি।

আমায় বলে, আপনি কি মনে করেন, আপনি আত্মহত্যা করার ভয় দেখাবেন, আর গবর্ণমেণ্ট আপনাকে ছেড়ে দেবে, বা কোনো রকম সুযোগ সুবিধা দেবে?

আস্তে সুস্থে বলি, ওসব বচন হয়ে গেছে, আর নতুন কিছু বলবার আছে?

ও তখন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও অন্যান্যদের নিয়ে বারান্দার অপর পাশে গেল, বুঝলাম, জোর ক'রে খাওয়াবার নতুন কায়দাকানুন শেখাচ্ছে। লোকটি আইরিশ। শুনলাম, ওদেশে অনশনব্রতীদের খাওয়াবার কাজে হাত পাকিয়েছে।

ওদের যা উপদেশ দেবার দিয়ে আবার আমার কাছে ফিরে এল।

অতি নম্র ভাষায় সুরু করলো: কেন আপনি এই কষ্ট করছেন? আমার এই প্রদেশে আপনার আর যে সব বন্ধুরা এসেছেন, তাঁরা সবাই খেতে সুরু করেছেন। অন্যান্য প্রদেশেরও খবর আমি যা পেয়েছি, সবাই খাচ্ছেন, আপনিই শুধু কষ্ট পাচ্ছেন। আমার এই প্রদেশে আর যাঁরা আছেন, তাঁদের প্রত্যেককে আমি প্রতি সপ্তাহে দু'তিন ঝুড়ি ক'রে কমলালেবু পাঠাচ্ছি নাগপুর থেকে; কেউ কেউ জেলে মুরগি পুষছেন···ইত্যাদি।

চুপ ক'রে শুনলাম। বললে, আপনি খাবেন তা হলে?

বললাম, না।

কিছু সময় দাঁড়িয়ে কয়েদিদের খাওয়া দেখছিল। আই. জি. এসেছে ব'লে সেদিন কয়েদিদের পরিষ্কার চালের ভাত দিয়েছে, বেশ ঘন ডাল দিয়েছে, আলাদা একটা তরকারি দিয়েছে। অন্য দিন দেয় বেশ মোটা মোটা কালো ভাত, এক বেলা তরকারি, এক বেলা ডাল—ডাল মানে ডালের কালো জল, আর তরকারি মানে সর্ববিধ শুখনো পাতা সেদ্ধ—তার ভেতর কফির পাতার মধ্যে পেপের পাতা পর্যন্ত মিশে যায়। মাটি মেশানো কালো একরকম নুন দেয়, তা'তে ডাল তরকারিতে নুনের স্বাদ লাগে না।

সেদিনের খাবার দেখে কিন্তু আই. জি. বল্‌লে, এত ভাল খাবার দিও না—তা হলে ওরা বার বার জেলে আসবে। ডাল আর তরকারি দুটোই একবেলায় দিও না, বরং ডালের মধ্যে তরকারি সেদ্ধ দিয়ে দিও। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বল্‌লে, All right, sir—অন্য দিন যে কি করে, তা আর বল্‌লো না।

আই. জি.কে বিদায় ক'রে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আবার এল। সঙ্গে প্রতিদিনের সেই দলবল। কিন্তু ব্যবস্থা আজ ভিন্ন। বারান্দায় ঘরের একটা জানালার গায়ে একখানা লোহার খাট এনে ফেললো। রোজকার মতো চশমা ও ধুতি কেড়ে নেওয়া, ধ্বস্তাধ্বস্তি সবই হ'ল। তার পর, আমায় খাটের উপর নিয়ে ফেল্‌লো। সেখানে ঝটাপটিতে হাত পা অনেক জায়গায় কেটে ছিঁড়ে গেল। পরে পা দুটোকে গোঁড়ালির ও হাঁটুর উপরে লোহার পাতের সঙ্গে রশি দিয়ে বাঁধ্‌লো, বুকের কাছটা এবং কনুই ও হাতের কব্জিটা জানলার গরাদের সঙ্গে তেম্‌নি বেঁধে নিল। অন্যদিনের মতো মাথা ঘুরাবার ফিরাবারও আর

প্রায় উপায় রইলো না—জানালার দুটো শিকের মাঝখানে মাথাটা একজন অনায়াসে চেপে ধরে রইলো। আজ নল চালালো কিন্তু নাক দিয়ে। আজকের নলও অন্যরকমের—রবারের নরম সরু নল—অনায়াসে বুকের নীচে অবধি চলে গেল, বেশ টের পেলাম। তখন দুধ ঢাললো। আজ অনেকটা বেশী পরিমাণেই ঢালতে পারলো।

আমারও আজ বমি করতে বেগ কম পেতে হ'ল। রক্ত কিন্তু অন্য দিনের মতোই পড়লো—বোধ হয় ভিতরে কোথাও একটু ঘা হয়ে গিয়েছিল।

বিকেল বেলায় কয়েদীদের খাইয়ে দাইয়ে ঘরে বন্ধ করতে নিয়ে যাবার আগে আমার ঘরের সামনে ইয়ার্ডের ভিতর জোড়ায় জোড়ায় ফাইল ক'রে বসায়। সেখান থেকে গন্‌তি মিলিয়ে ওয়ার্ডে নিয়ে বন্ধ করে। আবার ভোর বেলায় ওয়ার্ড থেকে বের ক'রেও ঐভাবে ঐখানটায় বসায়। যেদিন থেকে আমায় বাঁধবার জন্যে ওরা কয়েদী নিয়ে আসতে সুরু করলো, সেই দিন থেকে সমস্ত কয়েদীরা রোজ সকাল সন্ধ্যায় ফাইলসুদ্ধ আমায় সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে। প্রণাম ক'রে উঠে বসে জোড়হাতে কি কাতর মিনতি জানায়।

সন্ধ্যাবেলা ওরা বন্ধ হতে যাবার পর আর সকালবেলা ঘর খুলে দিতেই আমি ইয়ার্ডের পেপে গাছগুলোর তলায় কাঁকরের উপর দিয়ে ধীরে ধীরে কিছু সময় পাইচারি করি।

আই. জি. বলে গেল, আর সবাই খেতে সুরু করেছেন। মনে মনে জানি, এরকম মিথ্যা কথা ওরা বলবেই। কিন্তু কে জানে? সবার খবর পাবারও তো উপায় নেই। চন্দ্রিকাপ্রসাদ রোজকার মতো ওয়ার্ডটা ঘুরে পেপে গাছতলায় এসে বললেন, Good morning.

আমি প্রতিনমস্কার জানালাম। অন্তদিন যা বলবার উনিই বলেন। আজ জিজ্ঞেস করলাম, আই. জি. যে বলে গেল, আর সবাই খেতে সুরু করেছে, আপনি কিছু খবর জানেন?

আমিও যতদূর শুনেছি, তা-ই সত্যি। সহরে বাঙালীরাও তা-ই বলেন। আমি সঠিক খবর নিয়ে আপনাকে বলব।

সবাই খেতে সুরু করেছে? কিন্তু কি করে সম্ভব হয়? একে একে সবার কথা মনে পড়ে। বয়স্ক যাঁরা, রুগ্ন যাঁরা—তাঁদের ব'লে দেওয়া অবিশ্যি আছে যে, তাঁরা যখন খুসি অনশন ছেড়ে দিতে পারেন। কিন্তু আর সবাই? সত্যেনদা, মনোরঞ্জনদা, সুরেশ দাস—এঁরাও সব ছেড়ে দিয়েছেন?

দিনরাত মনটার ভিতর তোলপাড় করতে থাকে। এ দেরও কারও কারও কথা আজ চুলচেরা বিশ্লেষণ করতে বসি···মনে পড়ে এই সেদিনের কথা। আলিপুর জেলে দু'একজনের সঙ্গে আমার মিশতে ভালো লাগতো না—আজ যাঁদের কথা বেশী ক'রে ভাবছি, তার ভিতর একজন বলতেন, না, মেশা প্রয়োজন।

একটা ছোট কথা। কিন্তু এর ভিতর যেন সেই ভবানী পাঠকের কথা—"দোকানদারী"—এর সংগতি দেখতে পাই। আমার পক্ষে যা প্রয়োজন, আমার সে সম্পর্কে আগ্রহ থাকবে না কেন? আবেগ থাকবে না কেন? আমার যাতে আগ্রহ নেই, আবেগ নেই, আমার পক্ষে তা প্রয়োজন কিসে? I do but sing because I must. মনে হ'ল, এঁরা জীবনে শ্রেয়ের সন্ধান করেছেন, প্রেয়কে তুচ্ছ করেছেন। শ্রেয়ের প্রেয়ের যোগ ঘটেনি এঁদের সবার জীবনে।

হয়তো অসম্ভব নয়—এঁরা আজ অনশন ছেড়ে দিয়েছেন। তবু কয়েকজনের কথা ভাবতে পারিনে।

চন্দ্রিকাপ্রসাদ দু'একদিন পরে বল্লেন, যতদূর খবর পেয়েছি, আপনাদের যে বন্ধু অমরাবতী জেলে আছেন, তাঁর উপবাস এখনও চল্ছে, আর সবাই ছেড়ে দিয়েছেন।

অমরাবতী জেলে ছিলেন সত্যেনদা।

বোধ হয় গলার আর বুকের ঘা শুখোবার সুযোগ দেবার জন্যই এর পর দিন দুই খাওয়াল আবার মলদ্বার দিয়ে—যদিও ডাক্তার রোজই রিপোর্ট দিয়ে যাচ্ছিল যে মলদ্বার দিয়েও রক্ত পড়ছে।

যাই হোক্, গলার বা বুকের ঘা বোধ হয় শুখিয়ে গেল—এর পর একদিন ক'রে নাক দিয়ে, একদিন ক'রে মুখ দিয়ে খাওয়ায়। রক্ত আর পড়ে না।

খাওয়ায়, আমিও রোজই বমি ক'রে ফেলে দিই। ওজন রোজই কমে—কোনোদিন এক পাউণ্ড, কোনোদিন আধ পাউণ্ড। ফলে দিনে দুইবার খাওয়াবার ব্যবস্থা করলো। সঙ্গে ডিম ভেঙ্গে মিশিয়ে দিতে লাগ্লো।

আবার আই. জি.র নির্দেশ এল, খাওয়াবার পর ঐ বাঁধা অবস্থাতে আধঘণ্টা রেখে দেবে, তাতে বমি করতে পারবে না। খুলে দেবার পর চেষ্টা করলেও বমির সঙ্গে বিশেষ কিছু পড়তো না; কিন্তু চেষ্টা প্রতিবারই করতাম।

একমাস হয়ে গেল। সঙ্গী নাই, সাথী নাই—একলা বসে থাকি, নয়তো পেপে গাছের তলা দিয়ে একলা একলা ঘুরি। ভোরে যখন খুলে দেয়, তখনও আকাশে তারা থাকে। আমার জীবনে বন্ধু, সহকর্মী যারা এসেছে গেছে, আজ তারাও যেন ঐ তারার দলের

মতোই কতো দূরে! এ জীবনের সম্পর্ক যেন তাদের সঙ্গে চুকে গেছে। এমনি চলতে চলতে একদিন এখানেই পড়ে যাব—সেই শেষ—আমার যারা আপনার ছিল, তাদের সাথেও সেই আমার শেষ।

কি-ই বা আসে যায়? ঐ অনন্ত কোটি গ্রহ নক্ষত্র—তার ভিতর আমার মতো কতো অনন্ত কোটি জীব! প্রতি মূহুর্তে, প্রতিদিন তাদের কতো জীব পড়ে যাচ্ছে, খসে যাচ্ছে, নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। কি আসছে যাচ্ছে—তাতে এই সৃষ্টির! আমার নিজের মৃত্যুটাকেই বা তাই এত বড়ো ক'রে দেখবার কি আছে? জন্মেছি যখন, চিরদিন বেঁচে থাকব না—তা হলে নিজেকেই বা সৃষ্টির কেন্দ্র ক'রে দেখ্ছি কেন? সলোমনের কথা, Vanity of vanities, all is vanity.

আমার সহকর্মী বন্ধুদের কথা ভাব্ছি—আমায় ছাড়া আজও তাদের দুনিয়া তো স্তব্ধ হয়ে যায়নি, সুখে দুঃখে চলে যাচ্ছেই। তারাও হয়তো এতদিনে ধরা পড়ে গেছে। কর্মক্ষেত্রে তারা নেই, তবু কর্মক্ষেত্র যেমন ক'রে হোক্ চলে যাচ্ছেই।

তবু ইচ্ছা হয় জানতে Alexander Selkirk-এর মতো—My friends, do they now or then send a wish or thought after me? হয়তো চিন্তা করে, হয়তো দুঃখ করে, হয়তো দুফোঁটা চোখের জলও ফেলে। সেই কল্পনাই আমার কাছে পরম তৃপ্তি বয়ে নিয়ে আসে।

কিন্তু এ তৃপ্তিরও তো আমার তরফ থেকে একটা মূল্য দেবার আছে! সে মূল্য আমার দেওয়া হয় যদি আজকের ব্রতে আমি সফল হই, না হয়তো যদি মরি। তারা দেবে তৃপ্তি, আমি দেব গৌরব। "আকাশ আমায় ভরলো আলোয়, আকাশ আমি ভরবো গানে।" মানুষ এম্‌নি করেই পরস্পরকে এগিয়ে নিয়ে যায়। নিজে নিঃশেষ

হয়, সৃষ্টি এগিয়ে চলে। এ না হলে সৃষ্টির আর কি অর্থ খুঁজে পাওয়া যায়?

পঁয়তাল্লিশ দিন হয়ে গেল উপবাসের। বাবা এলেন দেখা করতে। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ভোরের দিকে এসে জানিয়ে গেল। তার পরই বাবাকে সাথে নিয়ে জেলার ভিতরে এল। আমি তখন শুয়ে ছিলাম। আমার চেহারা দেখে, গায়ে কাটাছেঁড়ার দাগ দেখে বাবা হু হু ক'রে কেঁদে উঠ্‌লেন।

বল্‌লেন, ষ্টীফেনসন টেলিগ্রাম ক'রে কলকাতায় আসতে বলেছিল, সেক্রেটারিয়েটে দেখা করতে বলেছিল। সেখানে খুব ভদ্র ব্যবহার করেছে, পথ খরচার টাকা দিয়ে বলেছে, যান, আপনার ছেলেকে খাইয়ে আসুন, আর সবাই খেতে সুরু করেছে, আপনার ছেলে মিছিমিছি কষ্ট পাচ্ছেন।

রাতের রেলায় ষ্টেশনে পৌঁচেছেন। একজন বাঙ্গালী রেল কর্ম্মচারী তাঁকে নিয়ে যান বাঙালীদের একটা মেসে—তাঁরা সেখানে আলোচনা ক'রে ওখানকার একজন ব্যারিষ্টার নগেন্দ্রনাথ দে—তাঁর বাসায় তুলে দিয়েছেন। তিনি খুব যত্ন করছেন। তিনিই জেল পর্য্যন্ত নিয়ে এসেছেন, কিন্তু দেখা করার অনুমতি নেই ব'লে তাঁকে অফিসে বসিয়ে রেখেছে।

জেলার কিছু সময় কাছে দাঁড়িয়ে দেখলো, আমরা বাংলায় কথা বলি, কাছে থেকে কিছু লাভ নেই, আমি তাকে বসতেও বললাম না, তখন বারান্দায় গিয়ে বসে রইলো। কিছু সময় বাদে অফিসে চলে গেল।

বাবা কাঁদতে কাঁদতে গায়ে হাত বুলোতে লাগলেন। গায়ের দাগগুলো দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, মারধোর করে কি না। আমি

বল্‌লাম, না। যা যা ব'লে সান্ত্বনা দেওয়া চলে, বলতে চেষ্টা করলাম।

সকালে প্রায় বারোটা পর্যন্ত রইলেন। আবার তুটোয় এলেন, প্রায় সন্ধ্যা পর্যন্ত রইলেন। পরের দিনও ঐ রকম। ও তুদিন সুপারিন্টেণ্ডেণ্টও আর খাওয়াবার চেষ্টা করলো না। ঐ কুরুক্ষেত্র কাণ্ড বাদ দিতে পারলে কে আর করে? তা ছাড়া, বাবা ওখানে থাকতে থাকতে গায়ে আর তাজা ঘা-ও হয়তো দেখাতে চায়নি। হয়তো আশা করেছে, এইবারে আমি খাব।

বাবা অনেক ক'রে বুঝাতে চেষ্টা করলেন। অনেক কাহিনী বললেন। তুঃখ কষ্ট কি, জীবনে কখনও জানেন নাই। এখন অবস্থা ভাঙ্গছে। মা প্রায়ই অসুস্থ থাকেন, চোখে ভাল দেখতে পান না, চোখ দিয়ে অনবরত জল পড়ে। আমার উপরেই সব আশা ভরসা।

তাঁর তরফ থেকে একই সব কথার পুনরাবৃত্তি, অনুরোধ, অনুনয়, চোখের জল। আমিও শেষ পর্যন্ত একটি কথারই পুনরাবৃত্তি করতে রইলাম। আমরণ উপোষ করব যদি না আমাদের দাবী মেটানো হয়—এই সংকল্প আমরা দেশের নেতৃস্থানীয়দের জানিয়েছি, সেই নেতৃস্থানীয়রা যদি বলেন, তা হলেই শুধু খেতে পারি। তাঁদের সবার সঙ্গে বাবার দেখা করা সম্ভব নয়। চার জনের নাম ব'লে দিলাম—সি. আর. দাস, মতিলাল ঘোষ, রামানন্দ চাটাজি ও হীরেন দত্ত। এঁদের সৎলোক বলে জানতাম, সহানুভূতিও এদের কাছে পাবেন, জানতাম। প্রেসিডেন্সি কলেজে ওটেন প্রহারের ব্যাপারে শেষোক্ত তুইজনের মতামতও জানতাম। হীরেনবাবু তো বেশ খুসিই হয়েছিলেন।

বাবাকে বলে দিলাম, এঁরা যদি খেতে বলেন, টেলিগ্রাম করবেন। আমার নিজের মনে ছিল, এঁরা তো খেতে বলবেনই, কিন্তু তখনও মন স্থির করবার কাজ আমার নিজের। বাবা বুঝলেন, এটা একটা

স্তোকবাক্য মাত্র। দ্বিতীয় দিনে নগেনবাবুর সঙ্গে দেখা করবার জন্যে সুপারিন্টেণ্ডেন্ট আমায় অফিসে নিয়ে গেল, দুজনে ধরে সাহায্য করলো। অফিসে নগেনবাবুর সঙ্গে সেই অ্যাসিস্ট্যাণ্ট কমিশনার এস. পি. সান্যালও বসে ছিলেন—সুপারিন্টেণ্ডেন্ট ইচ্ছা করেই তাঁকে রেখেছিল, আমাদের বাংলা কথা বুঝবার জন্যে,—পাছে গোপন কিছু ব'লে দিই। গোপন বলবার আমার কি থাকতে পারে, অফিসারদের পক্ষে সে কথা ভাববার নিয়ম নেই।

নগেনবাবুও খাবার জন্যে অনেক অনুরোধ করলেন, বললেন, ভূপেন বোস মশায় তাঁর আত্মীয়—তিনি তাঁকে লিখবেন যেন মণ্টেগুকে সব জানান। আমার কাছে গোপন কথা নগেনবাবু একটা বললেন: আমাদের অনশন নিয়ে বাইরে খুব আন্দোলন হয়েছে, এমনকি, মিসেস্ অ্যানি বেশান্ত তাঁর কংগ্রেস সভাপতির বক্তৃতায় অনশনের উল্লেখ ক'রে ষ্টেট প্রিজনারদের প্রতি ব্যবহারের তীব্র নিন্দা করেছেন। মিঃ সান্যাল এসব কথায় একটুও বাধা দিলেন না। সুপারিন্টেণ্ডেন্ট অনুপস্থিত থাকলে তিনি মাঝে মাঝে তাঁর জায়গায় কাজ করেন। তিনি আমার সব কথাই জানেন। খেতে অনুরোধ করার ভিতরও আজ তিনি যোগ দিলেন না।

বাবা কলকাতায় যেয়ে শুধু চারজন নয়, আরও অনেক নেতৃস্থানীয়দের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। সবার কাছেই সহানুভূতি পেয়েছিলেন, সবাই খেতে অনুরোধ করতে বলেছিলেন। শুধু রামানন্দবাবু বলেছিলেন, বাইরে থেকে এভাবে অনুরোধ জানান আমাদের পক্ষে ঠিক হবে না।

বাবার টেলিগ্রাম পেলাম, সবাই তোমায় খেতে বলছেন। তুমি খেয়ে আমায় টেলিগ্রাম করবে।

ততদিনে আমার অবস্থার অন্ত রকম পরিণতি সুরু হয়েছে। একার দিন যেদিন হল, সেইদিন রাত থেকে অনিদ্রা সুরু হ'ল। মাঝে মাঝে দু'চার মিনিটের তন্দ্রা ছাড়া ঘুম হ'ত না। বিলাসপুরের প্রচণ্ড শীত, সেলে ঠাণ্ডা আরও বেশী। ওরা গায়ে দেবার জন্তে একখানি রেজাই কিনে দিয়েছিল। ঐ অবস্থায় থেকে ওদের কাছে কিছু চাইতে ইচ্ছা হ'ত না। অনিদ্রায় হোক্, শীতে হোক্, দুর্বল ক'রে ফেলছিল। চুয়ার দিনের দিন এক দিনে দু'পাউণ্ড ওজন কম্‌লো। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, ডাক্তারকে বল্‌লো, শুধু দুধ আর ডিম নয়, কাল থেকে কাঞ্জি তৈরী করিয়ে রাখবে। কাঞ্জি মানে প্রচুর জলে খুদ সিদ্ধ করা। আর তার সঙ্গে সামান্ত পরিমাণ rum দেবে। Rum এক রকম মদ।

দুধে, ডিমে, কাঞ্জিতে পরিমাণটা সেদিন বেশ ভারি হয়ে পড়লো। কিন্তু খাইয়ে যেমন নল বের করেছে, সঙ্গে সঙ্গে আপনা আপনি সবটা বমি হয়ে গেল। চেষ্টা একেবারেই করতে হ'ল না। চেষ্টা করার সুযোগও হ'ল না, হাত-পা বাঁধা অবস্থাতে বমি হ'ল। বমির সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে পিত্তও পড়লো। আজ আর বমি যেন থামতে চাইছে না। হায়রান হয়ে পড়লাম। দেখে শুনে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বাঁধন খুলে দিতে বললো। সেদিন আর দুবেলা খাওয়ালো না।

একটু বাদে ডাক্তার ঘুরে এসে বললেন, আমি বেকুফটাকে বলেছিলাম, পরিমাণে এতটা আপনার পেটের বর্তমান অবস্থায় সইবে না; ও আমার কথা শুনলো না।

এখন এত দুর্বল বোধ হতে লাগলো যে আর ধ্বস্তাধ্বস্তি করিনে। ডেক্ চেয়ারে বসে থাকি, ওরা নল চালায়, একবেলা অল্প পরিমাণে দুধ খাওয়ায়। কিন্তু যা খাওয়ায় তা-ই বমি হয়ে যায়, বরং পিত্ত মিশে পরিমাণ অনেক বেড়ে যায়। এক একবার বমির পর একেবারে অবসন্ন হয়ে পড়ি।

এখন আর বেড়াতে পারিনে। শুয়ে বসে স্বপ্ন দেখি—একক ধূমকেতু একটি যেন এক অজানা অক্ষপথে আপন গতিবেগে ছুটে চলেছে, গতির বেগে অণুপরমাণু তার পথে পথে ছড়িয়ে পড়ে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে।

কোথায় চলেছি, কি হবে, ভাবতে পারি-ও না, ভাবতে চাই-ও না।

প্রায় সময় ঘরে খাটে শুয়ে থাকি, কখনও বারান্দায় ডেক চেয়ারে এসে বসি। কোনোগতিকে স্নানের জায়গাটায় একবার যাই। স্নান না ক'রে পারিনে।

অন্যদিকে কিন্তু সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের খেয়াল ছিল। দাড়ি গজিয়ে বনমানুষের মতো চেহারা হয়েছিল। সুপারিণ্টেণ্ডের হুকুমে রোজ বাইরে থেকে একটা নাপিত আসতো। সে তার বাঁশের হাতলওয়ালা ক্ষুর দিয়ে ওলটপালট করে আধঘণ্টা তিন কোয়ার্টার ধরে কামাতো। কিন্তু পয়সা আদায় করতে বেচারির জেলের দরজায় সকালবেলাটা ধন্না দিয়ে থাকতে হত। ওর বারণ সত্ত্বেও একদিন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে বল্‌লাম, এরকম যদি কর তো, আর আমি কামাব না। পরদিন থেকে গেটের সিপাই-ই নাপিতের পয়সা যখনকার তখন দিয়ে দিত।

এইবারে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হুকুম দিল, খাদ্যের মারফত পুষ্টিকর যখন কিছু পাচ্ছেন না, তখন অন্যভাবে চেষ্টা করতে হবে, রোজ অন্ততঃ একঘণ্টা ক'রে সমস্ত গায়ে আস্তে আস্তে তেল মালিশ ক'রে দেবে।

আমায় জিজ্ঞেস করলো, আপনি কি তেল মাখতে অভ্যস্ত?

সরষের তেল।

সরষের তেল এখানে বড় গরম হবে। ডাক্তারকে বললে, আর্ধেক সরষের আর্ধেক তিলের তেল মিশিয়ে এই কয়েদীটিকে দিয়ে এক ঘণ্টা দেড় ঘণ্টা ধরে মালিশ করাবেন।

তা-ই চল্‌লো। কিন্তু দুর্বলতাও আর কাটলো না, বমিও বন্ধ হ'ল না।

চন্দ্রিকাপ্রসাদ এসে বলেন, অমরাবতীতে মিঃ সেন এখনও উপোস করছেন। বাঙালীরা বলছেন, তাঁরা সব জায়গা থেকে খবর নিয়েছেন, আর সবাই খেতে সুরু করেছেন। আপনাকে তাঁরা খেতে বলছেন।

জেলের সিপাই কয়েদী, আমার ঘর দেখা যায়, এমন জায়গা দিয়ে যে যায়, সেই দূর থেকে প্রণাম করে। একটি কয়েদী কালা-পাগ্‌ড়ি ছিল—জেলের মাঝখানে সব দিকের ইয়ার্ডে ঢুকবার গেট সে খোলে, বন্ধ করে—নাম শেখ গটু। আমি একদিন দুপুরে বারান্দায় ডেক চেয়ারে বসে আছি। তখন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, জেলার, জমাদার কারও ভিতরে আসবার সম্ভাবনা নেই। সে চাবি এক সিপাইর হাতে দিয়ে ছুটে আমার কাছে এল। আমার পা জড়িয়ে ধরে কেঁদে বল্‌তে লাগলো, দাদা, তুমি খাও।

আমি পা ছাড়িয়ে নিয়ে তার মাথাটা বুকের ভিতর টেনে নিয়ে মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বললাম, সে হয় না।

তার সে পাগলের মতো কান্না আর থামে না, তাকে কিছুতে বুঝানো যায় না।

সে সুবিধা পেলে প্রায় রোজই আসে, আমায় দাদা ব'লে ডাকে, আর ঐরকম কাঁদে। ছেলে মানুষ, অত্যন্ত গরীব, লেখাপড়া খুব সামান্য জানে। চেহারায় সৌন্দর্য নেই, কিন্তু এই যে দরদভরা মনটা, তার ছাপ মুখে মাখানো। সামান্য অপরাধ—তারই জন্য জেল দিয়েছে এক বছরের। ওর সাথে আলাপে মনটা তৃপ্তিতে ভরে যায়।

জেলারের এক ভাগ্নে তার বাড়ীতে থেকে পড়ে। স্কুলের বাঙালী ছেলেরা ধরেছে, আমার সাথে দেখা করিয়ে দিতে হবে। দুপুর বেলায়

এক এক দিন তিন চার জন ক'রে নিয়ে আসে। গেটের সিপাইও বাধা দেয় না, শেখ গটুতো দেয়ই না। অনেকের সাথে একে একে আলাপ হয়। ওরা বলে, আমার অবস্থা দুচার দিন পর পরই অমৃতবাজার পত্রিকায় বের হয়। ওখানকার বাঙালীরা পাঠান।

একদিন আমার ওজন তিন পাউণ্ড কমে গেল। তার দু'দিন বাদে মধ্য প্রদেশের I. G. C. H. (ইন্‌স্পেক্টার জেনারেল অফ সিভিল হস্‌পিটাল্‌স্) এল। মুরুব্বিচালে দু'চারটে কথা জিজ্ঞেস করলো। দু'এক কথার জবাব দিয়ে আমি চুপ ক'রে রইলাম। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে বল্‌লো, হয়তো আবার নলদ্বার দিয়ে খাওয়াবার প্রয়োজন হবে।

আরও দু'দিন বাদে। সেটা বোধ হয় উপবাসের সাতষট্টি দিন। চন্দ্রিকাপ্রসাদ ভোরে এসে বললেন, আজ চীফ কমিশনার আসছেন। তখনও পর্যন্ত মধ্যপ্রদেশ চীফ কমিশনারের প্রদেশ।

আরও বললেন, অমরাবতীতে মিঃ সেন উপবাসে মৃত্যু হয় না দেখে একষট্টি দিনের দিন গলায় দড়ি দিয়ে মরতে চেষ্টা করেছিলেন। রশিতে একখানা গীতা, একখানা চণ্ডী বাঁধা ছিল। তাতে আটকে গিয়ে দম বন্ধ হতে দেরী হয়েছে ইতিমধ্যে তাঁকে খুলে নামিয়েছে। আত্মহত্যার চেষ্টা করার জন্ত সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট তাঁর নামে মামলা করার অনুমতি চেয়েছেন। আই. জি. ফাইল চীফকমিশনারের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। সেই ফাইল এখানে এসে গেছে।

চীফ কমিশনার এল না, এল তার চীফ সেক্রেটারী। এসে বল্‌লো, ওয়ার্ধাতে একটা বিদ্রোহ মতো লেগে গেছে, তাঁকে সেখানে যেতে হ'ল। আমাকে আপনার এখানে পাঠিয়েছেন, আপনাকে খেতেই হবে।

আমার নতুন ক'রে আর কিছু বলবার ছিল না। চীফ সেক্রেটারী চার দিন ওখানে রয়ে গেল—রোজ সকাল বিকাল আমায় দেখতে আসে, খেতে অনুরোধ করে।

ইতিমধ্যে চীফ কমিশনারের সঙ্গে যোগাযোগ ক'রে সত্যেনদার সম্বন্ধে জবাব পাঠালো—জেলে কি ক'রে তাঁর পক্ষে আত্মহত্যার চেষ্টা করা সম্ভব হ'ল? এর জন্য দায়ী জেলের আইন শৃঙ্খলা। ষ্টেট প্রিজনারের নামে এর জন্য মামলা চলতে পারে না। ষ্টেট প্রিজনারকে বন্দী ক'রে রাখার ওয়ারেণ্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের উপর। ষ্টেট প্রিজনার যদি পালায়, তা হলে তার জন্যেও মামলা হবে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নামে।

খবরটি চন্দ্রিকাপ্রসাদ ব'লে গেলেন। আরও ব'লে গেলেন, ঐ দিন থেকে সত্যেনদা খেতে সুরু করেছেন।

শেষ দিন চীফ্ সেক্রেটারী এসে বল্‌লো, আর তো আমি থাকতে পারছিনে। আপনি খেলেন না, আমিই বা আর কি করতে পারি? আমি তো ডাক্তারও নই। আমি ফিরে গিয়ে বরং কর্ণেল বেন্‌স্‌লিকে পাঠিয়ে দেব।

কর্ণেল বেন্‌স্‌লি এলেন বাহাত্তর দিনের দিন। খাওয়ান বন্ধ ক'রে দিলেন। তিন দিন ধরে পেটের ভিতর নল চালিয়ে দিয়ে কি একটা ঔষধ দিয়ে পাকস্থলীকে ধুয়ে নিলেন। পঁচাত্তর দিনের দিন একটা ফিডিং কাপে ক'রে দুধ নিয়ে এলেন। কর্ণেল বেন্‌স্‌লির প্রথম বারের সে চেহারা আর নেই। আমার ডেক চেয়ারের পাশে একটা চেয়ারে বসে আমার মাথাটা কোলের উপর টেনে নিয়ে বললেন, আপনাকে মরতে কিছুতেই দেব না। **We'll make you live at least for your parents' sake.** এই ব'লে ফিডিং কাপের নলটা আমার

মুখের ভিতর চেপে দিতে চেষ্টা করতে লাগলেন। আমি দাঁত চেপে মুখ বুজে রইলাম।

খাওয়াতে না পেরে হতাশ মুখে চলে গেলেন। সন্ধ্যার দিকে আবার এলেন—হাতে একখানা টেলিগ্রাম। "আমার যা করবার করেছি। এখন আমার **conscience clear.** আর তো আমি কোনো কাজেও লাগব না। আজ আমি চলে যাচ্ছি, আশা করি, আপনার মঙ্গল হবে।"

সেই রাত্রি থেকে আর আমায় সেলে থাকতে হয়নি। তবে ঘুম তো আমায় তখন ছেড়েই গেছে।

পরদিন ভোরে চন্দ্রিকাপ্রসাদ বললেন, আই. জি. এখানে এসেই ভারত গভর্ণমেণ্টকে টেলিগ্রাম করেছিলেন, আপনি এখন খেতে আরম্ভ করলেও আপনার বাঁচবার সম্ভাবনা নেই। কাল সেই টেলিগ্রামের জবাব এসেছে আপনার **dying body** আপনার বাপমাকে দিয়ে দিতে।

বোধ হয়, ঐ মর্মে টেলিগ্রাম বাবার কাছেও গিয়েছিল। তিনি কাঁদতে কাঁদতে রওনা হলেন। বাড়ী থেকে প্রায় তিন মাইল দূরে ষ্টিমার ঘাট। শেষ রাত্রে ষ্টিমার ছাড়ে। শীতের রাত। যখন ঘাটে পৌঁছেছেন, তখন সিঁড়ি টানতে সুরু করেছে, তাড়াতাড়িতে উঠতে গিয়ে জলে পড়ে গেলেন। চাকর এবং অন্যান্য লোকের সাহায্যে উঠলেন। আবার সারাপথ কাঁদতে কাঁদতে বাড়ী ফিরে এলেন। এসে অসুখে পড়লেন। মা-ও তখন খাওয়া দাওয়া ছেড়ে দিয়েছেন।

১৪ই ফেব্রুয়ারী। উপবাসের ছিয়াত্তর দিন। বিকেলে খুব একটা ধূলিঝড় হয়ে গেল। সেইদিনই ওখানকার শীত কেটে গিয়ে গরম পড়ে গেল।

ডাক্তার মোডি আজ খুব গম্ভীর। দুইবার অল্প অল্প পরিমাণ দুধ খাইয়ে গেলেন—আগের মতোই নল চালিয়ে। পরদিন খুব সকালে এলেন, তখন তাঁর চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছে। বল্লেন, "আপনার জন্যে কয়েকখানা কাগজ এনেছি, আর একটা পেন্সিল। আপনার যাকে যাকে প্রয়োজন, চিঠি লিখুন। যেখানে গিয়ে বলেন, আমি চিঠি দিয়ে আসব।"

"আমি আপনার কাছে খুব কৃতজ্ঞ। কিন্তু কাকে আমি চিঠি লিখব ? কি আর আমার লিখবার আছে ?

"আপনি যাকে খুসি লিখুন। আপনি বাঁচবেন না। শেষকালে এতটুকু কাজ আপনার ক'রে দিতে পারলে নিজেকে ধন্য মনে করব। কাগজগুলো আমি বাক্সে রেখে যাচ্ছি।"

আমি চাকরটাকে দেখিয়ে বললাম, "ওর সাম্‌নে রাখ্‌বেন না।" অত্যন্ত নীরেট রকমের এই মারাঠী চাকরটাকে আমি বিশ্বাস করতাম না।

কিন্তু ডাক্তার তখন বেপরোয়া। মুখের ভঙ্গিতে জানিয়ে দিলেন, বয়ে গেছে।

ডাক্তার চলে যাবার পর চাকরটা রোজকার মতো কুঁজোয় জল ভরতে গেল। ফিরে আসবার পর বোধ হয় দুমিনিটও কাটে নাই, জেলার এসে উপস্থিত, পেছনে বড় জমাদার।

একটি কথাও না ব'লে জেলার আমার খোলা ট্রাঙ্কটা খুলে ফেল্‌লো। বাক্স থেকে কাগজ কয়খানা ও পেন্সিলটা নিয়ে বাক্স বন্ধ ক'রে চলে গেল।

আমার ভিতর ঝড় বইতে সুরু করলো। সুপারিন্টেণ্ডেন্ট এল সেদিন দুপুরের পরে। কিসে কি হয়ে গেল, কিছুই বুঝতে পারলাম

না—হঠাৎ ডেক চেয়ার ছেড়ে উঠে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে কাঁধে হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে বললাম, "ডাক্তারকে আপনার ছেড়ে দিতে হবে।"

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বলে, "হ্যাঁ, ছেড়ে দেব, আপনি খেতে সুরু করুন।"

কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে সে জেলার এবং অ্যাসিষ্টাণ্ট জেলার চন্দ্রিকাপ্রসাদের দিকে একবার তাকালো। তাকাবার ভঙ্গিটায় আমার চমক লাগলো। চন্দ্রিকাপ্রসাদের মুখে একটা অস্বাভাবিক রকমের করুণ হাসি।

মুহূর্তে আমার জ্ঞান হ'ল, আমি কি করছি। ধপ্ ক'রে এসে আবার চেয়ারটায় বসে পড়লাম।

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আবার বললো, "বলুন, আপনি খাবেন, আমি ডাক্তারকে ছেড়ে দেব।"

আমি মুখ ফিরিয়ে নিলাম। ওরা চলে গেল।

তখন থেকে সমস্ত রাতটা ধরে ঐ একটা কথাই কেবল মনে হতে লাগলো, আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি? মরতে পারলাম না, শেষকালে পাগল হয়ে আমায় বেঁচে থাকতে হবে?

আমার উপকার করতে গিয়ে ডাক্তার বেচারির সর্বনাশ হবে? ঘুম তো অম্‌নিতেই হ'ত না, সমস্ত রাতটা ছট্‌ফট্ ক'রে কাট্‌লো।

১৬ ফেব্রুয়ারী। উপোসের আজ আটাত্তর দিন।

ভোর বেলায় চন্দ্রিকাপ্রসাদ এলেন। Good morning ব'লে বললেন, "ভালো খবর আছে।" বলে কিন্তু আর দাঁড়ালেন না। এ তো চন্দ্রিকাপ্রসাদের পক্ষে অস্বাভাবিক! মনে হ'ল, দুটো কারণ হতে পারে।

এক, ডাক্তারের ব্যাপারে হয়তো চন্দ্রিকাপ্রসাদ ভয় পেয়ে গেছেন। পাছে বেশী সময় ধরে কথা বললে সিপাই জমাদার রিপোর্ট ক'রে দেয়।

আর, কাল যে রকম পাগলের মতো ব্যবহার করেছি, তা'তে যদি বা সুপারিন্টেণ্ডের কাছে কিছু ব'লে বসি।

ঐ দুই দুর্ভাবনা নিয়ে কাটাচ্ছি। সঙ্গে সঙ্গে মনে হতে লাগলো চন্দ্রিকাপ্রসাদের কথা—সুখবর আছে। সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সকাল সকালই এল। আজও কালকের মতো ডাক্তার সঙ্গে নেই। বললে, "গভর্ণমেণ্ট আপনাকে জানাতে বলেছে, গভর্ণমেণ্ট দুটো কমিটি করেছে—বিশিষ্ট জজ ও বেসরকারী লোকদের নিয়ে। একটা তদন্ত করবে আপনারা কোনো ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন কি না, তাই নিয়ে। আর একটা আপনাদের অনেকের বিরুদ্ধে যা চার্জ—তাই নিয়ে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বিবেচনা করবে। যাঁদের বিরুদ্ধে চার্জ প্রমাণ হবে না, তাঁদের ছেড়ে দেওয়া হবে।"

এই দুইটি কমিটিই, পরে জানলাম, রাওলাট কমিটি ও বীচক্রফ্‌ট্-চন্দ্রভারকর কমিটি।

সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট আরও বললেন, "গবর্ণমেণ্ট আপনাকে জানাতে বলেন নাই, তবু আপনাকে জানাচ্ছি—ষ্টেট্ প্রিজনারদের প্রতি আরও ভালো ব্যবহারের জন্য গবর্ণমেণ্ট নতুন সব আইন কানুন তৈরী করেছেন। আমাকেও তার নকল পাঠানো হবে।

"এখন বলুন আপনি খাবেন।"

ভেবে দেখলাম, আর আমার সময় নেওয়া উচিত হবে না। প্রথমতঃ পাগল হওয়া থেকে বাঁচতে হবে, দ্বিতীয়তঃ যদি সম্ভব হয়, ডাক্তারকে বাঁচাতে হবে।

তাছাড়া, আর সবাই যে অনশন ছেড়ে দিয়েছেন, সে বিষয়ে এখন আর সন্দেহ নেই। আর, আমরা যা চেয়েছিলাম, সবাই ছেড়ে দেবার পরে, এর চেয়ে ভালভাবে সে দাবী মিটবার আশা করা চলে না।

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে বললাম, "খাব, কিন্তু একটা সর্তে। আপনার মর্যাদাবোধের উপর ছেড়ে দিচ্ছি, কিন্তু একটা কথা দিতে হবে।"

"কি ?"

"ডাক্তারকে কোনো শাস্তি দেবেন না।"

"না, দেব না।"

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হাসপাতালে সুপ তৈরী করার আদেশ দিয়ে চলে গেল।

জেলখানার সাধারণ অবস্থা যাঁরা জানেন না, বিশেষতঃ ১৮১৮ সালের ৩নং রেগুলেশনের রাজবন্দীদের সম্পর্কে কর্তৃপক্ষের সতর্কদৃষ্টির সম্বন্ধে যাঁদের ধারণা নেই, তাঁদের মনে হবে, ডাক্তার মোডি দিয়ে তো গেলেন মাত্র কয়েকখানা সাদা কাগজ আর পেন্সিল, তা নিয়ে আমি অত অস্থির হয়ে উঠলাম কেন। কি-ই বা ডাঃ মোডির ওতে হত ?

চিঠির কাগজ ইত্যাদি জেলের আইনে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের বিনা অনুমতিতে ভিতরে ঢুকতে পায় না। তারপর, ষ্টেট প্রিজনারদের কোনো চিঠি বাইরে যাবে, সে তো কল্পনার অতীত। একজন ষ্টেট প্রিজনারকে ঔষধ খাবার জন্য এক তোলা চিনি দেবে, এই রকম সরকারী হুকুমনামার উপরও অঙ্কিত থাকবে "Confidential" বা "গোপনীয়।"

কিন্তু অস্থির হয়েও ডাঃ মোডিকে বাঁচাতে পারলাম না। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ডাঃ পরঞ্জপে তার কথা রাখলো না। এই মহারাষ্ট্র ব্রাহ্মণ আর মারাঠা জেলার বেঙ্কট রাও দুইজনই স্বাধীনচেতা পার্শী ডাঃ মোডিকে ঘৃণার চোখে দেখতো। এখন এমন সুযোগ ছাড়লো না। সেই দিনই হুকুম হ'ল, নর্সিংগড় জেলায় তখন প্লেগ লেগেছে—ডাঃ মোডিকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সেখানে ডিউটির জন্য রওনা হতে হবে।

যতদূর খবর নিতে পেরেছিলাম, তা'তে জেনেছিলাম গভর্ণমেণ্টের কাছে রিপোর্ট দিয়ে অন্য কোনো শাস্তি দেওয়ায় নাই। সদর হাসপাতাল থেকে আর একজন ডাক্তার জেলের কাজ পেল।

ডাঃ মোডি অত্যন্ত হীনতা স্বীকার করেও চেষ্টা করেছিলেন যাওয়ার আগে আর একবার আমার সঙ্গে দেখা করতে। গেটের সিপাই দুঃখিত, নম্রভাবে তাঁকে জানিয়ে দেয়, আসতে দিতে পারে না, জেলার সাহেবের হুকুম নেই। ডাঃ মোডির সাথে আর জীবনে আমার দেখা হয় নাই। ডাঃ মোডি, শেখ গটু, চন্দ্রিকাপ্রসাদ—আমার সেই হাঙ্গার স্ট্রাইকের জীবনের হয়ে রয়েছেন যেন ছোট ছোট কয়েকটি তারা আর ফুল :

অন্যমনে চলি পথে
ভুলিনে কি ফুল, ভুলিনে কি তারা,
তবুও তাহারা
প্রাণের নিঃশ্বাস বায়ু করে সুমধুর,
ভুলের শূন্যতা মাঝে ভরি দেয় সুর।

আলিপুর জেলে যেদিন হাঙ্গার স্ট্রাইক সুরু করি, সেইদিন বা তার আগের দিন ওজন নিয়েছিল। তখন ছিল ১৫১ পাউণ্ড। ইদানীং রোজই ওজন নিত, আজ হাঙ্গার স্ট্রাইকের শেষ দিনেও নিল, দাঁড়ালো ৮৯ পাউণ্ড।

একটু বেলায় সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আবার এল। এসে বল্‌লো, এত দিনের উপোস, এর পর অন্ততঃ ১৫ দিন আপনাকে আমি শক্ত জিনিস কিছু খেতে দেব না; দুধ, সুপ, ফলের রস—আপনাকে এই সব খেয়েই কাটাতে হবে।

তার জন্যে মন খারাপ হয় নাই। মনে এক দিকে ছিল ডাক্তারের চিন্তা। অপর দিকে, তখন বেলা বেড়ে উঠেছে—মাথার ভিতর কি রকম আগের দিনের মতোই একটা অস্থিরতা দেখা দিয়েছে—ইচ্ছা হচ্ছে যেন অস্বাভাবিক একটা কিছু করে বসি। ঐ ভয়টা পেয়ে বসলো, বুঝি পাগল হয়ে যাচ্ছি। মনে হ'ল, চেপে যাওয়া ঠিক হবে না। সুপারিন্টেণ্ডেণ্টকে বললাম।

সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট হুকুম দিল, পেছন দিকে চারিদিক খোলা আর একটা ছোট ঘরে আমায় নিয়ে যেতে, সেই ঘরের সব দরজা জানালায় খস্‌খসের পর্দা করে দিতে, একটা ডুস দিতে, আর একশিশি কেশরঞ্জন তেল আনিয়ে দিতে। আমায় বললে, দুপুরে যেমন স্নান করেন, রোজ ভালো করে স্নান করবেন, তাছাড়া সন্ধ্যার আগে গরম জলে আর একবার স্নান করবেন।

পরের দিনও উদ্বেগটা অনুভব করলাম। নিজেকে যথাসম্ভব সংযত করে রাখতাম। খস্‌খসের পর্দা তৈরী হয়ে এল। ৮টা ৮৷৷টা থেকে সেগুলো ভিজিয়ে দিত। তখন থেকে আর বেলা ৪টা ৫টা পর্যন্ত ঘর থেকে বের হ'তাম না। উদ্বেগও কমে গেল। দুধ, সুপ—এই সব খেয়ে কেটে যেত।

আই. জি. নাগপুর থেকে সপ্তাহে দু'তিন দিন ক'রে এক এক ঝুড়ি কমলালেবু পাঠিয়ে দিত। সাত দিনের দিন থেকে খুব পাতলা দু'এক-খানা টোষ্ট সুপের সঙ্গে দিত।

দশ দিনের দিন বাবা আবার এলেন। কলকাতা এসে ষ্টীফেনসনের কাছে জেনেছেন, আমি খেতে সুরু করেছি। ষ্টীফেনসন বলেছে, আপনি তবু যান, দেখা ক'রে আসুন। খরচের টাকাও দিয়ে দিয়েছে।

চন্দ্রিকাপ্রসাদ এসে ব'লে গেলেন, হুকুম এসেছে, আপনার বাবা যে কয়দিন এখানে থাকবেন, দিনের বেলা যখন তখনই জেলের ভিতর এসে দেখা করতে পারবেন, পুলিশ কর্মচারী কেউ থাকবে না, আমাদের জেল কর্মচারীও কারও থাকবার প্রয়োজন নেই।

এবারে যে ঘরটায় আমায় থাকতে দিয়েছিল, সেখান থেকে আগের মতো আর জেলের গেট অবধি দেখা যেত না—জেলার বেঙ্কটরাও পা টিপে টিপে হঠাৎ এসে ঘরে ঢুকতো। ডাঃ মোভি যে নিজেই আমায় কাগজ দিয়েছিলেন, ও তো তা জানতো না, ওর বোধ হয় ধারণা হয়েছিল, আমিই চেয়ে নিয়েছিলাম। ও কাজেই ধরতে চেষ্টা করতো, আমি বাবার মারফত কোনো চিঠি পাঠাই কি না।

বাবা আমার শরীরের অবস্থা দেখে তো খুব কাঁদলেন। তারপর, আমার মৃত বা মৃতপ্রায় দেহ নিয়ে যাবার জন্যে সরকারী পত্রের কথা, তাঁর নিজের ষ্টীমারের সিঁড়ি থেকে জলে পড়ে যাবার কথা, অসুখের কথা সব বললেন। বাড়ীর কথাও বললেন, চিরদিনের সচ্ছল সংসার এখন অভাবের সংসারে দাঁড়িয়েছে। মা প্রায়ই অসুস্থ থাকেন, চোখে কম দেখতে পান, তাই নিয়েই সংসারের কাজ সব কিছু করতে হয়।

সব শুনলাম—ঐ উপবাস-শীর্ণ শরীরে মনটা শেষ দিক দিয়ে একটা সমর্পণের ভাব আর একটা সুদূরের স্বপ্ন নিয়ে নিয়ত থাকতে ক্রমে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল। মায়ের কথাগুলো শুনে সেই দিনটা রাতটা ক্রমাগত মনে হ'ল, এ সবই তো আমারই জন্যে। এর পর আমার জীবনে সম্ভোগের, সঞ্চয়ের কোন স্থানই তো নেই। খেতে আরম্ভ করার পরেও রাতের ঘুম ফিরে আসে নাই। ঘণ্টা দুই ক'রে ঘুমোতে সুরু করেছি যেদিন থেকে সন্ধ্যাবেলায় গরম জলে স্নান করছি। ওদিন রাত্রে সে ঘুমটুকুও হ'ল না।

বাবা সেদিন সন্ধ্যায় যাবার বেলায় বলে গেলেন, তিনি আর একদিন মাত্র থাকবেন, কিন্তু যাবার আগে তিনি আমায় ভাত খাইয়ে যাবেন। আমি বললাম, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বলেছে, পনের দিনের আগে ভাত দেবে না। বাবা বললেন, তা তিনি শুনবেন না, তিনি আমায় ভাত খেতে দেখে যাবেন, অন্ততঃ দুটো ঘোঁটা ভাত তিনি নিজে হাতে ক'রে নিয়ে আসবেন। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের অনুমতি নেবেন।

এবারেও বাবা সেই ব্যারিষ্টার নগেনবাবুর বাড়ীতে এসে রয়েছেন। সেদিন জেলার আর ডাক্তার দু'জনে আমার দু'হাত ধরে জেলের গেটে নিয়ে গেল। অফিসে গিয়ে দেখি, সেখানে বাবাও রয়েছেন, আর রয়েছেন নগেনবাবু, আর সেই ম্যাজিষ্ট্রেট এস. পি. সান্যাল। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আমায় বললো, আপনার বাবা আর দেরি করতে রাজী নন, আজই আপনাকে সামনে বসায়ে চারটি খাওয়াতে চান। আমার মনে হচ্ছিল, আরও দু'এক দিন দেরি করা ভালো। ওঁর সেণ্টিমেণ্টের দিকে চেয়ে আমি আর আপত্তি করছিনে। আজই উনি ভাত এনে দেবেন, আপনি খাবেন।

এর পর লেগে গেল নগেনবাবুতে আর মিঃ সান্যালে ঝগড়া। নগেনবাবু বলেন, তাঁর বাড়ী থেকে খাবার দেবেন, মিঃ সান্যাল বলেন, তাঁর বাড়ী থেকে।

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বললো, আপনাদের কারও বাড়ী থেকে আমি দিতে পারিনে, ব্যবস্থা আমাকেই করতে হবে। তবে আমি এখানে যেসব পাচক পাব, তাদের হাতে খাবার তৈরী করে এঁকে দেবার আমার ইচ্ছা নেই। কাজেই আপনারা যে কেউ ভার নিলে আমার দায়িত্ব অনেকখানি কমবে। কিন্তু আপনারা যিনিই দিন, খরচের টাকা আমি দিতে বাধ্য, এবং আপনাদের তা নিতে হবে।

দু'জনে সমস্বরে বলে উঠলেন, ওসব বাজে কথা ছাড়ুন।

তারপর মিঃ সান্যাল মৃদু হেসে নগেনবাবুকে বল্লেন, আপনি সরকারী লোক নন, আপনাকে কেন দিতে দেব?

অনেক ঝগড়াঝাটির পর সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মধ্যস্থতা করলো।

মিঃ সান্যাল, আপনি বাবুর্চির হাতে খান, বিকেলের খাওয়াটা ওঁর এখন দরকার হালকা রকমের—সেটা আপনি পাঠাবেন। আর মিঃ দের বাড়ীতে মেয়েরা করবেন, উনি দুপুরের খাওয়াটা দেবেন।

ঐ ভাবেই শেষ পর্যন্ত রফা হ'ল। বাবা সেদিন নগেনবাবুর বাড়ী থেকে ঘোঁটা ভাত ক'রে নিয়ে এলেন। ঠাকুর খাবারটা জেল গেট পর্যন্ত নিয়ে এল, সেখান থেকে কোনো সিপাই কয়েদী দিয়ে আনতে দিলেন না—নিজে হাতেই নিয়ে এলেন।

এর পর থেকে ক্রমে শরীর ফিরতে লাগলো। কমবার বেলাতেও যেমন রোজ আধ পাউণ্ড, এক পাউণ্ড, দুই পাউণ্ড ক'রে ওজন কমেছে এখন তেমনি আবার বাড়তে সুরু করলো। দুই বেলা খাবার ছাড়া টিফিনের জন্য বিস্কুট, মাখন, পাঁউরুটি, সুজি, ঘি দিয়েছিল, একটা ষ্টোভ দিয়েছিল। দুধ, ডিম, ফল—এগুলোও আসতো। চাকরটাকে দেখিয়ে দিয়েও বিশেষ লাভ হত না। তা ছাড়া, অত্যন্ত নোংরা, নিজে হাতেই প্রায় সব ক'রে নিতাম। সকাল বিকাল বেড়াতাম, বেড়াবার গতিবেগ আর পরিমাণ ক্রমে বাড়িয়ে তুললাম।

যেন নতুন জীবন লাভ করছি। ছোট্ট শিশুটির মতো তুলতুলে নরম শরীর গড়ে উঠছে। ইচ্ছা হ'ল, ভিতরটাকেও নতুন করে গড়ে তুলব। "আমার এ ধূপ না পোড়ালে গন্ধ কিছুই নাহি ঢালে।" পোড়ানো তো চরম করেই হ'ল, কিন্তু গন্ধ তো আমার নিজের চেষ্টাতেই সৃষ্টি করতে হবে। স্বপ্ন দেখতে ভালবাসি সারা

জীবন। একা একা ঘুরে ব'সে সময় কাটে, নতুন ক'রে স্বপ্ন সৃষ্টির চেষ্টা করি। পথ খুঁজে পাইনে, নতুন আয়োজন করতে হবে, এই শুধু জানি। আয়োজন বন্ধুদের সাথে মিলে করব, নতুন পথ খুঁজব। কিন্তু যে-কোনো আয়োজন, যে-কোনো পথেরই যেন যোগ্য হতে পারি। এই যোগ্যতা অর্জনের জন্য প্রতি মুহূর্তের দৃষ্টি খুলে রাখি ভিতরের দিকে।

যখন তখনই প্রায় আফিসে যাই। কেউ বাধা তো দেয়ই না, বরং জেলের বড় গেট খুলে দেয়। নিয়ম, বড় গেট খুলবে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বা আরও উপরওয়ালা কেউ এলে। কিন্তু হাঙ্গার স্ট্রাইকে শ্রদ্ধা পাই আমি প্রায় উপরওয়ালাদের মতোই। তার কাছে আইন শ্লথ হয়ে যায়। এইভাবে আমার জন্য বড় গেট খুলতে জেলার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টও দু'এক দিন দেখেছে। অমন জেলার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টও কিন্তু বারণ করে নাই।

ভোর বেলায় জেলের কয়েদীদের গন্‌তি মেলাতে আসেন চন্দ্রিকা-প্রসাদ। তখন জেলার বা সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কারও আসবার কোনো সম্ভাবনা থাকে না। ঐ সময় মাঝে মাঝে চন্দ্রিকাপ্রসাদই আমায় অফিসে ডাকেন, আমার সম্পর্কিত যতো confidential চিঠিপত্র, তা খুলে আমায় পড়তে দেন। অবশ্য বিশেষ confidential যেগুলো, সে-গুলো থাকে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিজের কাছে। তাও দু'এক খানা মাঝে মাঝে হাতে পড়তো। যেগুলি হাতে পেলাম, তারই মধ্যে পেলাম রাজবন্দীদের প্রতি ব্যবহারের যে নতুন আইন কানুন করেছে তারই একখানা। নির্জন কারাবাস রাজবন্দীদের ঘুচে গেল। বেশী বিপজ্জনক আর অল্প বিপজ্জনক এই যে দুই শ্রেণীর রাজবন্দী তাঁরা যথাক্রমে পাঁচ ও দশজন এক সঙ্গে মিশতে পারবেন, খেলাধুলো করতে

পারবেন, সপ্তাহে একখানা এবং দু'খানা ক'রে চিঠি লিখতে পারবেন। মাসে দু'দিন ক'রে আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে দেখা করতে পারবেন। রান্নাবান্নার তদারক নিজেরা করতে পারবেন ইত্যাদি ইত্যাদি।

চন্দ্রিকাপ্রসাদ ছাড়া আরও একজন আইনকে অগ্রাহ্য ক'রে চলেন। তিনি মিঃ সান্ন্যাল।

শরীর যেমন ক্রমে সুস্থ হয়ে উঠতে রইলো, শুধু স্বপ্ন নিয়ে থাকা ছাড়া নিজের ভিতর কাজের তাগিদ দেখা দিল। পড়া বই সঙ্গে যা ছিল, আর একবার ক'রে কিছু কিছু পড়ি, গীতাঞ্জলি ইংরেজীতে অনুবাদ করি, আলিপুর জেলের ফরাসি শিখবার খাতাগুলো ছিল, তাই মুখস্থ করি, অথবা ভুল হোক্, শুদ্ধ হোক ফরাসি লিখি।

এখন আর আমার হাঙ্গার স্ট্রাইক নেই। তাই সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট জেলার সিভিল সার্জন হিসাবে প্রায়ই মফঃস্বলে ঘোরে। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কাজ করেন মিঃ সান্ন্যাল। তিনি একদিন বলেন, আপনাকে কিছু কিছু বই দেব। কিন্তু দেখবেন যেন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট না দেখতে পায়। বই তিনি প্রায়ই দিতেন ক্রপট্‌কিন, ষ্টেপনিয়াক—এদের।

ষ্টেপনিয়াকের Career of a Nihilist বইটা সেইদিনই পড়ে শেষ করেছি। বইয়ের সম্পর্কেই সান্ন্যাল বসে আলোচনা করছেন, আমি তাঁকে একটা জায়গা পড়ে শোনাচ্ছি—এমন সময় সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এসে হাজির। এসেই জিজ্ঞেস করে, কি বই পড়ছেন?

আমি কিছু বলবার আগেই মিঃ সন্যাল জবাব দেন, একটা প্রেমের গল্প, আমিই পড়তে দিয়েছি।

Career of a Nihilist প্রেমের গল্প—কথাটাকে মিথ্যা না বললেও চলে, কিন্তু অনেকবার ভেবেছি, ষ্টেপনিয়াকের Underground Russia বা Russia under the Czars, অথবা

ক্রপট্কিনের Conquest of Bread পড়বার বেলায় অম্নি ধরা পড়ে গেলে উনি কি বলতেন। অবিশ্যি স্থপারিণ্টেণ্ডেণ্টের ও বালাই ছিল না—সে যদি বইখানা হাতে নিয়েও দেখতো, Nihilist মানে কি, তা তার বোধগম্য হত না।

এঁদের ঠিক বিপরীত, আর আইনের ক্রূর প্রতিমূর্তি ছিল জেলার। সে দেখতো, সান্যাল এসে মাঝে মাঝে অনেকক্ষণ ধ'রে আমার সঙ্গে কথা কন, স্থপারিণ্টেণ্ডেণ্টও আলাপ জমাতে চেষ্টা করে। সে-ই বা করবে না কেন? তবে, সে আস্তো প্রায়ই রাতের অন্ধকারে—পা টিপে টিপে, অথবা দুপুরে আমার খাওয়াদাওয়ার পর। তার আলাপ ছিল প্রায়ই নিজের কাজ বাজাবার উদ্দেশ্যে—আমার কথা থেকে গোপন কিছুর সন্ধান পায় কি না, আর তার নিজের সম্পর্কে আমি যেন কোনো খারাপ ধারণা না পোষণ করি।

একদিন বিরক্ত হয়ে বলি, আচ্ছা, বলতো কোনো সিপাই কয়েদী তোমার সম্পর্কে 'শ'কারাদি বচন ছাড়া প্রয়োগ করে না কেন?

পান-খাওয়া দাঁত বের ক'রে খুব একচোট কাষ্ঠহাসি হেসে বলে, আমি জানি, অমুক সিপাই, আর অমুক জমাদার।

ওরা কি বলে আমি জানিনে, তবে তোমার প্রশংসা করবার লোক এ জেলে নেই।

আর একচোট হেসে বলে, আমি জানি। আপনি সেলে থাকতে অমুক সিপাই একদিন এই সব বলছিল, আর অমুক জমাদার এই সব—আমি সেলের দেয়ালের বাইরে দাঁড়িয়ে সব শুনে গেছি।

আমি প্রায় আকাশ থেকে পড়ি। কিন্তু সেরকম ভাব না দেখিয়ে ওদের বাঁচাবার চেষ্টায় বলি, কি জানি ওরা এরকম বলেছে ব'লে আমার মনে পড়ে না।

কতবার আমি সাবধান করেছি সিপাইদের, তারা নিজের গরজেও কতবার খৈনি খেয়ে থুথু ফেলার উপলক্ষ্যে অ্যাণ্টিসেলের বাইরে দেখে নিয়েছে। তবু দেখছি, ও কারও কারও কথা শুনে গেছে।

ও যে সিপাই আর জমাদারের নাম করলো, পরে তাদের পেয়ে সাবধান ক'রে দিলাম। ওরা এই শ্রেণীর লোকের সাধারণ বীরত্বের ভাব প্রকাশ করলো, বললো, কি করবে ও?

এখানে ব'লে রাখি, বিলাসপুর প্রবাসী বাঙালীরা এই সিপাই জমাদারদের মাঝে মাঝে রাস্তায় ধরে আমার খবর নিতেন এবং আমায় খবর পাঠাতেন। তার জন্য ওদের সাথে ভাব করবার উদ্দেশ্যে টাকা পয়সাও খরচ করতেন। জেলারের কথায় বুঝলাম, সে সব ও কিছু জানতে পায়নি। তবে চন্দ্রিকাপ্রসাদের যে আমার সাথে বেশ ভাব এবং তিনি যে গোপনে আমার সঙ্গে মাঝে মাঝে আলাপ করেন, তা জেনেছে। এই এক ধরনের জেলার ছিল এবং এখনও আছে— যাদের জেল শাসনের উপায় কতকগুলি স্পাই এবং গুণ্ডা পোষণ করা। এই স্পাই এবং গুণ্ডার প্রাদুর্ভাব বড় বড় জেলগুলিতেই বেশী ক'রে টের পাওয়া যায়।

জেলার হঠাৎ একদিন একটা কতকটা বাইরের কথা পাড়লো। জিজ্ঞেস করলো, "বাংলা দেশে কয়টা সেণ্ট্রাল জেল?" আমার একটু খট্‌কা লাগলো।

বললাম।

তার পর জিজ্ঞেস করে, তার ভিতর কোন্ জেলটা ভালো?

বুঝলাম, গবর্ণমেণ্ট জানতে চায়, আমার কোন্ জেলে যাবার ইচ্ছা।

ইতিপূর্বে আই. জি. ব'লে গেছে আমি হাজার স্ট্রাইক ছেড়ে

দিলে জব্বলপুর জেলে নিয়ে যাবে, সেটা ওখানকার সব চেয়ে ভালো জেল। জব্বলপুর স্বাস্থ্যকর জায়গা। এবং ঐ জেলে ষ্টেট প্রিজনারদের রাখবার মতো ভালো ঘর আছে।

গবর্ণমেণ্ট ব্যবস্থা করেছিল, বাংলার সব ষ্টেট প্রিজনারদের হাজারিবাগ জেলে রাখবার। তার জন্য প্রায় তুই লক্ষ টাকা খরচ ক'রে পুরোনো সেল ভেঙ্গে নতুন ক'রে প্রায় শ'দেড়েক সেল তৈরী করেছিল। কিন্তু প্রথম যে ষ্টেট প্রিজনাররা সেখানে যান, তাঁরা গিয়ে পান এক খাজা রকমের স্নপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে—ফলে, পর পর তিনটি হাঙ্গার স্ট্রাইক সেখানে হয়। আমায় হয়তো সেখানে আর নিতে চায়নি।

এদিকে বাবাও বিলাসপুরের গরম দেখে এসেছেন, তিনি কলকাতায় এসে ষ্টীফেনসনকে বলেন আমায় বাংলার কোনো জেলে আনতে। তিনি চেয়েছেন, আমায় যশোহর, খুলনা বা ফরিদপুর—এর কোনো জেলে আনা হয়, যেন তিনি মাঝে মাঝে দেখা করতে পারেন।

ষ্টীফেনসন বলেছে, আমায় সেণ্ট্রাল জেল ছাড়া রাখা চলবে না। এরই ফলে ওখানে প্রকারান্তরে অনুসন্ধান করতে বলেছে, আমি কোন্ জেলে থাকতে চাই।

জেলারের প্রশ্ন থেকে অনুমান করলাম, এইরকমই একটা কিছু ব্যাপার দাঁড়িয়েছে। তাই জেলারের কথার জবাবে ব'লে বসলাম, রাজসাহী জেল।

রাজসাহী জেলের কথা আলিপুরে থাকতে শুনেছি, সবচেয়ে বেশী দুর্ব্যবহার ঐ জেলে, সবচেয়ে কড়া নির্জন বাসের ব্যবস্থা। আবার এ-ও শুনেছি, মেদিনীপুর জেলের হাঙ্গার স্ট্রাইকে যাঁরা ছিলেন, তাঁদের

কয়েকজনকে ওখানে নিয়ে গেছে। তাঁদের কেউ কেউ আমার পরিচিতও।

এতদিনে বুঝে নিয়েছি, জেলে দুরবস্থা সবচেয়ে বেশী সেখানে, দুরবস্থা যেখানে সয়ে নেওয়া হয়। তবে প্রথম প্রথম সয়ে না নিয়েও উপায় ছিল না—প্রায় সবাই সর্বত্র একা পড়েছিলেন, ষ্টেট্ প্রিজনারদের অধিকার কি, তা-ও জানা ছিল না। বাইরে থাকতে এই শুধু জানা ছিল, শত্রুর পুরীতে দুর্ব্যবহার তো ওরা করবেই, হয়তো বা যন্ত্রণা দিয়ে তিলে তিলে মেরেই ফেলবে—তারই জন্যে তৈরী হতে হবে। অনেক জুলুম অনেকে নীরবে সহ্য করেছেন এই শিক্ষার ফলে। আবার এ শিক্ষা যাঁদের ছিল না—বিশেষতঃ পরবর্তী যুগে, তাঁরা কখনও বা নানা দুর্বলতা দেখিয়েছেন, কখনও বা বাড়াবাড়ি করেছেন—রাজনৈতিক বন্দীদের ছোট করেছেন।

চন্দ্রিকাপ্রসাদকে জিজ্ঞেস করলাম, ব্যাপার কি। তিনি বললেন, হয়তো আপনার অনুমান সত্যি। আমায় কিছু জানতে দেয়নি। একটা কি চিঠি এসেছে—জেলারকে ডেকে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট দেখিয়েছে, কিন্তু চিঠি ফাইলে রাখে নাই।

কয়েকদিনের মধ্যেই সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট জানালো, আমার বদলির হুকুম এসেছে। কোথায় বদলি, তা বললো না। অন্য সময় জেলার আমায় আপ্যায়িত ক'রে বললো, আপনি বলেছিলেন, রাজসাহী জেল বাংলার সেণ্ট্রাল জেলের মধ্যে সব চেয়ে ভালো। তাই আমরা আপনার সেখানেই বদলির ব্যবস্থা করেছি।

বাংলাদেশে ফিরে আসছি, নতুন জায়গায় আসছি, সঙ্গীসাথী পাব—মনে আনন্দও আছে। আবার ভাবি, নিজেকে নতুন ক'রে গড়ে তুলবার সুযোগ এখানেইতো ভাল পাচ্ছিলাম! বেশ হ'ত

থাকলে। সকাল সন্ধ্যায় ধ্যান, প্রার্থনা, আত্মবিচার করি, আপন মনে গান গাই। সারাদিন কিছু কিছু পড়ি বা লিখি। মনটা সব সময় একটা কিছু নিয়ে আছে, এই তৃপ্তিটা বেশ পাই। হাঙ্গার স্ট্রাইকের পর ওখানে দেড়মাস এইভাবে কাটে।

একদিন জেলার একজন রিজার্ভ ইন্‌স্পেক্টর নিয়ে এল—অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান। বললে, ইনিই কাল আপনাকে নিয়ে যাবেন।

ইন্‌স্পেক্টরটি বললে, ট্রেন সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটায়। কিন্তু আমি আপনাকে বিকেল ৩টা আন্দাজ নিয়ে যাব। আপনি তার ভিতর তৈরী হয়ে নেবেন।

সান্যাল এর ভিতর একদিন এসে বিদায় নিয়ে গেলেন। নিমন্ত্রণ জানিয়ে গেলেন, ছাড়া পেয়ে জব্বলপুরে একবার যেন তাঁর বাড়ীতে যাই। শুনেছিলাম, জব্বলপুরে কেন, সমস্ত মধ্যপ্রদেশের ভিতরই তাঁদের বাড়ীটি সুন্দর। মিঃ সান্যালের নিমন্ত্রণ কিন্তু রাখা হয়ে ওঠে নাই।

নগেনবাবু সরকারী কর্মচারী নন। আর, সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ডাঃ পরঞ্জপের ভদ্রতার জন্য ওখানকার সমাজে বিশেষ খ্যাতি ছিল না—নেহাৎই সরকারী কর্মচারী। তাই নগেনবাবু আমার সঙ্গে সাক্ষাতের আর চেষ্টা করেন নাই। তিনি এবং বাড়ীর মেয়েরা ঠাকুরের মারফৎ শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। আমিও ঐ পন্থাতেই বিদায় নিলাম।

ইনস্পেক্টরটি জেল থেকে বেরিয়েই বললেন, দেখুন, কিছু মনে করবেন না, আপনাকে আমি এত আগে বের ক'রে নিয়ে এসেছি, কারণ আমার মা আপনাকে একবার দেখতে চান, আপনাকে একটু চা খাওয়াতে চান।

বললাম, এতো সুখের কথা—মা চা খাওয়াতে চান, এতে মনে করবার কি আছে?

ইন্‌স্পেক্টরের কোয়ার্টারে গাড়ী থামতেই একটি শ্যামবর্ণ বৃদ্ধা মহিলা ছুটে এসে পরিষ্কার বাংলায় বললেন, এস বাবা এস, আমি কত কৃতজ্ঞ!

বুড়ি টেবিল সাজিয়েই রেখেছিলেন। বললেন, আমি বাঙালীর মেয়ে, আমার মা ছিলেন ব্যারাকপুরে স্থরেন ব্যানার্জির বাড়ীতে আয়া। তোমার কথা কত শুনি। কি কাণ্ডই করেছিলে বাবা। অমন করে মানুষেও পারে—আমরা তো শুনেই অস্থির—বলতে বলতে আমার পাশে এসে দাঁড়িয়ে মাথায় হাত বুলোতে লাগলেন।

ছেলে তখন মাথা নীচু ক'রে পাশের চেয়ারটাতে বসে। তারপর তাঁর স্ত্রীও এসে টেবিলে যোগ দিলেন। চারজন এক সঙ্গেই চা খাওয়া হ'ল—আরও কত কি সব পিঠে পায়েস তৈরী করেছিলেন। আমি তখনও গুরুপাক জিনিস কিছু খাইনে। কিছু কিছু বাদ দিলাম।

খেতে খেতে ইন্‌স্পেক্টারটি বললেন, চারজন কনষ্টেবল ও একটি হেড কনষ্টেবল নিয়ে আপনার সঙ্গে যাচ্ছি। অথচ কলকাতার উপর দিয়ে গেলে কি যে ক্ষতি হ'ত জানিনে। আমার স্ত্রীকে কলকাতায় পৌছে দেব। সে কথা জানান সত্ত্বেও অনুমতি পেলাম না। আপনাকে নিয়ে যেতে হবে সিনি, আদ্রা, আসানসোল, ব্যাণ্ডেল, নৈহাটি হয়ে। একেবারে ছকে দিয়েছে।

পথে বড় যত্নই করেছিলেন এই ইন্‌স্পেক্টর ও তাঁর স্ত্রী।

রাজসাহী জেলে তিন বৎসর

দুটো দিন বাইরের হাওয়ায় ঘুরে নেওয়া গেল। ব্যাণ্ডেল এবং হুগলি ঘাট ষ্টেশন দিয়ে যখন যাই, তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। বাইরের দিকে তাকিয়ে আছি, পুরোনো স্মৃতি সব মনে জাগছে। ঐ তো, একটু পথ যদি চলে যেতে পারি, চন্দননগরে পৌঁছে যাব—পলাতক জীবনে ওখানে কতো দিন কাটিয়েছি। আজও গেলে আমার আশ্রয়ের অভাব হবে না—সহকর্মীরা কে ধরা পড়েছেন, না পড়েছেন—এই কয় মাসের খবর জানিনে, তবুও আমার স্থান আমি ক'রে নিতে পারবই। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছি, প্রহরীরা সতর্ক হয়েই পাহারা দিচ্ছে—শরীর দুর্ব্বল, বেশী ছুটতে পারব না। মনের কামনা মনেই মিলিয়ে যায়।

ব্যাণ্ডেল ষ্টেশনে আমার পুরোনো পরিচিত রেল কর্মচারীটির দেখা পাই কি না—ঘুরে ঘুরে এদিক ওদিক দেখতে লাগলাম। পুলিশ পেছনেই ঘুরছে। অনর্থক ভদ্রলোককে বিপন্ন করব ভয়ে আর কোনো কর্মচারীকে জিজ্ঞেস করাও হ'ল না।

ক্রমে রাত হ'ল—নৈহাটি, শ্যামনগরও ছেড়ে গেলাম। কয়েক ঘণ্টার স্বপ্নও ফুরিয়ে গেল। কয়েক ঘণ্টা যেন পুরোনো সহকর্মীদের সঙ্গেই কাটলো - অতুলদা, কুন্তল, চারু। তখনও জানিনে যে কুন্তল আর চারু মাস তিনেক আগেই ধরা পড়ে গেছেন।

জেলেই তো যাচ্ছি, তবু পরদিন মনে হতে লাগলো, কতক্ষণে গিয়ে পৌঁছাব। ঘর বাড়ী ছাড়া জীবন—নিকট আত্মীয় হয়ে উঠেছেন সহকর্মীরাই। আলিপুর জেলে থাকতে শুনেছিলাম, পূর্বপরিচিতদের

মধ্যে রাজসাহীতে আছেন যতীন শেঠ, পূর্ণ দাস এবং নামশোনাদের মধ্যে আছেন প্রভাস দে, হরিশ সিকদার, গিরীন ব্যানার্জি এবং আরও কেউ কেউ। ভাব্‌ছি, কতক্ষণে এঁদের সঙ্গে দেখা হবে।

জেলগেটে ঢুকতেই ইউরোপিয়ান ইনস্পেক্টারটি ম্লান মুখে বিদায় সম্ভাষণ জানালো। অফিসে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের সঙ্গে দেখা—পূর্বপরিচিত অ্যাশ সাহেব। ফরিদপুরে যখন পড়ি, তখন সেখানকার সিভিল সার্জন ছিলেন, ভাল ক্রিকেট খেলোয়াড় এবং ভালো ডাক্তার হিসাবেও নাম ছিল। আমার দিদির চিকিৎসা করতে গিয়ে নিজে চেয়ে করেলা ভাজা দিয়ে ভাত খেয়েছিলেন। সে কথা মনে আছে। কিন্তু ভালো খেলোয়াড় এবং ভালো ডাক্তার হলেই যে জেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টও ভালো হবে, এমন কোনো কথা নেই—সে পরিচয় শীঘ্রই পাওয়া গেল। তাছাড়া, বুড়ো হয়ে মেজাজটাও গেছে খিট্‌খিটে হয়ে।

আমায় জেলারের ঘরে বসিয়ে দু'জনে মিলে আমার কাগজপত্র দেখ্‌লো। হয়তো তারই ফলে আমার মালপত্র বা দেহের আর তল্লাসি হ'ল না। নরেন মল্লিক বলে একজন এ্যাসিষ্টাণ্ট জেলার সঙ্গে নিয়ে জেলের ভিতর যেতে যেতে জিজ্ঞেস করে, "কতদিন হাঙ্গার স্ট্রাইক করেছিলেন?"

"আটাত্তর দিন।"

"বাবা, এ যে একেবারে বাঘ!"

কথাটা বন্ধুদের কানে গেল। সেই থেকে জেলের বন্ধুমহলে নাম হল "বাঘা" বা "বাঘা দা"।

কয়েক দিন পূর্বে প্রায় অনুরূপ উপায়ে আর এক বন্ধুর নামকরণ হয়েছে "মৌলবী সাহেব"।

জেলের একেবারে শেষ প্রান্তে জেলের বাইরের দিক্‌কার উঁচু

দেয়ালের দিকে মুখ ক'রে ফাঁসি কাঠের সংলগ্ন কুড়িটি সেল। এরই তেরটিতে আমাদের ষ্টেট্ প্রিজনারদের থাকবার ব্যবস্থা হয়েছে।

আমি আসবার সপ্তাহখানিক আগে আগ্রা জেল থেকে নিয়ে এসেছে সুরেশ দাসকে। আগ্রা জেলের কয়েক মাসে সুরেশবাবু মাথায় লম্বা লম্বা বাবরি গোছের চুল গজিয়েছেন, সুরধরনের খানিকটা দাড়ি রেখেছেন, জেলে ঢুকেছেন ধুতিটাকে লুঙির মতো ক'রে প'রে।

সুরেশবাবু চন্দননগরে ধরা পড়াতে Foreigners' Ordinance and Ingress into India Act-এর বন্দী। তাঁকে X class করবে কি Y class করবে, Regulation III-র বন্দীদের সঙ্গে মিশতে দেবে কি না দেবে, এই সব ভেবে চিন্তে বোধ হয় তাঁকে সেলে পৌঁছে দিয়ে নরেন মল্লিক সেলের বাইরের কাঠের দরজাটা টেনে বন্ধ ক'রে দিতে যাচ্ছিলেন।

সুরেশবাবু বললেন, "ও মশয়, দরজা বন্ধ করেন ক্যান ?"

"তা-ই নিয়ম।"

"কিসের নিয়ম মশয় দিনের বেলায় দরজা বন্ধ করার ?" ব'লে, সুরেশবাবুতো এক হ্যাঁচ্কা টানে দরজাটা খুলে নিলেন। নরেন মল্লিক হেসে চলে গেল।

পাশের ঘরে জমেছিলেন বন্ধুরা। তাঁরা বলাবলি করতে লাগলেন, "মৌলবীর তো তেজ আছে।"

এই থেকে হয়ে গেল সুরেশবাবুর নাম "মৌলবী সাহেব।"

আমায় সেলগুলোর সামনে দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, প্রথমেই চোখে পড়লেন পূর্ণ দাস। কিন্তু বাইরের পরিচিত যাঁরা, সে কালের সংস্কার ছিল; অফিসারদের সামনে তাঁদের সঙ্গে সে পরিচয় স্বীকার না করা। তাঁর পাশেই ছিলেন মণি চৌধুরী। তাঁর সঙ্গে আগে পাশাপাশি সেলে

থেকে এসেছি প্রেসিডেন্সি জেলে। এ ক্ষেত্রে পরিচয় অস্বীকার করবার প্রয়োজন নেই। বললাম, এ লোকটিকে ত চিনি। তিনি হেসে ফেললেন। কিন্তু পূর্ণদা মনে করলেন, আমি বোধ হয় তাঁর কথাই বলছি, তিনিও হেসে এসে হাতখানা ধরলেন। পরে বুঝলাম, নরেন মল্লিককে অত সন্দেহ করবারও বিশেষ কিছু নেই—একটু ভ্যান্‌তাড়া গোছের লোক, কাকে চিনি বলেছি, তা আফিসে পৌছাবার মধ্যে ভুলে যাবে। আর পুলিশে খবর দেবার মতো অতোখানি উৎসাহ ও সারা জীবন কুড়িয়েও পাবে না।

বন্ধুদের মধ্যে আমার নতুন নামকরণটি ক'রে তো নরেন মল্লিক সরে পড়লো। তখন সুরু হ'ল পরিচয়ের পালা। শুনলাম, হাজারিবাগে ষ্টেট প্রিজনারদের জন্য নতুন জেল খোলা হয়েছে এবং রাজসাহী থেকে যতীনদা (শেঠ), প্রভাসবাবু, হরিশবাবু, আরও দু'চার জন সেখানে চলে গেছেন। একটু নিরাশ হলাম। কিন্তু নতুন পেলাম কলিকাতা মালাঙ্গা লেনের গিরীন ব্যানার্জিকে ও ময়মনসিং বাজিতপুরের নরেশ চৌধুরীকে। তা'ছাড়া ছিলেন টাঙ্গাইলের রসিক সরকার ও ঢাকা মহেশ্বরদি পরগণার সতীশ পাকড়াশি। ইনি এসেছেন আমি ওখানে পৌছাবার এক দিন আগেই।

রাজসাহী জেলের পুরোনো কাহিনী সব একে একে শুনলাম। এখানেই জ্যোতিশ ঘোষ পাগল হয়ে যান। সে কথা ধরা পড়বার আগেই শুনেছিলাম। অবস্থা ও ব্যবস্থা দেখে এবং শুনে মনে হ'ল, আরও লোক পাগল হয়নি কেন!

নরেশদার চেহারাটি ফ্যাকাশে—প্রায় হলদে হয়ে গেছে। ওখানকার ওঁরা যা ব্যবহার পেয়েছেন, তার ফলাফলের নরেশদা প্রায় প্রতিমূর্তি। যে তেরটা সেল আমাদের ব্যবহারের জন্য দিয়েছে, তারই শেষ

প্রান্তে ২০নং সেল, ফাঁসির আসামীর জন্য। অন্য সেলগুলিও অনুরূপ, একটুখানি পার্থক্য এই—সবগুলো সেলেরই অ্যান্টিসেলের সামনে পাঁচ ছয় হাত দূর দিয়ে আর একটি দেয়াল, এই দেয়ালের গা থেকে কয়েকটি ক'রে সেল অন্তর অন্তর অ্যান্টিসেলের দেয়ালের গা পর্যন্ত আর একটি ক'রে দেয়াল, মাঝে একটি ক'রে লোহার গরাদে দেওয়া দরজা—এইভাবে যে ঘেরা, তাতে ফাঁসির সেলের এলাকা ঐ একটি সেলেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু আমাদের দিকে ৭নং থেকে ১০নং পর্যন্ত চারটি সেল, ১১নং থেকে ১৩নং পর্যন্ত ৩টি সেল, ১৪ থেকে ১৬ পর্যন্ত ৩টি এবং ১৭ থেকে ১৯ পর্যন্ত ৩টি এক একটা আলাদা আলাদা এলাকা। প্রেসিডেন্সি জেলের চুয়াল্লিশ ডিগ্রী যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছে। কিন্তু সেখানে অ্যান্টিসেলের পরে জেলের আসল দেয়ালের আগে আর দেয়াল নেই, এবং সেলইয়ার্ড ২২টা ক'রে সেলের সামনে একটা, এখানকার মতো তিন চারটে সেলের জন্য আলাদা আলাদা নয়।

রাজসাহী জেলে প্রথমটা নরেশদাদের ২৪ ঘণ্টাই সেলে বন্ধ থাকতে হ'ত, স্নান এবং পায়খানা যাবার জন্য অ্যান্টিসেলে সকাল বিকাল কয়েক মিনিটের জন্য বের ক'রে সামনের কাঠের দরজাটি বন্ধ ক'রে দিত। লোহার থালায় ক'রে খাবারটা সেলের লোহার দরজার তলা দিয়ে গলিয়ে দিত। কয়েক মাস এই ভাবে দিন রাত ধরে সেলের ভিতর কাটাবার পর জ্যোতিষবাবু পাগল হন। তাঁকে বহরমপুরের পাগলা-গারদে পাঠিয়ে দেয়। এদিকে অন্য সব জেলে হাঙ্গার স্ট্রাইক সুরু হ'ল। তখন দয়া ক'রে ওঁদের সকালে পনের মিনিট ও বিকেলে পনের মিনিটের জন্য অ্যান্টিসেলের সামনে যে ঐ স্বল্পপরিসর জায়গাটুকু, তার ভিতর "**exercise**"-এর জন্য বের করতো। এখানে বলা প্রয়োজন, ঐ যে ৭ থেকে ১০নং-এর এলাকা, ওর ভিতর একজন ক'রে মাত্র

ষ্টেট প্রিজনার রাখতো। এবং ঐ প্রত্যেক আলাদা আলাদা এলাকায় এক জনের বেশী ষ্টেট প্রিজনার রাখতো না—যেন কারও গলার আওয়াজ কারও কাছে না পৌছায়। পরবর্তী উন্নত আবহাওয়ায় যখন "exercise"এর জন্য সকাল বিকাল বের করতো, তখন এলাকাগুলোর মাঝখানে যে লোহার দরজা, তার উপর দিয়ে এক এক খানা কম্বল ঝুলিয়ে দিয়ে এলাকা গুলির পরস্পরের ভিতর আড়াল সৃষ্টি ক'রে দিত। তা সত্ত্বেও প্রথম এলাকার অধিবাসী যখন "একসারসাইজ"-এর জন্ম বের হবেন, তখন দ্বিতীয় এলাকার অধিবাসী বের হবেন না, হবেন তৃতীয় এলাকার অধিবাসী। এই উপায়ে পরস্পরের এবং মানুষের সংস্পর্শ বাঁচাবার যত রকম বিধিবিধান হতে পারে, তার বিন্দুমাত্র ক্রুটী হয়নি।

রাতের বেলায় ষ্টেট প্রিজনারদের পাশের খালি সেলগুলিতে দাগী কয়েদীদের এনে ভরতি করতো। ভাতের সঙ্গে ডাল, লাউয়ের ঘ্যাঁট এবং এক টুকরো ক'রে মাছের সঙ্গে প্রচুর ঝোল এই ছিল খাদ্য—অধিকাংশ দিনই পোড়া ডাল, যতো কদর্য চাল পাওয়া যায় তার আধাসিদ্ধ ভাত—সবটাই অত্যন্ত নোংরা—দূরে মেয়ে কয়েদীদের ইয়ার্ড থেকে রান্না হয়ে আসতো।

কাপড় জামা চাইলে বলতো বাড়ীতে লেখ। চিঠি, বই, খবরের কাগজ—এসব ছিল ষ্টেট প্রিজনারদের পক্ষে দুর্লভ বিলাস দ্রব্য।

এই জীবন যাপন ক'রে, এই খাদ্য খেয়ে যা হতে পারে, ওঁদের তা-ই হ'তে থাকলো। নরেশদাকে অম্লশূলে ধরলো। সারাদিন বন্ধ সেলের মধ্যে ব'সে শুয়ে কি আর করবেন? ওঁর মনে দ্বন্দ্ব উঠ্‌লো, ভগবান আছেন কি নেই? ভাবতে ভাবতে মনটা যখন স্থৈর্যের সীমা ছাড়িয়ে যায়, তখন ওঁর চোখে পড়লো, সেলের একেবারে উপরের

দিকে জানালা নামক যে একটি পদার্থ আছে, তাতে মাকড়সার জাল জমেছে—একটি পোকা তাতে আটকা প'ড়ে গেছে, পোকাটি বার বার চেষ্টা করছে উপরে উঠে জানালার মুখে বেরিয়ে যেতে। কিন্তু জালটি এমনি তৈরী যে, ও বহু চেষ্টায় এক একবার কোনো মতে উপরের দিকে ওঠে, আবার ধাঁ ক'রে নীচে পড়ে যায়। নরেশদা বার বার এটি লক্ষ্য ক'রে স্থির করলেন যদি পোকাটি বেরিয়ে যেতে পারে তা হ'লে বুঝব, ভগবান আছেন, নয় তো নেই। এক একবার পোকাটি যখন প্রায় বেরুবার মুখে, ওঁর সমস্ত স্নায়ুগুলো যেন বলতে থাকে এই···এই···দিনের পর দিন ওঁর মনের বা স্নায়ুর তীব্র, একাগ্র দ্বন্দ্ব চলতে থাকে। এক একবার পোকাটি নিস্তেজ হয়ে ঝিমিয়ে প'ড়ে থাকে—উনিও হাত পা ছড়িয়ে নিরাশ হয়ে শুয়ে পড়েন।

চিরবৈচিত্র্যে ঘেরা মানুষের মনকে ফুলের মতো ছিঁড়ে নিয়ে অমুনি বন্ধ ক'রে রাখলে যা হয়, জ্যোতিষ বাবুর একদিন তা-ই হ'ল। নরেশদারা ওর সীমা পর্য্যন্ত গিয়ে নেহাৎ স্নায়ুর জোরে বেঁচে গেলেন। ইতিমধ্যে একটা পাশের সেলেই জ্যোতিষবাবুর কি হ'ল, তা ওঁরা টেরও পেলেন না। সামান্য দূরে দূরে দুটো সেলে প্রভাস দে আর হরিশ শিকদার দু'জন আবাল্যবন্ধু ছয়মাস কাটিয়ে গেলেন—পরস্পর জানতে পেলেন না।

এর ভিতর ঝোড়ো হাওয়া ঢুকলো—গিরীন দা, পূর্ণ দা, যতীন দা—ওঁরা সব মেদিনীপুরের হাঙ্গার স্ট্রাইকের পর ওখানে গিয়ে ওঁদের টেনে টেনে বের করতে লাগলেন। কিন্তু সেলে বদ্ধ থেকে থেকে এমন অবস্থা হয়ে গেছে নরেশদা বাইরের আলো সইতে পারেন না, ধ'রে নিয়ে বাইরে বসিয়ে দিলে চোখ চেপে ঘরে ফিরে আসেন। শুনতে শুনতে Tale of Two Cities-এর ডাঃ ম্যানেতের কাহিনী মনে পড়ে।

আমি রাজসাহীতে যাবার আগেই অবস্থার পরিবর্তন সুরু হয়েছে। কিন্তু তবু গিয়ে সব যা কাহিনী শুনলাম, তা'তে হাসব কি কাঁদব ভেবে পাইনে। তখনও সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অ্যাশ সাহেব, আর জেলার এক ব্যক্তি—তার নাম রায় সাহেব গুরুচরণ দত্ত।

মেদিনীপুরের হাঙ্গার স্ট্রাইক থেকে যাঁরা গেছেন, তাঁদের একটু ভয়ও করতো। এদিকে আলিপুরের হাঙ্গার স্ট্রাইকের পর সরকারী হুকুমও গেছে ভাল ব্যবহার করবার। ভাল ব্যবহারের অঙ্গ হিসেবে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হুকুম দিয়েছে, রোজ প্রত্যেক ষ্টেট প্রিজনারকে আধ সের ক'রে দুধ দিতে। প্রথম দিন ঠিক এল। তার পর দিন থেকে জন প্রতি এক ছটাক হিসেবে কমতে থাকৃলো। জেলার জানে, যে-দিন ওটা ক'মে পাঁচ ছটাকে দাঁড়াবে, সেদিন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কাছে নালিশ হবে। সেদিন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে নিয়ে জেলার আর রাজবন্দীদের ওমুখো হ'ত না। ব'লে দিত, ওরা ভালই আছে, ওদের কোন নালিশ নেই।

কিন্তু এঁদের তখন পৃথক পৃথক ভাবে জেলের ভিতর এদিকে ওদিকে বেড়াতে দিত। এঁরা তাকে তাকে থেকে রাস্তার ভিতরই সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে ধরতেন। জেলারকে জিজ্ঞেস করলে ব'লে দিত, কেউ কোনো ভুল করেছে—ও দেখবে, আর যাতে ওরকম না হয়।

গুদাম পচা চালের ভাত দেয়। কয়েকবার নালিশ করেছেন। কয়েকদিন পর পরই আবার পচা চালের ভাত আসে। একদিন ধরতে জেলার বলে, কে জানে সার, কে ঐ চাল দিয়েছে!

প্রভাসবাবু গর্জে উঠে বললেন, "Do you mean to say that it was surreptitiously introduced into the godown ?

"Surreptitious" কথাটার মতো কড়া ইংরেজী বুঝবার

বিস্তা বোধ হয় রায় সাহেবের ছিল না—ব'লে বসলো, "Yes sir, yes sir"।

এর পর কয়েকদিন চাল ভালই এল। আবার একদিন অম্নি পচা চাল। খেতে বসে গন্ধ পেয়েই তো যতীন শেঠ থালা ধরে বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ডেকেছেন, "জমাদার, জেলার কাঁহা হায়? বোলাও উস্‌কো।"

পূর্ণ দাস বললেন, নিয়ে এস শা···কে। ওকে কুচি কুচি ক'রে কেটে পদ্মায় ভাসাব, তার পর না হয় ফাঁসি যাব।

এরপর মিনিট পনের না যেতে খাসা সরু চালের ভাত, কয়েক রকমের তরকারি আর গরম গরম চপ শুদ্ধ পরিষ্কার বড়ো বড়ো থালায় ক'রে কয়েদীরা বয়ে নিয়ে এল। বলা বাহুল্য, এর পর থেকে আর কোন দিন গুদাম পচা চা'ল ষ্টেট প্রিজনারদের কাছে আসে নাই।

কয়েকজন একাদশী করতেন। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হুকুম দিলেন, তাজা ফল যদি ভাল পাওয়া না যায়, কিশমিশ পেস্তা প্রভৃতি শুখনো ফল যেন দেওয়া হয়।

রায়সাহেবের সহধর্মিণী ছিলেন বেশ একটু স্থূলকায়া, এবং অফিসের উপরে দোতলা থেকে তিনি যে কণ্ঠে কথা বলতেন, জেলের ভিতরে কয়েদীরা শুনতে পেয়ে তাঁর নাম দিয়েছিল "রায়বাঘিনী"। কয়েদীরাই রাজবন্দীদের খবর দিল, একাদশীর ফলাহারের ব্যবস্থা স্বামীর মুখে জেনে তিনি মন্তব্য করেছেন, "ত্যাজচন্দ্রের ব্যাটারা! কিশমিশ প্যাস্তা খাবেন!"

আমি রাজসাহীতে গিয়ে রায় সাহেবের দর্শন পাই নাই। তার জায়গায় এসেছে উপেন মুখার্জি ব'লে একজন। ফরিদপুর ষড়যন্ত্র

মামলায় ১৯১৪ সালে যখন পূর্ণ দাস তাঁর দলবল নিয়ে ফরিদপুর জেলে বিচারাধীন বন্দী, উপেন মুখার্জি তখন সেখানকার জেলার। চিত্ত-প্রিয়ের বারো বছরের ভাই কান্তিপ্রিয়ের প্রতি জেলে দুর্ব্যবহারের জন্য একদিন জেলারকে মার দেবার বন্দোবস্ত করছিলেন পূর্ণদা, সন্তোষ দত্ত এবং আরও দুএকজন। রাতের অন্ধকারে দাঁড়িয়ে উপেন মুখার্জি দরজার বাইরে থেকে ওঁদের আলাপ আলোচনা শুনে ফেলে। তার পর দিন থেকে ফরিদপুর জেলের রাজনৈতিক বন্দীদের অবস্থা ফিরে গেল।

তারপর হুগলী জেল হয়ে উপেন মুখার্জি রাজসাহীর জেলার হয়ে এসেছে। পূর্ণদাও সেখানে রয়েছেন। সরকারী হুকুম ইদানীং একটু রাশ ঢিলা দিয়েছে, তার ফলে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট যদি বলে একগুণ জেলার করে দশগুণ। তাছাড়া, অন্য বুদ্ধিও উপেন মুখার্জির ছিল। সে জানে, রাজবন্দীদের পেছনে যদি দশ টাকা খরচ করে, উপরি পাওনা না হয় এক টাকা হতে পারে; কিন্তু ত্রিশ টাকা খরচ করলে চাই কি, পাঁচ টাকাও হতে পারে। আর টাকা তো গৌরী সেনের। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট জিজ্ঞেস করলে অনায়াসে বলা চলে, সার, না দিলেই রাজবন্দীরা গোলমাল করবে। সে নিজেই এসে রাজবন্দীদের বলে, "এখানে এমন ভাল ভাল ছোট মাছ পাওয়া যায়, আপনারা রোজই রুই মাছ খাচ্ছেন কেন? আমি কালই ব্যবস্থা করছি।"

আড়াই সের যদি রুই মাছ আসতো, তার পর দিন থেকে তার সঙ্গে আরও এক সের ক'রে পাবদা বা বাটা মাছ আসতে সুরু করলো। তারপর একদিন ভালো কই মাছ বাজারে উঠলো, সে দিন থেকে তা-ও আর দু'সের ক'রে আসতে রইল। এম্‌নি—যেমন মাছ, তরকারি, ফল, তেমনি কাপড়, জামা, জুতো, তেল, সাবান। চাল, ডাল, আটা, ঘি, চিনি তো গুদামে স্লিপ পাঠাইলেই হ'ল।

অবস্থা এই দিকে যখন ঘুরছে, তখন আমি রাজসাহী পৌঁছালাম। পৌঁছাবার পর দিনই ম্যানেজারির মীট্‌সেফ ইত্যাদি পূর্ণদা আমার ঘরে পাঠিয়ে দিলেন। ওখানে তখন ম্যানেজারি করা মানে আর কিছু নয়—কোনো জিনিষ কখনও কোন কারণে দিতে অস্বীকার করলে ধমক দিয়ে আদায় করা। অত দিন হাঙ্গার স্ট্রাইক ক'রে গেছি—কথা ভারে কাটে অনেকখানি।

রাজবন্দীদের সব জায়গায় যে অবস্থায় রেখেছে, আমাদেরও জিদ্ চেপে গেল, অস্বীকার কোনো জিনিষে করতে দেব না। গিরীনদা আমাদের মধ্যে বয়সেও সবার চেয়ে বড়ো ছিলেন, এবং তাঁর আপন-ভোলা স্বভাবের জন্য সবাই তাঁকে শ্রদ্ধাও করতাম। মুখফোড় লোক—ঝগড়া-ঝাটিও তিনিই এগিয়ে গিয়ে করেন। তাঁর একটি নীতি আমরা মেনে নিয়েছিলাম—কোনো কিছু চাইবার আগে ভেবে চিন্তে চাইব। কিন্তু যা চাইব, তা যেমন ক'রে হোক আদায় করতে হবে। জেলখানার আগাগোড়াকার জীবনে এই নীতিটি পালন করতে চেষ্টা করেছি।

ইতিমধ্যে আরও কয়েকজন রাজবন্দী একে একে ওখানে গেলেন—এঁরা সবাই অনুশীলনের লোক—প্রবোধ দাস গুপ্ত, যোগেশ চাটার্জি, প্রতুল গাঙ্গুলি। প্রবোধ নতুন ধরা পড়ে এসেছেন। যোগেশ প্রেসিডেন্সি জেলের রাজবন্দীদের প্রতি ব্যবহারের বিরুদ্ধে হাঙ্গার স্ট্রাইক করেছিলেন, চারদিন হাঙ্গার স্ট্রাইক হয়ে যাবার পর রাজসাহীতে পাঠিয়ে দিয়েছে। ওখানে দুর্ব্যবহারের প্রশ্ন নেই। যেদিন গেলেন, সেইদিন থেকেই খাওয়া দাওয়া সুরু করলেন। প্রতুলবাবু আমাদের সঙ্গেই আলিপুরে হাঙ্গার স্ট্রাইক করেন, এবং একসঙ্গেই আমরা মধ্য-প্রদেশে যাই—আমি বিলাসপুরে, প্রতুলবাবু রাইপুরে। এখন মধ্য-প্রদেশ থেকে সব আবার বাংলায় অথবা হাজারিবাগে পাঠিয়ে দিল।

সুরেশবাবু আগ্রায় যে কয়মাস ছিলেন, শুধু দুধ খেয়ে থাকতেন—রোজ পাঁচ সের। এখানেও তাই চালালেন, তার সঙ্গে কিছু কিছু ফল খেতেন। তার পর, আমিই একদিন বললাম, এতে লাভ কি? স্বাভাবিক মতোই খাওয়া দাওয়া সুরু করলেন। কিন্তু জেলারের ব্যবস্থা অনুযায়ী তাঁর দুধের পরিমাণ পাঁচ সেরই বজায় রইলো। আমাদের সকলের পাওনার উপর এই পরিমাণটায় আমাদের রোজ ক্ষীর, সর, মিঠাই খাওয়ার ব্যবস্থা হ'ল।

পাওয়ার ব্যবস্থা ঠিকই আছে। রান্নাঘরেও রোজ আমাদের এক একজন ম্যানেজারী করতে যান—কে কত পদ করাতে পারেন, তার প্রতিযোগিতা চলে। একটি হিন্দুস্থানী দাগী কয়েদী রান্না করে—উত্তরবঙ্গের রাজবংশী তিন চারটি কয়েদী তাকে সাহায্য করে। এক একদিন সাড়ে এগারটা বারোটার ভিতর বাবুদের সকালের জল খাবার খাইয়ে কুড়ি বাইশ পদ রান্না নামিয়ে দেয়। এই হিন্দুস্থানীটিও যেমন রান্নায় ওস্তাদ, রাজবংশীরাও তেমনি হাসিমুখে অক্লান্ত পরিশ্রম করে। এমন সৎ আর সরল এদের প্রকৃতি—কেন যে দলে দলে এদের জেলে এনে পুরেছে ভেবে পাওয়া দুষ্কর।

পাই এত, রান্না হয় এত—অথচ খাবার বেলায় অনেক দিন আমাদের মাছ তরকারিও থাকে না। যত দিন যায়, জেলের ভিতর স্বাধীনতা যতো বাড়ে, ততো চোখে পড়ে, চারদিকে কতো বুভুক্ষু লোককে রেখে আমরা খাই! আমরা খাই চর্ব্য চোষ্য, তারা খায় মানুষের অখাদ্য ডাল আর তরকারি, আর মোটা মোটা ভাত। ক্রমে এমন হয়ে পড়লো এক একদিন পঞ্চাশ ষাট জন পর্যন্ত কয়েদীর ফাইল ধরে বসিয়ে লুচি, মাংস আর মিষ্টি খাওয়াই। অবশ্য এ অবস্থা একদিনে আসে নাই। সে পরের কাহিনী পরে বলা যাবে।

কাপড়, জামা, জুতো, তেল সাবানের দিকেও অবস্থা পৃথক নয়। এদিকে আমাদের বাক্সে পেটরায় এক একটি প্রকাণ্ড ফোকর দেখা দিয়েছিল।

খবরের কাগজ ওরা দেবে না। কিন্তু খবরের কাগজ না পড়লে আমাদেরও চলে না। কাজেই কাগজ যোগাড় হয়,—জেলের ছোটবড় কর্মচারীর মারফত। অনেক আপদ বিপদ ঘাড়ে নিয়ে তাঁদের এই কাজ করতে হয়। তাঁদের কিছু দেওয়া—কর্তব্য হিসাবেই আমরা দিই, কাগজের মূল্য হিসাবে নয়। তাছাড়া, সিপাই জমাদারদের খুব বিপক্ষে রেখে এসব কাজ করা চলে না। তারা আমাদের পেছনে লেগে থাকবে না, এই অবস্থাটা আনতে গেলে আমরা খুব ভালো লোক ব'লে তাদের কাছে পরিচয় হওয়া চাই। তাই ঘি, তেল, চিনি, ময়দা থেকে সুরু ক'রে কাপড়, জামা, জুতো, তেল, সাবান—এমনকি গামলা ডেকচি পর্যন্তও এই পথে উড়ে যেত। জেলখানার অত কড়াকড়ির ভিতর কি ক'রে ওরা নিত এসব? আমারও এক সময় আশ্চর্য্য লাগতো—বিশেষ ক'রে যখন একজন সিপাই একদিন একটা ডেকচি চাইল্যে। আমি জিজ্ঞেস করতে সে বললো, বাবুজি, জেলের কেবল দেওয়ালটাই নিয়ে যাওয়া চলে না, আর কিছুই আটকায় না।

সকাল বেলা কাগজ আসে। একজন একটা সেলের ভিতর ব'সে সেটা পড়ে নোট করেন, আর একজন দরজার সাম্‌নে এবং সেলের ইয়ার্ডে ঘুরে ঘুরে পাহারা দেন—কারণ, সেটা সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আসবার সময়। ছু'পুরে খাওয়া দাওয়ার পর আমরা একটা ঘরে জমায়েৎ হই—সেটা আমাদের বৈঠকখানা, সেখানে টানাপাখা ছিল আর ফরাস বিছানো। প্রথমে খবরগুলো শোনা হয়, কারও ভালো বক্তৃতা বা

প্রবন্ধ থাকলে তা পড়া হয়। তারপর তাস বা পাশা খেলা। যাঁরা ওতে রস পান তাঁরা খেলেন, নয়তো নিজের নিজের ঘরে বা গাছতলায় বসে পড়াশুনো করেন। বিকেলে ব্যাডমিণ্টন খেলা হয়। তারপর হাত পা ধুয়ে কিছু সময় একটা খোলা মাঠে সবাই মিলে বসি। এমনই গরম সেলগুলো যে যতক্ষণ বাইরে কাটিয়ে যাওয়া যায়।

আমি বসে থাকি—নরেশদা আমার কোলে মাথা রেখে ঘাসের উপর শুয়ে পড়েন। কোনো কোনো দিন মণিদা অথবা রসিক। আমি বলি, ময়মনসিংএর লোকরা শুতে ভালবাসে। নরেশদা আমায় একটা ঘুষি মেরে বলেন, তুলোর ঢিবি। হাঙ্গার স্ট্রাইকের পরে নতুন ক'রে শরীর গড়ে উঠ্ছে—গায়ে প্রচুর মেদ জম্‌ছে। দেখি লক্ষণ ভালো নয়। ভোরে উঠে মাঠের চারদিক দিয়ে দুই মাইল দৌড়াই, বিকেলে ডাম্বেল বা ডেভেলপার নিয়ে ব্যায়াম করি, শরীর আবার শক্ত হয়ে উঠতে থাকে।

এর ভিতর একদিন নরেশদাকে নিয়ে চলে গেল আলিপুর জেলে চিকিৎসার জন্য। উদার, সরল, অমায়িক নরেশদার সঙ্গের মাধুর্য, আর রাজসাহী জেলের ঐ এক বছরে তাঁর যা অবস্থা হয়েছে—সবে মিলে তিনি যখন চলে গেলেন, আমাদের জীবন থেকে যেন অনেকখানি খসে গেল। এঁরা দুই ভাই রমেশ আর নরেশ ছিলেন দুই পৃথক দলে। দু'জনের চরিত্রের পার্থক্যও যে-কোনো লোকের চোখে পড়তো। সখারাম গণেশ দেউসকর যখন "দেশের কথা" লেখেন, সে কাজে সখারামের উপদেশ মতো নরেশদা অনেকভাবে তাঁকে সাহায্য করেছিলেন। তখন তাঁর বয়স অল্প। সেই থেকে নরেশদার পড়াশুনোর প্রতিও বেশ একটা ঝোঁক গড়ে উঠেছিল। রাজসাহী জেলে পরে পড়াশুনোর যে একটা আবহাওয়া গড়ে উঠেছিল,

তাতে নরেশদার দান সামান্য নয়। কয়েক বছর পরে নরেশদার থাইসিসে মৃত্যু হয়।

দিনটা আমাদের এক রকম কাটে। আর সব ব্যবস্থাই মোটামুটি ভালো। কিন্তু রাত যেন আর কাটতে চায় না। এপ্রিল মে মাসে রাজসাহী জেলের ঐ সেলগুলো যেন এক একটি ষ্টীমারের বয়লারের পাশের জায়গাটির মতো হয়ে থাকতো। না পারা যেত পড়তে, না পারা যেত শুতে। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শীতলপাটি আর হাতপাখা পর্যন্ত কিনে দিতে পারে, কিন্তু "A State Prisoner shall be confined in a cell"—এই ছিল তখনকার আইন—সে সেল মানুষের বাসের যতো অযোগ্যই হোক না কেন। কি আর করা যাবে? শীতলপাটিটা সেলের দরজার গোড়ায় মেজেতে বিছিয়ে নিতাম, কুঁজোর জলে গামছা ভিজিয়ে বার বার শীতলপাটিতে লাগাতাম, তারপর ঘুমোতে চেষ্টা করতাম। ঘুম যখন আসতো না, তখন সুরু হ'ত সবাই মিলে এ সেল ও সেল থেকে চীৎকার, আর মণিদার উদ্দাম সঙ্গীত, সঙ্গে সঙ্গে স্প্রিংয়ের খাটে উঠে নৃত্য। সুরেশবাবু সুরু ক'রে দিতেন যাত্রার দলের পাঠ বলা—"ডাক্, ডাক্ তব পিতামহকে।" "ডাক্", "ডাক্" দুটি আওয়াজ যখন করতেন, তখন মনে হ'ত, বাজ প'ড়ে বুঝি সেলের ছাত ভেঙ্গে গেল। জেলের অপর প্রান্ত থেকে জমাদার ছুটে আসত কি কাণ্ড হ'ল দেখবার জন্য। দরখাস্তের পর দরখাস্ত পড়তে লাগলো—সেল বাস থেকে মুক্তির জন্য। ফল কিছু হ'ল না। এর ভিতর এক সাংঘাতিক ঘটনা ঘট্‌লো।

রসিক সরকার ছিলেন অনুশীলনের লোক। কিন্তু পুর্ণদার সঙ্গেও এক সময়ে তাঁর যোগাযোগ ঘটেছিল। বয়সে রসিক আমাদের সমবয়সীই হবেন, কিন্তু ঐ বয়সেই তাঁর মাথার চুল অনেক

পরিমাণে পেকে গিয়েছিল। মাঝে মাঝে রসিক খুব ফূর্তি করেন। কয়েদীদের সঙ্গে গল্প ক'রে তাদের দুঃখদৈন্যের কথা শোনেন। কখনও কখনও বা তাদের কথা শুনতে শুনতে ঘরে এসে খাওয়া দাওয়ার বা অন্য জিনিষ যা পান দিয়ে দেন। আবার এক এক সময় ভয়ানক গম্ভীর হয়ে মাঠের ভিতর একা চুপ্ চাপ্ ব'সে থাকেন। কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলে হেসে উড়িয়ে দেন।

কোনো কোনো দিন খেলার মাঠে যান না। কোনো কোনো দিন খুব ফূর্তি হৈ চৈ ক'রে খেলাধুলো করেন। আমারই মতো ব্যাড্‌মিণ্টন ভাল খেলতে পারতেন না। সুরেশবাবু ছিলেন সব চেয়ে ভালো খেলোয়াড়, কাজেই কোনো দিন আমাকে, কোনো দিন রসিককে সুরেশবাবুর বায়া হ'তে হ'ত। খেলায় এক একটা ভুল করলে সুরেশবাবু আসতেন র‍্যাকেট নিয়ে তাড়া ক'রে, রসিকও র‍্যাকেট তুলে রুখে দাঁড়াতেন। তখন সুরু হ'ত দু'জনে মাঠ জুড়ে নটরাজের নৃত্য। হাসতে হাসতে আমাদের পেটের নাড়ী ছিঁড়তো।

সেদিন রসিক সব চেয়ে বেশী ক'রে নৃত্য করেছেন। তার পর খেলাধুলার পর রোজকার মতো যে যার ঘরে বন্ধ হয়ে গেছি। শেষ রাতের দিকে কি একটা গোলমাল শুনে ঘুম ভেঙ্গে গেল। ডাক্‌ছি, সিপাই, সিপাই, কি হ'ল? সে কি জবাব দিল, আমি শুনলাম "সাপ"। মনে করলাম বুঝি কোনো সেলে সাপ ঢুকেছে। দুজন ক'রে সিপাই থাকতো রাতের বেলা আমাদের পাহারা দেবার জন্য, দিনের বেলায় তিন জন। এদের এক জন ছিল গুর্খা। সাম্‌নে যার গলার আওয়াজে আমি শুনলাম "সাপ", সেটি গুর্খা।

আর ইতিমধ্যে হিন্দুস্থানী সিপাইটির গলা শুনছি, সেলের পেছনে

হাসপাতালের কাছে। তার গলা দিয়ে আওয়াজ বের হচ্ছে না—বলছে, "চাবি লাও", "চাবি লাও।"

সে বোধ হয় হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল, বিপদে সংকেত ধ্বনি করবার জন্য তার পকেটে হুইস্‌ল্ ছিল, সে কথা সে ভুলেই গিয়েছিল। হাসপাতালের সিপাই তাকে স্মরণ করিয়ে দিল, সিটী বাজাও না! তৎক্ষণাৎ নিয়মানুযায়ী এক হুইস্‌লের সঙ্গে চার দিকে হুইস্‌ল্ এবং গেটে ঘণ্টা বেজে উঠ্‌লো।

তারপর সেলব্লকের এক প্রান্ত থেকে কি সব আওয়াজ হ'ল আমরা অপর প্রান্ত থেকে বিশেষ কিছু বুঝতে পারলাম না।

হুইস্‌ল্ ও ঘণ্টা বাজা বন্ধ হওয়ার অনেকটা পরে এক জন সিপাই আমাদের সেলের দিকে এল। তাকে অ্যান্টিসেলের ভিতরে ডাকতে সে প্রথমটা তো সাহসই পায় না। অনেক ইতস্ততঃর পর চারদিক তাকিয়ে যখন ভিতরে এল, তখন তার মুখে শুনলাম, ১০নং বাবু নিজের গায়ে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁকে খুলে হাসপাতালে নিয়ে গেছে। বেঁচে আছেন কি মরে গেছেন—সে খবর ও বলতে পারলো না বা বললো না।

১০ নং সেলে থাকতেন রসিক।

আর আমি গুর্খার যে আওয়াজটি শুনেছিলাম, সেটা "সাপ" নয়, "আগ"।

ভোর পর্যন্ত পরস্পরকে ডাকাডাকি ক'রে আর বিশেষ খবরও পেলাম না। আর, ডাকাডাকির উৎসাহও ছিল না।

ভোরে খুলে দিতে শুনলাম ও দেখলাম সব—

রাত প্রায় ১২টা পর্যন্ত ৮ ও ৯ নং ঘরে প্রতুলবাবু ও গিরীনদা পরস্পরকে ডাকাডাকি করে গল্প করেছেন। একটু অসহিষ্ণু হয়ে

১০নং ঘর থেকে রসিক গিরীনদাকে ডেকে জিজ্ঞেস করেছেন, গিরীনদা, রাত যে ১২টা বাজে, আপনারা ঘুমোবেন না?

এর পর ওঁরা গুছগাছ ক'রে শুয়ে ক্রমে ঘুমিয়ে পড়েছেন। রসিক তখন খাটে মশারি ঝুলিয়ে দিয়ে খাটখানাকে ঠেলে সেলের দরজার গায়ে ঠেকিয়ে দিয়েছেন। তারপর কয়েকখানা কাপড় দিয়ে নিজের আপাদমস্তক জড়িয়েছেন। কিছু দিন ধরে হারিকেন থেকে তেল ঢেলে রেখে খাটের তলায় মগে জমিয়ে রেখেছিলেন। সেই তেল সর্বাঙ্গে ঢেলে আগুন ধরিয়ে দিয়েছেন। আগুন দেখে গুর্খাটি দরজার বাইরে থেকে টেনে মশারি ছিঁড়েছে আর হিন্দুস্থানী সিপাইকে বলেছে, যাও, চাবি লাও। আর, নিজে অ্যান্টিসেলের ভিতর চৌবাচ্চায় যে জল ছিল মগে ক'রে সেই জল নিয়েছে, আর সেলের গরাদের ফাঁক দিয়ে ছিটিয়ে আগুন নেভাতে চেষ্টা করেছে।

উপেন মুখার্জি জেলার রাতের বেলায় প্রকৃতিস্থ থাকতো না। তার উপর যখন শুনেছে, একজন ষ্টেট্ প্রিজনার গায়ে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে, তখন সে পথেই গড়িয়ে পড়েছে—তার হাতে চাবির গোছা। যতীন গুহ ডাক্তার যখন দৌড়ে ভেতরে ঢুকছিলেন, দেখেন জেলার রাস্তার পাশে প'ড়ে রয়েছে। তাঁকে দেখে উপেন মুখার্জি বলে, আপনার পায়ে পড়ি ডাক্তারবাবু, এই নিন চাবি, আমায় বাঁচান।

যতীনবাবু এসে যখন সেল খুলে খাট ঠেলে দিয়ে ঘরে ঢুকলেন, রসিক তখনও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পুড়ছেন, আগুন সিপাইর ছিটানো জলে প্রায় নিভে এসেছে। যতীনবাবু যখন তাঁর হাত ধরলেন, তখনই কেবল একটা গোঙানির শব্দ ক'রে প'ড়ে গেলেন। তাঁকে ধরাধরি ক'রে হাসপাতালে নিয়ে যায়, সেখানে কয়েক মিনিটের মধ্যেই তাঁর প্রাণবিয়োগ হয়।

আমরা ভোর বেলায় লক্ষ্য ক'রে দেখার স্থযোগ পেলাম। সেলের পিছন দিকে একেবারে উপরে যে একটি ছোট জানালা থাকে, তার ঠিক নীচে কাপড় ঝুলাবার একটি ব্রাকেট। তা'তে চারটি পেগে জামা কাপড় ঝুলছিল। যতক্ষণ ধ'রে পুড়েছেন, ততক্ষণ ধ'রে এমনই সোজা দাঁড়িয়ে ছিলেন যে, চারটি পেগের মাঝের দুটিতে ঝোলানো কাপড় পুড়ে গেছে, কিন্তু পাশের দুটির জামা কাপড় যেমনকে তেমনই রয়ে গেছে—বোঝা যায় কী শক্ত মন নিয়ে ঐ আগুনে পুড়বার যন্ত্রণাটি তিনি সয়েছেন।

পরদিন আমরা সকলে মিলে অনেক গবেষণা করলাম, কেন রসিক এই কাজ করলেন। বলতে গেলে আমরা কোনো কারণই স্থির করতে পরিনি। পূর্ণদা যা যা জানতেন, বললেন। পূর্ণদার সঙ্গে বাইরে পরিচয় ছিল এবং সে-পরিচয় ঘনিষ্ঠই।

তাঁর মতে রসিক একটি পুলিশ কর্মচারীর হত্যায় লিপ্ত ছিলেন। সেই কর্মচারীটিকে যখন গুলী করা হয় তার কোলে একটি ছেলে ছিল, সেই ছেলেটিও সেই সঙ্গে মারা যায়। রসিক নাকি পূর্ণদাকে কয়েকবার বলেছেন, সেই ছেলেটি যেন মাঝে মাঝে তাঁর চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

রসিক রাজসাহী জেলে আসবার পূর্বে ছিলেন হুগলি জেলে। সেকালের রাজবন্দীদের প্রতি খারাপ ব্যবহার করার জন্ম চারটি জেল বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিল—প্রেসিডেন্সি, রাজসাহী, ফরিদপুর ও হুগলি জেল। হুগলিতে জেলের চার কোণে চারটি সেলে রাজবন্দীদের রাখতো। প্রত্যেক সেলের সামনে খানিকটা ক'রে জায়গা চট দিয়ে ঘিরে দিয়েছিল। রাজবন্দী ওর বাইরে মুখ গলাতে পারবেন না, আর বাইরের কোনো লোকও ওর ভিতর উঁকি মারতে পারবে না।

রসিক ঐ অবস্থায় প্রায় এক বৎসর ছিলেন। পুর্ণদা বলেন, তার কিছুদিন পুর্বেও বাইরে রসিকের সঙ্গে ওঁর দেখা হয়েছে—বেশ সুস্থ, সতেজ যুবক! এখন মাথার অর্ধেকের উপর চুল পেকে গেছে। মাঝে মাঝে বেশ স্ফূর্তিতে থাকেন, মাঝে মাঝে বেজায় গম্ভীর হয়ে পড়েন।

পুর্ণদাকে রসিক বলেছেন, উপেন মুখার্জি হুগলি জেলে যাবার পর, মাঝে মাঝে রাত্রে গোপনে বে-আইনী ভাবে রসিককে সেল খুলে জেলারের বাসায় নিয়ে যেত, সেখানে ভাল খাবার খাওয়াতো। একজন পুলিশ কর্মচারী সেখানে যেত, ওঁকে নানারকম ভয় দেখাত, প্রলোভন দেখাত।

এখন রসিক আত্মহত্যা করবার পর পুর্ণদার মুখে এই সব কথা শুনে একবার আমাদের মনে সন্দেহ জাগলো, ঐ অবস্থায় পুলিশের কাছে রসিক কিছু ব'লে ফেলেছেন কি না এবং তারই অনুতাপে আত্মহত্যা করলেন কি না।

সেযুগে বিপ্লবীরা যে-শিক্ষা ও দীক্ষা পেতেন, তা'তে সেরকম হওয়া অস্বাভাবিক নয়। মুহূর্তের দুর্বলতায় অনেকে, ক্ষতি না হ'তে পারে, এমন কিছু বলেছেন, তারপর সারা জীবন নিদারুণ অনুতাপে জ্বলে' মরেছেন, অনেকে পুড়ে পুড়ে নতুন মানুষ হয়ে গড়ে' উঠেছেন, আবার অনেকে প্রতি মুহূর্তের এই যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা ক'রে জুড়িয়েছেন—এরকম দৃষ্টান্ত কম নয়।

কিন্তু ভেবে ও আলোচনা ক'রে আমরা সিদ্ধান্ত করলাম, রসিকের ক্ষেত্রে এরকম সম্ভব নয়। সে মানুষের ধরনই আলাদা। এবং রসিক এমন প্রকৃতির যে, ওরকম কিছু হ'লে তা অন্ততঃ পুর্ণদার কাছে গোপন করতেন না। যে ঘৃণা তিনি পুলিশ কর্মচারিটির ও উপেন মুখার্জির মুখের উপর প্রকাশ করেছেন ব'লে পুর্ণদাকে বলেছেন, সে কথায় সন্দেহ

প্রকাশ করবার বিন্দুমাত্র হেতু নেই। এবং তারই ফলে তাঁকে রাজসাহী জেলে এনেছে। পরবর্তী সব ঘটনা থেকেও রসিকের প্রতি তাঁর সহকর্মীরা কোনো সন্দেহ পোষণ করেন নাই।

সব দেখে শুনে আমাদের ধারণা হলো, শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণা দীর্ঘকাল সয়ে সয়ে মনটা এমনই কোমল হয়ে উঠেছিল যে সেই অবকাশে সেই পুলিশ কর্মচারীটির নিরপরাধ শিশু সন্তানের স্মৃতি ওঁকে পীড়া দিত। যে উদার, কোমল মন আমরা রসিকের ভিতর দেখেছিলাম তা'তে এই সিদ্ধান্তই স্বাভাবিক যে নিজের উপর নির্মম প্রতিশোধ নেবার এইটিই হেতু।

স্নেহলতার করুণ কাহিনী বাঙ্গালী জাতের ভুলে যাবার কথা নয়। সে ঘটনা এরই কিছুকাল আগে ঘটে। পরে আমরা জানতে পেলাম, স্নেহলতার কথা রসিক কয়েদিদের সঙ্গে পর্যন্ত আলাপ করতেন। এবং সেই উপলক্ষ্যে পুড়ে মরতে শরীরের কোন্ অংশ বিশেষ ক'রে জখম হয়—এই সব প্রশ্নও করতেন।

কি তাঁর মনে হ'ত সব অনুমান করা শক্ত। অনেক দিন গল্প করতে করতে হঠাৎ কোথাও উধাও হয়ে যেতেন। পরে দেখা যেত, ঘণ্টার পর ঘণ্টা মাঠের ভিতর চুপচাপ বসে আছেন। কোনো দিন বা একখানা চক্ নিয়ে সব ঘরের দরজায় লিখেছেন, "চালাকির দ্বারা কোনো মহৎ কাজ সাধিত হয় না।" কোনো দিন বা এমন কথা লিখেছেন যা'তে আমাদের অচ্ছুত জাতিদের প্রতি তাঁর দরদ প্রকাশ পায়।

ম্যাজিস্ট্রেট এল অনুসন্ধান করতে। কয়েক দিন আগে রসিকের বাড়ী থেকে একখানা চিঠি এসেছিল—তা'তে অর্থাভাবে বাড়ীর লোকের কষ্টের কাহিনী ছিল। আমাদের ভিতর যে দু'এক জনের

জবানবন্দী নিল, তাঁরা এই চিঠির উপরই জোর দিলেন। এটা আমরা পরামর্শ ক'রে স্থির করেছিলাম।

রাজনৈতিক বন্দীদের ব্যাপার দেখাশুনো করতো সে যুগে একজন অ্যাডিশনাল সেক্রেটারী। তখন ছিল ষ্টীফেনসন—ঝুনো সিভিলিয়ান। রসিকের আত্মহত্যার পর আমাদের এক টেলিগ্রাম গেল তাকে আসবার অনুরোধ জানিয়ে। একদিন বিকেলে তো এসে উপস্থিত। তাকে সেল দেখাতে ভিতরে ঢুকিয়ে কথায় কথায় আটকে ফেলা হ'ল—মতলব আঁটাই ছিল—সঙ্গে গিরীনদা কথা বল্‌তে বল্‌তে ভিতরে ঢুকেছেন, আমরা বাদবাকীরা দরজা জুড়ে যেন কথাই বল্‌ছি। বেশী বেগ পেতে হ'ল না—জ্যৈষ্ঠের অপরাহ্ণ, তায় রাজসাহীর সেল, অপর দিকে আহেল বিলাতী সাহেব, একটু স্থূলকায়, কলকাতায় পাখার তলায় ব'সে কাজ করে। তিন চার মিনিটের মধ্যেই রুমাল দিয়ে চোখমুখ মুছতে মুছতে হাঁপাতে সুরু করলো। বলে, দেখুন, এসব সেল তো আপনাদের জন্যে তৈরী হয়নি, হয়েছিল পাকা অপরাধীদের জন্যে!

এই কথাটি স্বীকার করার পর সেল থেকে মুক্তি দেওয়া হ'ল। সেদিন আর বেশী কথা হ'ল না, ব'লে গেল, পরদিন সকালে আসবে। অফিসে বসে রসিকের মৃত্যু সম্পর্কে সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট, জেলারের যা' যা' বলবার ছিল শুন্‌লো।

ওদের পণ ছিল, সেল ছাড়া আমাদের রাখ্‌বে না। আমরাও যে-কোনো উপায়ে হোক্, সেলে বন্ধ রাখার প্রথা রহিত করাব। আমাদের কথা, রসিকের আত্মহত্যা সম্ভব হ'ত না যদি আমরা রাত্রে এক সঙ্গে একটা ওয়ার্ডে বন্ধ থাকতাম।

পরদিন ভোর বেলা প্রায় ঘণ্টা দুই ধরে অনেক তর্ক বিতর্ক হ'ল। গিরীনদা বললেন, কেউ পালাবার চেষ্টাও করবে না—আমাদের উপর

নির্ভর ক'রে যদি আমাদের পদ্মার ধারে নিয়ে ছেড়ে দাও, আমরা আবার ফিরে আসব।

ষ্টীফেনসন প্রবোধের দিকে চেয়ে একটু হেসে জিজ্ঞেস করে, What has Probodh got to say to that? প্রবোধ একবার দালান্দা হাউজ থেকে পালিয়ে পরে আবার ধরা পড়ে এসেছেন।

প্রবোধ মুখের মতো জবাব দিলেন, Did you then depend on my honour?

ষ্টীফেনসন সব শুনে সব দেখে চলে গেল। দিন তিনেক বাদে টেলিগ্রাম এল। ব্যবস্থা হ'ল, দিনের বেলা আমাদের সেলেই কাটাতে হবে, রাত্তির বেলায় হাসপাতালের দোতলার ঘরে বন্ধ হব। ঘরখানা বেশ বড়, আর খোলা—পদ্মা অবধি দেখা যায়। আমরা তখন নয়জন ওখানে—সবাই X class, অর্থাৎ "অত্যন্ত বিপজ্জনক", একসঙ্গে পাঁচ-জনের বেশী থাকতে পাব না। ঘরখানার মাঝামাঝি দিয়ে চাটাইয়ের একটা মস্ত বড় বেড়া ক'রে দেওয়া হ'ল, তার একদিকে পাঁচজনের, অপর দিকে চারজনের থাকার ব্যবস্থা হ'ল। রাত্রে খাবার ইত্যাদি দেবার জন্যে প্রত্যেক দিকে একজন ক'রে কয়েদি থাকার ব্যবস্থা হ'ল; অবশ্য, খাবারটা একদিকেই থাকতো, আমরা বেড়াটাকে ঠেলে একসঙ্গে বসেই খেয়ে নিতাম।

বলতে গেলে রসিকের মৃত্যুর ফলেই আমাদের সেল বাস ঘুচ্‌লো। এই কথাটা আমাদের পীড়া দিত। কথাটা যেদিন খোলাখুলি আমি বল্‌লাম, গিরীনদার চোখ দুটো ছলছল্ ক'রে উঠ্‌লো, তিনি সরে গেলেন। অন্য সব জেলে কিন্তু ষ্টেট্ প্রিজনাররা শেষ পর্যন্ত (১৯২০) সেলেই কাটিয়ে গেছেন।

সেলে যতদিন ছিলাম, মনে হ'ত, কি দুঃখেরই জীবন! ওয়ার্ডে

গিয়ে সবাই এক সঙ্গে থাকতে পারাটাই সব চেয়ে কাম্য। পরের জীবনে বুঝেছি, জেলখানায় এর চেয়ে মারাত্মক ধারণা আর কিছু নেই। একটা অত্যন্ত গণ্ডীবদ্ধ সীমানার মধ্যে থেকে সারা দিন রাত একই মুখ দেখা, একই কথা শোনা, অন্য বৈচিত্র্য কিছু নেই, দায়িত্ব কিছু নেই, চিন্তাও না করলে চলে যায়—এ থেকে দাঁড়ায়, মানুষের মন কেবল পরস্পরের খুঁৎ ধরতেই লেগে যায়, পরস্পরের পার্থক্যের বোধটাই প্রবল হয়ে দেখা দেয়। সে-হিসাবে রাজসাহীতে এই যে ব্যবস্থা হ'ল, দিনের বেলায় যার যার নিজের সেলে কাটাব, রাত্তির বেলায় একসঙ্গে থাকব, জেলখানার পক্ষে এ প্রায় আদর্শ ব্যবস্থা।

ভেদবুদ্ধি তবু আমাদের জীবনকে বিষাক্ত ক'রে তুল্‌লো! এ ভেদ-বুদ্ধির মূল ছিল কিন্তু আমাদের বাইরের জীবনে, এখানে কেবল তাই ডালপালা ফুলে ফলে দেখা দিল। এখানে বাংলার বিপ্লবী দলের গোড়া পত্তনের অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত একটু আভাস অবান্তর হবে না। বলতে গেলে সিপাহী বিদ্রোহের পর থেকে বাংলায় গুপ্ত বিপ্লবী দল গ'ড়ে তুলবার চেষ্টা প্রায় কোনো সময়েই থামে নাই। এ চেষ্টায় সুরেন্দ্রনাথ, বিপিনচন্দ্র প্রভৃতি রাজনৈতিক নেতারা যা করেছেন, সে কথা বাদ দিলেও বঙ্কিম-চন্দ্র, রমেশচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, যোগেন বিদ্যাভূষণ প্রভৃতি খ্যাতনামা সাহিত্যিকরাও হাত লাগিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথরা কয়েক ভাই বোনে মিলে তাঁদের বাড়ীতেই যে গুপ্ত সমিতি প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, তারই প্রভাবে সুরেন ঠাকুর একাজে অনেক দূর এগিয়েছিলেন। চিত্তরঞ্জনও এই প্রভাবে এসে পড়েন। তবে যাঁরা বেপরোয়া ও সক্রিয়ভাবে গত শতাব্দীর শেষ ও বর্তমান শতাব্দীর প্রথম ভাগ থেকে বিপ্লবীদল গড়বার চেষ্টা করেছেন, তাঁদের মধ্যে যতীন ব্যানার্জি (স্বামী নিরলম্ব), যতীন মুখার্জি ও ব্যারিষ্টার পি. মিত্রের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

কলকাতায় অনুশীলন সমিতি প্রতিষ্ঠার পর মিত্তির সাহেব তার প্রসারের চেষ্টা করতে করতে স্বদেশী আন্দোলন এসে পড়ে। সে জোয়ারে কারও আর চেষ্টার প্রয়োজন ছিল না—বাংলার জেলায় জেলায়, পল্লীতে পল্লীতে আপনা আপনি সব সমিতি গড়ে ওঠে। তার অনেক-গুলি অনুশীলন সমিতির শাখা হয়ে যায়, অনেকগুলি পৃথক সমিতি হিসাবে চলতে থাকে। এর ভিতর বরিশালের "স্বদেশ বান্ধব" সমিতি ও ময়মনসিংএ "সুহৃদ" ও "সাধনা" সমিতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সময় মিত্তির সাহেব ঢাকায় অনুশীলন সমিতির এক শাখা গঠন করেন ও খ্যাতনামা পুলিন বিহারী দাসকে তার পরিচালক নিযুক্ত করেন। পুলিনবাবু এই কাজের ভার নিয়ে সমিতির এক গঠনতন্ত্র ও প্রতিজ্ঞাপত্র প্রণয়ন করেন এবং জেলায় জেলায় ঢাকা সমিতির শাখা প্রতিষ্ঠিত করতে থাকেন। এই গঠনতন্ত্রে ও প্রতিজ্ঞাপত্রে অপর সমিতিদের সম্পর্কে নির্দেশ ছিল যে, ছলে বলে কৌশলে তাদের বিনাশের চেষ্টা করতে হবে। এই নির্দেশে যে মনোভাবের সৃষ্টি করতো তার ফলে, অপর সমিতিগুলি যেমন পরবর্তী যুগে অনেক সময় পরস্পরের সহযোগিতায় কাজ করেছে বা পরস্পরে মিলে গেছে, এই সমিতির সভ্যদের পক্ষে তা কখনও সম্ভব হয় নাই। বরং এই সমিতির প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অনুকরণে অপর কোন কোন দলের লোকদের মধ্যেও অনেক সময় এক অশোভন ও অকারণ সংকীর্ণতা দেখা দিয়েছে।

এ দ্বন্দ্ব অল্প দিনের মধ্যে পূর্ববঙ্গে যেমন জেলায় জেলায় তীব্র হয়ে ওঠে অন্যত্র তা হয়নি। কলকাতায় বরং ঢাকা অনুশীলন সমিতির লোকরা এসে যখন একটা পৃথক সত্ত্বা বজায় রেখে চলতেন, যতীন মুখার্জি, যাদু গোপাল মুখার্জি, অতুল ঘোষ এবং আরও কেউ কেউ তখনও চেষ্টা করেছেন একযোগে চলতে। এঁরা আশা করতেন,

সাময়িক পার্থক্য মিটে যাবে—কারণ পুর্ববঙ্গের কর্মীদের থেকে এঁদের অভিজ্ঞতা ভিন্ন। বারীনবাবুরা ধরা প'ড়ে যাবার পরে তাঁদের অবশিষ্ট লোকের সঙ্গে এবং আত্মোন্নতির সঙ্গে এঁদের একটা মোটামুটি সহযোগিতা বরাবরই বজায় ছিল এবং ময়মনসিংহ, বরিশাল, ঢাকা প্রভৃতি স্থানের অপরাপর দলের সঙ্গেও অবাধ সহযোগিতা ছিল। এর পর পার্থক্যের একটা রাজনৈতিক কারণ ঘটলো যখন ভারতীয় বিপ্লবে জার্মাণীর সাহায্য পাবার সম্ভাবনা জানা গেল। সব দলকে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানানো হ'ল। সব দল একত্র হয়ে যতীন মুখার্জির নেতৃত্ব মেনে নিল। কিন্তু ঢাকা অনুশীলন দল এই প্রচেষ্টায় যোগ দিতে অস্বীকার করলো—নিজেদের পৃথক অস্তিত্বই প্রধান বিবেচনার বস্তু হয়ে দাঁড়ালো।

এর ফলে, ১৯১৪ সাল থেকে ১৯১৭-১৮ সাল পর্যন্ত ধরা প'ড়ে যাঁরা জেলে গেলেন, তাঁদের ভিতর ঢাকা অনুশীলনের লোক যাঁরা নন তাঁরাই পরস্পরকে যুগান্তরের লোক ব'লে জানতেন। এবং জেলখানাতে এঁদের প্রীতির বন্ধন আরও বাড়লো। কলকাতা অঞ্চলের যাঁরা পুর্ববঙ্গের দলের দ্বন্দ্বের খবরও রাখতেন না, তাঁরা কিন্তু জেলখানাতেও মনে করতেন, বিপ্লবী যখন সবাই, তখন দলাদলিটা সাময়িক, ও-ভুলটা এক সময়ে মুছে যাবে, আমরা সবাই একই। রাজসাহী জেলে আমাদের গিরীনদা ছিলেন এই দলের। তিনি ছিলেন "আত্মোন্নতি"র লোক। কিন্তু এই সব ছোট খাটো দলের ভেদবুদ্ধি তাঁর মনে স্থান পেত না। আর বাইরে, জার্মাণীর সাহায্যে বিপ্লব চেষ্টায় আমরা একনেতৃত্বে একযোগেই কাজ করেছি—এই জ্ঞানে আমরা পাঁচজন, গিরীনদা, পূর্ণদা, মণিদা, সুরেশ দাস ও আমি—যেন কতকটা এক পরিবারের লোকের মতোই চলতাম।

অন্যদের সঙ্গেও গোড়াতে আমাদের মোটামুটি হৃদ্যতাই ছিল। এঁরা চার জন ছিলেন ঢাকা অনুশীলনের লোক—প্রতুল গাঙ্গুলি, সতীশ পাকড়াশি, যোগেশ চাটার্জি এবং প্রবোধ দাশগুপ্ত। এঁদের ভিতর প্রতুল বাবু রাজসাহীতে আসেন সকলের পরে।

সেলবাসটা উঠে যাওয়া পর্যন্ত জেল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আমাদের একটা প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ বিবাদের ভাব ছিল। সেটা ক্রমে কেটে গিয়ে মনের চাপটা যেন অনেকটা লঘু হয়ে গেল। পড়াশুনো যে করতে চায়, তার আছে, নইলে নেই—খেয়েদেয়ে, তাস পাশা খেলে, ঘুমিয়ে দিন কাটিয়ে দিলেও কেউ কিছু বল্‌বে না। এ অবস্থায় মুখ বদ্‌লানো হিসাবে তাস পাশার পরিবর্তে পড়াশুনোও কেউ কেউ করে। তাতে মনের উপর কোনো দায়িত্বের চাপ থাকে না। অথচ মন একটা কিছু নিয়ে ছাড়া থাকতে পারে না, তাকে সেভাবে সামান্য সময়ও ছেড়ে রেখে দিলে কোথায় ঘুরে মরে তার ঠিকানা নেই। আমরা বেছে নিলাম, দুই দলে পরস্পরের কুষ্টি কাটা।

অনুশীলনের সতীশবাবু এবং প্রবোধ সর্বশেষ ধরা প'ড়ে জেলে এসেছেন। কাজেই ওঁরা চারজন যখন এক সেলে জমতেন, আমরা প্রথমটা মনে করতাম, ওঁরা বাইরের খবর বার্তা নিচ্ছেন। গুপ্তসমিতির সাধারণ নিয়মানুবর্তিতায় কাজেই আমরা সেখানে যেতাম না। কিন্তু মাসের পর মাস এই খবর নেওয়ার ব্যাপার চলতে পারে না। কিছু দিনের ভিতর দেখলাম, যোগেশ ওভাবে একঘরে আলাদা জমে থাকাটা বিশেষ পছন্দ করছেন না। জেল জীবনের প্রথমাবস্থা থেকেই ইনি একটা নতুন জীবন গড়ে তুলতে ব্যগ্র। সেই হিসাবে খানিকটা স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে চলতেন, বন্ধুদের সাহচর্যও অনেক সময় এড়িয়ে চলতেন। উনি একাকী থাকেন ব'লে আমি অনেক সময় মিশতাম। সেই

সূত্র ধরে ইনি এখন প্রস্তাব করলেন, আমার সাথে পড়াশুনো করবেন। সময় ঠিক ক'রে নিয়ে ইংরেজী, ভূগোল আর ফরাসি পড়তে সুরু করলেন। অপর তিন জনের সবার থেকে আলাদা হয়ে একত্র আলাপসালাপ সম্পর্কে মাঝে মাঝে একটা চাপা উষ্মা প্রকাশ করতেন। একটু দুঃখ ক'রে এমনও একদিন বল্‌লেন, তিনি যে পড়ার জন্যে আমার কাছে কাটাতে আরম্ভ করেছেন, তা-ও তাঁর বন্ধুরা পছন্দ করছেন না। এই বেয়াড়া সংকীর্ণতায় দেশেরও অনিষ্ট হবে, নিজেদেরও—এই ওঁর মত। আমি বলি, কিন্তু বন্ধুদের অমতে আমার সঙ্গে মেশাতে তো তোরও অনিষ্ট হবে। উনি বলেন, বয়ে গেছে, আমি মানুষের সাথে মিশব। আপনার অমত নেই তো?

আমি বলি, আমার কেন অমত থাকবে?

প্রবোধ ছিলেন ভিন্ন প্রকৃতির—উদার, সরল, গোঁয়ার, ভিতরে বিষ পোষণ করবেন, বাইরে সেটা চেপে, হেসে খেলে চলবেন, সে ক্ষমতা তাঁর ছিল না। কিন্তু জেলের আবেষ্টনে মনের সংকীর্ণতা বাড়ে। সেদিকে সর্বদা খেয়াল না রাখতে পারলে ভাল কাজেরও কদর্থ হয়। এই কদর্থ কিন্তু কোনো সময়েই প্রবোধের নিজস্ব ছিল না। কথায় কথায় ভিতরের হলাহল প্রকাশ পেয়ে গেল। এমনকি, গিরীনদা—যিনি সবার জন্যে সমানভাবে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ঝগড়া করতে সর্বদা প্রস্তুত—তাঁর উপরেও মাঝে মাঝে মেজাজ দেখিয়ে বস্‌তেন। এই মেজাজ বস্তুটি দুইজনেরই ছিল উগ্র।

ক্রমে ওদিককার প্রতিক্রিয়া আমাদের মধ্যেও বিষ ছড়ালো। ফলে, ওঁরা যখন এক ঘরে বসে আমাদের কুষ্ঠি কাটতেন আমরাও তখন আর এক ঘরে বসে ঐ কাজই করতাম। জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠ্‌ল। অভিজ্ঞতাও বাড়তে লাগলো। বুঝলাম, শিক্ষায়, সংস্কারে চারিত্রিক

ভিত্তির ব্যবধানও দাঁড়িয়েছে অনেকখানি। সমস্ত রাজনৈতিক বন্দী ও বিপ্লবী কর্মীর চরিত্রের পরিচয়ের একটা দায়িত্ব আমাদের আছে—এই বোধ থেকে অনেক সময় অনেক রকম ব্যক্তিগত ক্ষতি সহ্য ক'রে আমরা আমাদের যৌথ মান বজায় রেখে চলতে চেষ্টা করতাম—যেমন কর্তৃপক্ষের কাছে, তেম্‌নি জেলের সিপাহি কয়েদীদের কাছেও।

আগে বলেছি, আমাদের নীতি ছিল, সরকারের কাছ থেকে আদায় করব যতো পারি, সঞ্চয় করব না কিছুই। এই নীতি মেনে এবং অনেক সময় বন্ধুদের নিষেধ না মেনে যোগেশ মাঝে মাঝে আমার খোলা বাক্সে গোপনে নতুন জামা কাপড় জমা দিয়ে চলে যেতেন—আমি বাক্স খুলেই টের পেতাম, এটি কার কাজ। এসব সংগ্রহের উদ্দেশ্য পূর্বে বলেছি। প্রবোধও গোপনে দু'একবার আমার কাছে জিনিসপত্র রেখে গেছেন। কিন্তু ঐ দু'একবারই মাত্র। তাঁর উপর সতীশবাবুর শাসন ছিল কড়া। টিট্‌কারিটা চাপা রেখে জেলার পর্যন্ত একবার আমাদের গোপনে শুনিয়ে গেল, একজন তাঁর আত্মীয়ের সঙ্গে সাক্ষাতের সময় অনেক জিনিসপত্র দিয়ে দিয়েছেন, এমনকি সাধারণের ব্যবহারের জিনিস পর্যন্ত। এখবর আমরা আগেই শুনেছিলাম—যে কয়েদী সে জিনিস অফিসে বয়ে নিয়ে গিয়েছিল, তার কাছে।

কর্তৃপক্ষের কাছে যতোই আমরা চাপ্‌তে চাই, ভিতরের অবস্থা তারা জেনে ফেলে। উপেন মুখার্জি মাঝে মাঝে কিছু বই কিন্‌তো; প্রবাসী, Modern Review, Bengalee ইত্যাদি কাগজ রাখতো। কাগজগুলো আমাদের পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল, এবং বই পেতে হলে পুলিশের অনুমতি নিতে মাসের পর মাস কেটে যেত। উপেন মুখার্জি কিন্তু আমাদের খুসি রাখবার জন্যে গোপনে এগুলো দিত।

ফরিদপুর জেল থেকে পুর্ণদার সঙ্গে তার পরিচয়। তাঁর সঙ্গে 'তুমি' ব'লে কথা বলে, পুজোয় কাপড়ও দেয়। পুর্ণদাই প্রথম ওগুলো নিয়ে আসতেন, পরে আমি আনতাম। একদিন দুজনাই গেছি। তখন আমাদের দলাদলির চরম অবস্থা। শরৎবাবুর "শ্রীকান্ত" বইখানা পুর্ণদার হাতে দিয়ে উপেন মুখার্জি বলে, পুর্ণ, তোমরাই বইটা পোড়ো, প্রতুলবাবুরা পান, আমি চাইনে। তাঁরা পড়েন না, বই নষ্ট করেন।

পুর্ণদা নীরবে বইখানি ফেরত দিয়ে চলে আসছিলেন, উপেন মুখার্জি জিজ্ঞেস করে, কি হ'ল ? পুর্ণদা ধীরে ধীরে বললেন, আমরা সবাই রাজবন্দী, আমরা পড়ব, ওঁরা পড়বেন না, সে হয় না।

পরদিন উপেন মুখার্জি নিজেই বইখানা নিয়ে এসে পুর্ণদাকে ব'লে গেল, তোমরা সবাই পোড়ো।

সে পর্ব মিটে গেল। কিন্তু ভিতরে ভিতরে আমরা হাঁপিয়ে উঠেছিলাম। অল্প দিনেই এই একটা অন্ধকার নোংরা এঁদো গলির প্রান্তে ধাক্কা খেয়ে আমরা সবাই ঘুরে দাঁড়ালাম।

গিরীনদা পড়াশুনো করেছেন প্রচুর—ভারতবর্ষ, ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, জার্মাণী, আমেরিকা ইত্যাদি প্রধান প্রধান দেশের ইতিহাস সন তারিখ সমেত প্রায় কণ্ঠস্থ। এখনও রাজনীতি, সমাজবিজ্ঞান (Sociology) ইত্যাদি নিয়ে পড়াশুনো করছেন, তাই নিয়েই থাকেন। দলাদলি যখন তুমুল হয়ে উঠেছে, সব ভুলে পড়াশুনোয় ডুবে থাকতে চান, পেরে ওঠেন না, মন বসে না, জোর জোর ঘরের এদিক থেকে ওদিক পর্যন্ত পায়চারি ক'রে ফেরেন। সিগারেট ধরলেন। সিগারেট টানতে টানতে ঘোরেন। মাঝে মাঝে হঠাৎ অকারণ ঝগড়া ক'রে বসেন, হয়তো মণিদা বা পুর্ণদা—যাঁদের বেশী

ভালবাসেন,—তাঁদেরই সঙ্গে। ক্রমে মেজাজ অত্যন্ত উগ্র হয়ে ওঠে, আমরা তখন হাসি ঠাট্টায়, অন্য কথায় ভুলাতে চেষ্টা করি।

আমরাও পড়তে সুরু করলাম যে যতো সময় পারি। রাজসাহীতে সরকারী কলেজ, তার লাইব্রেরীও ভালো। সরকারের ব্যবস্থায় আমরা সেখান থেকে বই পাই। স্বনামখ্যাত শিক্ষাবিদ্ কুমুদিনী ব্যানার্জি তখন রাজসাহী কলেজের প্রিন্সিপাল। তাঁর সঙ্গে আমাদের দেখা সাক্ষাতের উপায় নেই। কিন্তু অলক্ষ্যে থেকেও তিনি আমাদের পড়াশুনোয় যে সাহায্য করেছিলেন, তার জন্যে ওখানকার সেকালের আমরা সবাই তাঁর কাছে চিরঋণে আবদ্ধ। এক একটা বিষয়ের আমরা নাম লিখে পাঠাতাম। সেই সব বিষয়ের ভাল ভাল বই বেছে এক একবারে কুড়ি পঁচিশখানা পাঠাতেন। প'ড়ে ফেরত দিলে আবার পাঠাতেন। বিশেষ বিশেষ বই এক একখানা— যা ধীরে ধীরে পড়বার জিনিস—তা সবার পড়বার জন্যে পাঁচবার সাত-বার ক'রেও আসতো।

এই সময়ে আমাদের কেউ কেউ দিনে চৌদ্দ পনের ঘণ্টা পর্যন্ত পড়তে সুরু করলেন—বিশেষতঃ সুরেশ দাস। যে সব বই আসতো, তিনি কোনো বাছবিচার করতেন না, সবই পড়বেন। **Six Systems of Hindu Philosophy** বইটা তিনি আগাগোড়া টুকে ফেললেন। **Washington Irving**এর **Life of George Washington** টেনে অনুবাদ ক'রে গেলেন।

মণিদা খুব বেছে পড়তেন। কিন্তু যা' পড়তেন, তা খুব মনোযোগ দিয়ে, এবং নোট রেখে। পূর্ণদা অত্যন্ত ধীরে পড়তেন, সারা বছরে দু'চারখানার বেশী নয়। অন্তবিধ কাজও তিনি করতেন—গোপনে সংবাদপত্রাদি সংগ্রহ করা, সারা জেলের কয়েদীদের সঙ্গে যোগাযোগ

রাখা ইত্যাদি।৵ আবার কোনো কোনো বইতে কি আছে, তার সার মর্ম অপরের কাছেও জেনে নিতেন।

যোগেশ মোটামুটি সব বই-ই পড়তেন। মান অভিমানের বালাই ছিল না। কোন্ কোন্ বই পড়া উচিত, গিরীনদাকে বা আমাকে জিজ্ঞাসা ক'রে নিতেন। যা পড়তেন, একাগ্র মনে পড়তেন। সতীশ-বাবুও খুব পড়তে সুরু করলেন। প্রথমটা ইংরেজী বুঝতে কষ্ট হ'ত। কিন্তু অসাধারণ অধ্যবসায়ে Illustrated Weekly বা অন্য কোন সাময়িক পত্রের প্রতিটি প্রবন্ধের প্রতিটি শব্দ ধরে পড়তে পড়তে এই বাধা অল্প দিনেই অতিক্রম করলেন। প্রবোধ আর সতীশবাবু প্রায় এক সঙ্গেই পড়াশুনো করতেন। প্রতুলবাবু-ও পড়তেন, কিন্তু পড়ার চেয়ে দলের চিন্তাতেই আনন্দ বেশী পেতেন।

আমার জীবনে এই সময়ে একটা প্রচণ্ড ভাঙ্গাগড়া চলছিল। তার প্রধান হেতু ছিল জীবনটাকে বুঝবার চেষ্টার ভিতর। হাঙ্গার স্ট্রাইকের পর যেন একটা নব জীবন লাভ করলাম, সঙ্গে সঙ্গে সুরু হ'ল যেন একটা revaluation of values. বাইরে কিন্তু এর বিশেষ প্রকাশ ছিল না।

গিরীনদা সাহিত্য প্রায় পড়তে চাইতেন না। আমি সাহিত্যই পড়তে চাইতাম বেশী। আলিপুর জেলে, বিশেষ ক'রে মেজদা (চন্দননগরের বসন্ত ব্যানার্জি) ও শ্রীরামপুরের জিতেন লাহিড়ির সঙ্গে থেকে বুঝে এসেছি, কলেজে পড়ে লেখাপড়া বিশেষ কিছু শিখিনি। জেলে ইতিহাস, রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজবিজ্ঞান (Sociology), দর্শন, বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্র ইত্যাদি পড়তে হবে, তখন সঙ্কল্প করেছি। কলেজে পড়বার বেলায় ও পরে হেমেনদার সঙ্গে আলিপুরে যখন ছিলাম, তখন থেকে ডারুইন-তত্ত্ব ভালো ক'রে বুঝবার একটা আগ্রহ ছিল। বিশেষজ্ঞের জ্ঞান কোনো বিষয়ে চাইনি, দুনিয়াটাকে মোটামুটি চিন্‌তেই চেয়েছি এবং

তার সাথে সম্পর্কে নিজেকেই জানতে চেয়েছি। জেলখানায় পড়তে গিয়ে দেখলাম, একটা বিষয়ের কিছু জানতে আর একটা বিষয়ের অন্ততঃ সামান্য জ্ঞান থাকা দরকার—Sociology পড়তে Anthropology কিছু না জান্‌লে চলে না, Anthropology পড়তে Biology এবং Biology পড়তে Physiologyর অ আ ক খ জানা দরকার। এম্‌নি ক'রে দু'দিনের জন্যে বিভিন্ন বিষয়ের একটা পল্লবগ্রাহিতা জুটলো।

রাজনীতি পড়তে গিয়ে যেসব বই পড়লাম—যথা, ব্লুণ্ট্‌শ্‌লি, লেকক্‌, সিজুইক, ডাইসি, উড্রো উইলসন—এখনকার দিনে সে সব কেউ পড়ে না। ইতিহাস, অর্থনীতির বেলাতেও তাই। দর্শন ছিল নিজের বিষয়। ইউরোপীয় দর্শনের ইতিহাস সম্পর্কে কলেজে যেসব বইয়ের নাম শুনেছিলাম, তারই দু'একখানা পড়লাম। একদিকে ধর্মজীবনের দিকে ঝোঁক ছিল, আর একদিকে সোসিয়ালিজমের নাম সবে শুন-ছিলাম। তাই একদিকে পড়লাম Varieties of Religious Experience পর্যন্ত, আর একদিকে বহু চেষ্টা ক'রেও Socialism সম্পর্কে Sombardtএর বই ছাড়া আর কোন বই পাওয়া গেল না। নিজের প্রাণের টানে পড়তাম শেলী, ব্রাউনিং, বায়রন প্রভৃতি। এসব ছাড়া, যোগেশ তো আমার সাথে পড়তেনই। পরে প্রবোধও ইংরেজী শিখতে চাইলেন এবং জিতেন চৌধুরি ব'লে আর একজন নতুন এলেন, তিনিও। বয়সও প্রায় একই, স্কুল কলেজের বিদ্যাও প্রায় সমান সমান। এঁদের অ্যাডিসন, মেকলে, হাক্স্‌লি্ট্‌ ইত্যাদি পড়াতে গিয়ে নিজের বিদ্যেয় কুলোত না, কখনও গিরীনদার কাছে ধার করতাম, কখনও এন্‌সাইক্লোপিডিয়া ইত্যাদি নিয়ে বেশ খাটতে হ'ত; ওঁদের কার কতোটা লাভ হ'ল জানিনে, আমার নিজের কাজ হচ্ছিল।

একটা প্রভাব ভিতরে ভিতরে কাজ করছিল—সেটা এই সময়ে

আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠ্‌লো। ১৯১৫ সালে যখন যতীনদার (যতীন্দ্রনাথ শেঠ A. B. Harv.) বাড়ীতে ছিলাম, তখন তাঁর এবং তাঁর বন্ধু (বর্তমানে যাদবপুর এনজিনিয়ারিং কলেজের) হীরালাল রায়ের সংস্পর্শে এসে বুঝেছিলাম, মনের কপাটটা এঁটে বন্ধ ক'রে রেখে পড়াশুনো করা বৃথা। দিদিমাজাতীয়দের কাছ থেকে যেসব সংস্কার চেপে বসে, সেগুলো একটু পরিষ্কার না ক'রে নিলে পড়াশুনো ক'রে পণ্ডিত হওয়া যায় হয়তো, কিন্তু মনের সংস্কৃতি এগোয় না। পণ্ডিত হবার উচ্চাশা ছিল না, আর বুক্‌নি ঝেড়ে বা বড়ো বড়ো বইয়ের নাম ব'লে প্রশংসা পাবার আগ্রহটাকে হাস্যকর মনে হ'ত। লাওয়েল আর ভড্‌ প'ড়ে আমাদের একজন যখন এক সরকারী কর্মচারীকে শুনিয়ে দিলেন আমরা বাইশটা দেশের শাসনতন্ত্রের খবর রাখি, হাসি চাপ্‌তে সেখান থেকে পালাতে হ'ল। জীবনের উপর নানাদিক থেকে নানা প্রভাব যা এসেছে, তা'তে যা-কিছু করি, যা-কিছু পড়ি সবেরই ভিতর একান্ত মনের যে-আগ্রহটা ছিল, সেটা 'হওয়া'—'করা'-ও নয়, 'পাওয়া'-ও নয়। পাওয়ার ভিতর যে-বস্তুর প্রতি আকর্ষণ ছিল, সেটা মানুষের ভালবাসা।

১৯১১ সাল থেকে মনের ভিতর একটা উচ্চাকাঙ্ক্ষা জমেছিল—রবীন্দ্রনাথ যা কিছু লিখেছেন, তার সবই পড়ব। বিপ্লবী দলে আসার পর থেকে গীতা, উপনিষদ, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, শ্রীঅরবিন্দ—এবং আর যা যা পড়েছি, তা'তে এই 'হওয়া'র দিকটাতেই মনটা ঝুঁকে পড়েছে। কিন্তু দেখলাম, এদিকে রবীন্দ্রনাথের লেখায় যতো সাহায্য পেয়েছি, ততো আর কিছুতে নয়।

ধরা পড়বার আগে বিনয় সরকার, রাধাকমল ও অজিত চক্রবর্তীর লেখা পড়তে বহু বিদেশী সাহিত্যিকের নাম কণ্ঠস্থ হয়ে যায়—যেমন, টলষ্টয়, তুর্গেনিভ্‌ ডষ্টয়েভ্‌স্কি, হুইট্‌ম্যান, ইব্‌সেন, মেটারলিঙ্ক,

আনাটোল ফ্রান্স, বার্ণার্ড শ'। এঁদের যতো বই পাই জেলে পড়ব—এ সংকল্পের সাধনায় রাজসাহীতে প্রচুর সুযোগ পেলাম। গীতা, উপনিষদ্, বিবেকানন্দ থেকে যে কথাটা জীবনের চরম ক'রে জেনেছিলাম, 'নিজেকে জান', টলষ্টয় আর ইমার্সন যেন সেইটেকে একটা নতুন রূপ দিল। তুর্গেনিভের Fathers and Sons যেন চোখের সামনে দেখিয়ে দিল আমরা কত বড় ভাঙ্গাগড়ার সাম্‌নে। এই ভাঙ্গাগড়ার সামনে নতুন মানুষ হয়ে গ'ড়ে ওঠার প্রয়োজন আছে। ইব্‌সেন আর বার্ণার্ড শ' চোখের ঠুলি ভেঙ্গে খান খান ক'রে দিল। গোর্কির নাম কুমুদিনীবাবুর জন্যেই প্রথম শুনলাম। "Three of Them" প'ড়ে মনে হ'ল, সমাজের সাম্‌নে কাঁচা মাল হিসাবে এসে পড়ে শিশু—আর সমাজের ছাঁচে প'ড়ে শিব বানর হয়ে গ'ড়ে ওঠে।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা রাজসাহী জেলের ছোট্ট মাঠখানার এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত পর্যন্ত দ্রুত পায়চারী করতাম, অথবা সবাই ঘুমিয়ে পড়লে উঠে পদ্মার দিকে চেয়ে ব'সে থাকতাম আর ভাবতাম—কি চাই—কি, করব, কি হব। এতদিন যা কিছু ভেবেছি, যা কিছু পড়েছি, হয়েছি, মানুষের দুনিয়ার সঙ্গে তার যেন সম্পর্ক ছিল কম—আমার অতীত আর কোনো দুনিয়ায়, ভবিষ্যৎ আর কোনো দুনিয়ায়,—আমি এখানে যেন বিদেশে প্রবাসে। আজ যেন সে ভুল ভাঙ্গতে থাকলো। শ্রীঅরবিন্দের 'আর্য' পড়ছি তখন—এতকাল যে অর্থে তা দেখা দেয় নি, আজ যেন সেই অর্থে ধরা দিল। এতদিনে যেন বুঝলাম—

আমি ঢালিব করুণা ধারা।
আমি ভাঙিব পাষাণ-কারা।
আমি জগত প্লাবিয়া বেড়াব গাহিয়া
আকুল পাগল পারা।

এ মন্ত্রের অর্থ কি। সমস্ত দুনিয়াটা যেন একটা নতুন অর্থে পেলাম, নতুন ক'রে সজীব হয়ে উঠলো।

হাতে-লেখা একখানা কাগজ চালাতে স্থরু করা হয়েছিল—নাম ছিল "ভাঙা কুলা"—তার ভিতর বাংলা, ইংরেজী দুই রকম লেখাই বের হ'ত। মণিদা সেটার সম্পাদক। প্রথম প্রবন্ধ লিখলাম তা'তে 'মানি না'। দ্বিতীয় প্রবন্ধ লিখিলাম "Not peace but a Sword." কার্লাইল পড়ছিলাম। কার্লাইলের ভাষার তোড় এসে পড়লো তা'তে। 'মানি না'—একথা বলতে বলিনি তখন যে, ভগবানের অস্তিত্ব মানিনে, এই কথাই বললাম, তুমি যদি বিশ্বসৃষ্টির বাইরে কিছু হও, মানুষের সুখ দুঃখের জগতের অতীত কিছু হও, তা হলে তোমায় মানিনে; মানুষের সুখ দুঃখ, স্নেহ ভালবাসা, দ্বন্দ্ব কলহ সব জড়িয়ে যদি তুমি হও, তা হলে তুমি আমার, আমি তোমার। বন্ধুরা লেখাটার খুবই প্রশংসা করলেন।

আমাদের পড়াশুনোর আর একটা দিক ছিল সেদিন। সে আজ প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর আগের কথা। আজ যা একান্ত সহজ, সাধারণ, সে দিন তা ছিল না। জাতিভেদ মানি না, স্ত্রী স্বাধীনতা চাই—এ সব কথা আজ আর বাংলার শিক্ষিত সমাজে এমন কিছু বড় কথা নয়। কিন্তু সেদিন—এমন কি যাঁরা বিপ্লবী হিসেবে জেলে গেছেন, তাঁরাও এসব কথায় আঁৎকে উঠ্তেন। এক দিকে এই। আর এক দিকে ইব্‌সেনের Doll's House, তুর্গেনিভের Fathers and Sons, মেটারলিঙ্কের Mona Vanna, ঘরে বাইরের নিখিলেশের চরিত্র। আমাদের জীবনে এবং পরস্পরের মধ্যে স্থরু হ'ল তুমুল দ্বন্দ্ব।

জাতিভেদের বিরুদ্ধে একটা সক্রিয় অভিযান আমার জীবনে স্থরু হয়েছিল চার বছর আগে দৌলতপুর কলেজে। আমার উৎসাহদাতা

ছিলেন প্রথমটা ডাঃ যুগল আঢ্য, পরে ডাঃ অমূল্য উকিল। শশীদার, অধ্যাপক মণি শেঠের ও অধ্যাপক শরৎ ঘোষেরও সমর্থন পেতাম গোঁড়ামির সেই সুরক্ষিত দুর্গে। সহপাঠী ফণি মুখার্জির খাওয়া নষ্ট করতাম রোজই স্নানের পর রান্না ঘরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে কোঁচার খুঁট গায়ে দেবার অছিলায়। তাঁর গুরুভাই প্রিন্সিপালের বকুনি খেলাম, কিন্তু ফণিকেও মেস ছাড়তে হ'ল। মোটের উপর, আমরা জেলে যাবার আগেই দৌলৎপুর কলেজে গোঁড়ামির ভিৎ নড়ে গিয়েছিল অনেকখানি।

জেলে গিয়ে দেখলাম, গিরীনদার জাতিভেদের প্রতি অবিচল নিষ্ঠা। ব্রাহ্মণ পাচক ছাড়া অন্য কেউ রাঁধতে পারতো না। জেলের আইন কানুনও গান্ধীজীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলনের পূর্ব পর্যন্ত জাতিভেদের মর্যাদা বজায় রাখতে সচেষ্ট ছিল। বন্ধুদের সমাজেও গিরীনদা স্পর্শ বাঁচিয়ে চলতেন। আমাদের ভালবাসতেন না, তা তো সত্য নয়, কিন্তু ছোঁয়াছুঁয়ি না করার গভীর তাৎপর্যে আস্থাবান। গিরীনদা সহজেই ক্ষেপে যেতেন, এবং আমরাও এ নিয়ে তাঁকে একটু আধটু উপহাস করতাম। আমি রাজসাহী জেলে যাওয়ার অল্প দিন পরে কিন্তু হঠাৎ একদিন গিরীনদা ব'লে বস্‌লেন, ভূপেনকে সাথে নিয়ে খেতে আমার বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই! ও-তো ব্রাহ্মণ! এই ব'লে সত্যি সত্যি তিনি আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে সাথে খেতে বসালেন। খেতে খেতে কিন্তু বললেন, এই প্রথম তিনি জীবনে ব্রাহ্মণ ছাড়া অপর জাতের স্পর্শে খাচ্ছেন!

কিন্তু ব্যাপারটা এখানেই থাম্‌লো না। পুর্ণদা মাংসের ভক্ত—বিশেষতঃ মুরগীর। আমাদের সেলগুলোর পেছনে ছিল একটা পাঁউরুটির কারখানা। আমাদের রান্নাঘরে তো মুরগী ঢোকবার তখন

উপায় নেই। পূর্ণদা মুরগী আনালেন এবং ঐ পাঁওরুটির কারখানায় মুসলমান পাচক তা রান্না করলো। আমরা খেলাম। গিরীনদা ছ্যা ছ্যা করলেন। মণিদার ও সুরেশবাবুর মুরগী খেতে আপত্তি নেই, কিন্তু অহিন্দু পাচকের রান্নায় আপত্তি। মণিদার ভাব কতকটা গোরার মতো—আমাদের অগণিত লোকের ভক্তিকে আমি ভক্তি করি। আর, গতানুগতিকের বিরুদ্ধে কোনোরকম প্রশ্ন সুরেশবাবুর মনে তখন পর্যন্ত জাগে নাই।

কিন্তু খাওয়াদাওয়া ছাড়া চিন্তার দ্বন্দ্বটা উগ্রতর—বিশেষতঃ নারী পুরুষের সম্পর্ক নিয়ে। আমার মোটামুটি মত: গণ্ডীর বাঁধন বেঁধে বিকৃতি আমরা কিছু কমাতে পারিনি, হয়তো বাড়িয়েছি। অবাধ মিলনে বরং সে-প্রকৃতির হাত থেকে আমরা সহজে রেহাই পাব। সব রকম স্বাধীনতারই যেমন গোড়াতে একটু বাড়াবাড়ি দেখা দেয়—এদিকেও তা হতে পারে। কিন্তু স্থায়ী মঙ্গল স্বাধীনতার মধ্যে। গিরীনদা প্রভৃতি কয়েকজন এই মতের ঘোর বিরুদ্ধে। তাঁরা সনাতনপন্থী।

ধরা পড়বার আগে ও পরে আমেরিকা প্রত্যাগত বন্ধুদের কাছে শুনেছিলাম, সেখানকার ভারতীয় বিপ্লবীদের মধ্যে হরদয়াল ও বাসুদেব ভট্টাচার্য অ্যানার্কিষ্ট হয়ে যান এবং "Free Love"-এর সমর্থক। এই গল্প এক দিন বলাতে গিরীনদা আমাকেও "Free Love"-এর সমর্থক ব'লে ঘোষণা ক'রে দিলেন।

এক একখানা বই যা পড়ি, তা নিয়ে সুতীব্র আলোচনা হয়। রাজনীতি, সমাজতত্ব, অর্থনীতির বই নিয়েও আলোচনা হয়—বুঝবার জন্য। কাজেই সেখানে ভাষা ও কণ্ঠ একটা সীমা মেনে চলে। মতামতের প্রশ্ন যখন ওঠে তখন আর ও সব সীমার বালাই থাকে না। এটা প্রায়ই ওঠে সাহিত্যের পর্যায়ের বই নিয়ে। যে সব বই নিয়ে

আমাদের সবচেয়ে উগ্র আলোচনা হয়েছে, তার ভিতর এখন এই কয়খানার নাম বেশী ক'রে মনে পড়ছে : রবীন্দ্রনাথের "গোরা" ও "ঘরে বাইরে", সরযুবালা দাশগুপ্তার "দেবোত্তর বিশ্বনাট্য", গোর্কির "Three of Them", ইবসেনের "Doll's House", বার্ণার্ড শ'র "Mrs. Warren's Profession", তুর্গেনিভের "Fathers and Sons", ও মেটারলিঙ্কের "Blue Bird"; "Mona Vanna" ও পদ্মিনীর আদর্শের বৈপরীত্য নিয়েও তর্ক হয়। আমার উপর সব চেয়ে বেশী প্রভাব বিস্তার করে Ibsen-এর "Brand". বইখানার একটা গদ্য অনুবাদ পেয়েছিলাম। পদ্য অনুবাদ পরে পড়েছি, তত ভাল লাগেনি।

আলোচনার ভিতর আমার একটা মতলব থাকতো—নিজের মতামতটা নিজের কাছে স্পষ্ট ক'রে তোলা। একটা সুবিধা ছিল। সন্ধ্যাবেলা খেতে বসে গিরীনদাকে একটা খোঁচা দিতাম। আর সুরু হয়ে যেত আলোচনা। এক একদিন সমস্ত রাত্তির ধরে আলোচনা চলতো। রাত দেড়টা দুটো আন্দাজ যদি কেউ ঘুমিয়ে পড়তো, তখন কমিটি মিটিংএর মতো এখানে দুজন ওখানে তিন জন করে বসে যেতেন। পরদিন সকালেও তর্ক চলতো। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আসার সময় হলে সব আবার পৃথক হয়ে যেতেন। তার পর স্নানের সময় চীৎকার ক'রে ক'রে; খাওয়া-দাওয়ার সময়-ও বাদ যেত না। তর্ক থামতো খাওয়া-দাওয়ার পর যখন একদল তাস বা পাশা নিয়ে বসতেন। কোনো কোনো দিন রাত্তির বেলায় নয়জনে মিলে তর্কের ঝোঁকে এমন কাণ্ড ক'রে বসতাম যে, জেলখানার সমস্ত সিপাই জমাদার নীচে এসে জমে যেত—ভাবতো বুঝি বাবুরা ঝগড়া মারামারি লাগিয়ে দিয়েছে।

এই তর্কের উগ্রতার ভিতর কিন্তু বাইরের রাজনীতির দলের বিবাদ একটু চাপা প'ড়ে রইলো। দলাদলির একটি দিক আছে। ওর সংকীর্ণতায় একবার পেয়ে বসলে নিজেদের ভিতরও তার প্রতিক্রিয়া থেকে অনেক সময় বাঁচা যায় না। অল্প দিনের ভিতরই দেখা গেল ওঁদের চারজনের ভিতর প্রতুলবাবু আর যোগেশ একদিকে, সতীশবাবু আর প্রবোধ অপর দিকে। প্রায় বাক্যালাপ বন্ধ।

এখন মতামতের গণ্ডীর বৃত্ত আর দলের গণ্ডীর বৃত্ত পরস্পরকে ছেদ ক'রে গেল! মতামতের বিবাদের মধ্যে গিরীনদা আর আমি দাঁড়িয়ে গেলাম দুই প্রতিদ্বন্দ্বী পক্ষের নেতা। আমার কথা: প্রাচীনকাল থেকে মেনে এসেছি ব'লেই কোনো কিছুকে মেনে যেতে হবে—এর কোনো মানে নেই। এতে মানুষ এবং সমাজ দুই-ই পঙ্গু হয়। প্রতিটি জিনিসকেই যুক্তি দিয়ে বিচার ক'রে দেখতে মনকে অভ্যস্ত করতে হবে, এবং যুগের পক্ষে উপযোগী হলেই তাকে গ্রহণ করা চলবে, নইলে তাকে সবলে বর্জন করতে হবে। গিরীনদার কথা: যে-যুগ থেকে কোনো জিনিস মেনে আসা হয়েছে, সে-যুগেও ভবিষ্যদ্দর্শী বিচক্ষণ লোক ছিলেন। এবং তাঁদের বিচার-বুদ্ধির সারবত্তার ফলে শত আঘাতেও আমাদের সমাজ বেঁচে রয়েছে। কাজেই এখন সেসব হঠাৎ বর্জন করার ফলে সমাজে যে উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা দেবে, তা'তে আমাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতার যুদ্ধ ব্যাহত হবে। আমি বলি, পঙ্গু মানুষ দিয়ে স্বাধীনতার যুদ্ধ চলে না। গিরীনদা বলেন, আগে দেশকে স্বাধীন ক'রে তারপর সমাজ সংস্কারের কাজে হাত দিলেই চলবে।

ব্যক্তিগতভাবে গিরীনদার আমার প্রতি স্নেহ গভীর। আমি সেটা বুঝি এবং তাঁকে ভালবাসি ও শ্রদ্ধা ক'রে চলি—যদিও তর্কের

তাষা আমাদের কারুরই উগ্রতায় কম যায় না। সুরেশবাবু স্বল্পতর যুক্তিতে, উগ্রতর ভাষায় এবং উচ্চতমকণ্ঠে গিরীনদার সমর্থক। ব্যক্তিগতভাবে তিনিও আমার প্রতি স্নেহপ্রবণ। মণিদার আমার প্রতি মমতা যতো গভীর, আমার মতামতে ততো বেশী আঘাত পান, আর ততো নীরবে গভীরভাবে চিন্তা করেন। পূর্ণদা বিচারক। তিনি দুই পক্ষের কথা শুনে শেষ রায় দেন। মণিদার অন্তর্দ্বন্দ্বে তাঁকে পূর্ণদার কাছাকাছি এনে ফেলে—যদিও রায়ের বেলায় পূর্ণদার রায় আসে প্রায়ই কতকটা আমার দিকে, আর মণিদার যায় গিরীনদার দিকে। আমি বুঝি, অন্তরের গভীরে মণিদা প্রাচীনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। খালাসের কয়েক বৎসর পরে—বোধহয় ১৯২৩ সালের ৯ই সেপ্টেম্বর—রাত্রে মণিদা আমায় তাঁর ওখানে নিয়ে গেলেন। বল্লেন, জেলখানায় তোমার কথাগুলো আমার shocking লাগতো, কিন্তু ওতে পরে আমায় চিন্তায় সাহায্য করেছে।

অপর দিকে, তর্কের ভিতর যোগেশ প্রত্যেকটি সমস্যা বুঝতে চাইতেন, তিনি ছিলেন আমার নীরব, কিন্তু গভীর সমর্থক। প্রতুলবাবু ছিলেন সবল, কিন্তু কৌশলী সমর্থক। বোলশেভিক বিপ্লব তখন চলছে, সতীশবাবু তার খুঁটিনাটি সংবাদ পড়তেন এবং উৎসাহিত হয়ে উঠতেন। সে-হিসাবে তাঁর সমর্থন আমি আশা করতাম, কিন্তু সমর্থন করা বোধ হয় সব সময় সুবিধার মনে করতেন না। প্রবোধের নিজস্ব সমর্থন যে আমার দিকে, তা আমি বুঝতাম, কিন্তু মতামত গঠন এবং প্রকাশ—উভয় ক্ষেত্রেই তাঁর উপর পার্টি ডিসিপ্লিন যেন প্রবল হয়ে চাপতো। বেচারীর অবস্থা দেখে আমার কষ্ট হ'ত। নিয়তিঃ কেন বাধ্যতে—শেষ পর্যন্ত প্রবোধকে একেবারে একা প'ড়ে যেতে হয়। সেই অবস্থায় দলের গণ্ডী উল্লঙ্ঘন না ক'রে আমি যতোটা পারি মিশতাম।

ইতিমধ্যে ১৯১৮ সালের নবেম্বর মাস এসে পড়লো। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের Armistice হয়ে গেল। খালাসের উদ্যোগপর্বে রাজসাহী থেকে কেউ কেউ স্থানান্তরিত হতে লাগলেন—এঁদের ভিতর গিরীনদা, প্রতুলবাবু, পূর্ণদা, মণিদা, সুরেশদাস একে একে চলে গেলেন। আবার নতুন আসতে লাগলেন বসন্তবাবু (মেজদা), হেমেনদা, ভূপতি মজুমদার, জিতেন চৌধুরী (নোয়াখালী—লামচর)। এঁদের কারও কারও সঙ্গে পুরোনোরা কেউ কেউ কয়েক মাস ক'রে রয়েও গেলেন। এঁদের মধ্যে মেজদা ছিলেন মধ্যপন্থী। আর, হেমেনদা যেমন ছিলেন যুক্তিপন্থীদের মধ্যে উগ্রতম, ভূপতিদা তেম্‌নি ছিলেন প্রাচীনপন্থীদের মধ্যে প্রচণ্ডতম। কাঠে কাঠে ঘষায় মাঝে মাঝে আগুন ধরে যেত।

কিন্তু হেমেনদা এসেছিলেন দার্জিলিং জেল থেকে হাঁপানিতে ভীষণ কষ্ট পেয়ে। সে-কষ্ট তাঁর এখানেও গেল না। এক এক রাত্রে দু'বার তিনবার ক'রে আড্রেনেলিন আর মর্ফিয়া ইনজেকশন নিতে হ'ত। তা সত্ত্বেও ব'সে রাত কাটাতে হ'ত। ১৯১৭ সালে আলিপুর জেলে সেই যে বিরাট পুরুষকে দেখেছি—এ যেন তাঁর ধ্বংসাবশেষ। ব্যাধি ছাড়া অন্য নির্যাতনও সয়েছেন। পুরোনো সেই আনন্দ এখনও এক একবার উঁকি ঝুঁকি মেরে যায়। রাত্রে শ্বাসকষ্টে এক একবার এমন অবস্থা হয়, মনে হয়, এখনই বুঝি দম বন্ধ হয়ে যাবে। আমি কাছে এসে দাঁড়াই। কিছু করবার নেই, শুধু দাঁড়িয়েই থাকি। উনি হাত দিয়ে ঠেলে দেন। আমি একটু ঘুরে আবার এসে দাঁড়াই। উনি ইঙ্গিতে বলেন, ঘুমোন গিয়ে। আমি ধীরে ধীরে বলি, ঘুমোতে যে পারিনে। উনি একটু ম্লান হাসি হাসেন।

জেলখানার সর্বব্যাপী একঘেয়েমির একটি গুণ এই যে ওর অধিবাসীর অন্তরের গভীরে অনুক্ষণ ওর সঙ্গীতের মতো বাজে গীতার শ্রীকৃষ্ণের কথা: "ন ত্বেবাহং জাতু নাসং……ন চৈব……" অর্থাৎ আমি ছিলাম না এমন কোনো কাল নেই। সেই আবহাওয়ায় যুগযুগের রাজবন্দীদের অন্তরের সীমাহীন দ্বন্দ্বসংঘর্ষের ইতিহাস বহন করে সেলের অজরামরবৎ দেয়ালগুলি। প্রথম জেলে ঢুকেছিলাম প্রেসিডেন্সি জেলের ইউরোপিয়ান ইয়ার্ডে। সেখানকার ৩নং সেলের ভিতরের দেয়ালে নীচের দিকে এক জায়গায় লেখা দেখলাম:

জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য
চিত্ত ভাবনাহীন

আবার তা থেকে কয়েক ইঞ্চিমাত্র দূরে পড়লাম সেই হাতের লেখা—

মা, আর যে পারি না!

নিজের অভিজ্ঞতার দিকেও চেয়ে দেখলাম—হাঙ্গার স্ট্রাইকের আড়াই মাস, তার পর আরও আড়াই মাস একলা কাটিয়েছি বিলাসপুরে। এমন তীব্র ক'রে অবিশ্যি কিছু অনুভব করিনি যাতে De Profundis-এর কবিত্ব আসে অথবা যাতে ক'রে দেওয়ালে লিখতে হয়, আর যে পারি না! তারপর নরেশদা, জ্যোতিষবাবু, রসিক সরকার—এঁদের জেল জীবনের কথা সব শুনলাম, সমস্ত চিত্র দেখলাম। মনে হ'ল এঁদের অভিজ্ঞতা ক্রূরতর ও দীর্ঘতর।

আমার দ্বন্দ্বসংঘর্ষ কিন্তু একটা ভিন্ন পথ নিল। তার রূপটি আমার চোখে স্পষ্ট ক'রে ফুটে উঠলো রাজসাহী জেলের আমার ১৬নং সেলের দেয়ালের একটি লেখাতে। কোনো ফরাসী-জানা রাজবন্দী সেখানে লিখেছেন: **Ah mon Dieu, qui est une meilleure vie?** হে মোর ভগবান উন্নততর জীবন কি? অতীত রাজনৈতিক

জীবনের শিক্ষা দীক্ষার দিকে চেয়ে এক কথায় জবাব পেলাম—নিবেদিত জীবন।

এক শ্রদ্ধেয় সহকর্মী বলেছিলেন, কাজটি আমি করেছি, জিনিসটি আমার—এই উত্তম পুরুষগুলোকে জীবনে বাদ দিয়ে চলবে। নিজেকে না ছাড়তে পারলে কিছুই ছাড়া হ'ল না। এর সঙ্গে "Brand"-এর কথাটা এসে যুক্ত হল : All or nothing—হয় সবই দেব, নয় তো কিছুই দিয়ে কাজ নেই। কিন্তু এই তো সব নয়—প্রতি মুহূর্তের জীবনের দিকে চেয়ে চলি—কত কি যে ধূলি উড়ে এসে পড়ে, উড়ে যায়—তার তো অন্ত নেই! "ছ'জনায় মিলে পথ দেখায়।"

মাঠে ঘুরি—নিজেকে নিয়ে দ্বন্দ্ব করতে করতে গতিবেগ খর হয়ে ওঠে। রাতের নিভৃত অন্ধকারে চোখ মেলে বসে নিজেকেই মারি। এক একটি দিনের শেষে তৃপ্তিতে মন ভরে আসে : নিজের পড়াশুনো ছাড়া আদর্শের চিন্তা, পথের চিন্তাতেই দিনটি কেটেছে, অসংগতি তত-টুকুই মাত্র এসেছে সমাজের সঙ্গে সংগতি রাখতে যতটুকুর প্রয়োজন।

যদি কোনোদিন তোমার আসনে
আর কাহাকেও বসাই যতনে,

—ভাবি, এ কি একটা অপরাধ? কেন? দেশকে স্বাধীন করার ব্রত নিয়েছি; দেশকে, স্বাধীনতাকে যদি তোমার আসনে বসাই যতনে, সে কি একটা অপরাধ? এরা কি তোমায় ছাড়া? আজকের এই জেলখানার জীবনে নিজকে ভবিষ্যতের লক্ষ্যে তৈরী করবার জন্তে পড়াশুনো করছি—সে কি একটা অপরাধ? নিবেদিত-জীবন যে সব বন্ধুর সঙ্গ পেয়েছি, তাদের সঙ্গের সুখ সেই সুখের স্মৃতি,—এ উপভোগ কি একটা অপরাধ? চোখ বুজে কোনো সাকার বা নিরাকার দেবতার ধ্যান—এই কি একমাত্র নিরপরাধ কাজ?

যোগসূত্রে পতঞ্জলিও বলেছেন, 'যথাভিমতধ্যানাদ্বা'—চিত্তচাঞ্চল্য নিরোধ যদি যোগের উদ্দেশ্য হয়, তা হলে যা ভালো লাগে তার ধ্যানেও সে উদ্দেশ্য সাধন চলতে পারে। যৌবনের ধর্মে শুধু ভাবি, আমার ধ্যানের আসনে যাকেই বসাই, "শূন্যমনের বৃথা উপহার" যেন কাউকেই না দিই, কোনো মুহূর্তেই না দিই। মনের উপর এমনি নজর রাখতে চেষ্টা করি।

এ আমার অন্তরতম প্রদেশের দ্বন্দ্ব। এছাড়া, বাইরের জগতের সঙ্গে ব্যবহারেরও দ্বন্দ্ব আছে। সে দিকে বাইবেলের দুটি কথার টলষ্টয়ের ব্যাখ্যা মনের উপর গভীর দাগ কাটে: (১) কাউকে বিচার কোরো না এবং (২) যেমন ব্যবহার অপরের কাছ থেকে আশা কর, অপরের প্রতিও তেমনি ব্যবহারই কোরো। শুধু তাই নয়, দুটো কথাকে মিলিয়ে একটা নিত্য দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়—অপরের যে আচরণের দরুণ, যে মনোভাবের দরুণ নিজে ব্যথা পাই, নিজের ভিতর ক্ষোভ আসে, বিরক্তি আসে, অপরের কঠোর সমালোচনা করি, নিন্দা করি, নিজের দিকে অম্‌নি নজর পড়ে, তেমনি আচরণের, মনোভাবের অংকুর, আভাস নিজের ভিতরেও আছে কি না। প্রতি কথায় কাজে যেন নিজেকে সংকুচিত মনে হয়। অথচ নিজেকে নিভু'ল মনে ক'রে চলা আর সঙ্গে সঙ্গে সব ভুল ভ্রান্তি অপরের ঘাড়ে চাপানো—মনে হয় যেন একটা অশিক্ষিত মনের ধর্ম।

এছাড়া আছে, ভবিষ্যতের রাজনীতির চিন্তার দ্বন্দ্ব। ধরা পড়বার পর থেকে কতবার কত রাজকর্মচারী ব'লে দিয়েছেন, ৩নং রেগুলেশনে যাদের ধরেছে তাদের আর কস্মিনকালে ছাড়া হবে না। এসব শুনবার পরও আমাদের গিরীনদা বলতেন, ছাড়বে না বই কি? অম্‌নি ছাড়বে? মাথায় সুপুরি রেখে খড়ম পেটা করব, খালাস আদায় ক'রে বাইরে যাব।

এসব কথা সত্ত্বেও প্রথমটা মনে হ'ত না, শীঘ্র ছাড়বে। একটা সুদূর দিনে কি রাজনীতি করব, তার একটা অসাড় চিন্তায় মনের উপর তেমন কোনো ছবি ভেসে উঠতো না, শুধু গতানুগতিকেরই চর্বিতচর্বণ ক'রে যে রাজনৈতিক কাজের চিন্তা করতাম, সে ঐ গোপন পন্থায় অস্ত্র সংগ্রহ ক'রে যুদ্ধের আয়োজন। এই চিন্তার ধারায় পরিবর্তন এনে দিল ক্রমে ১৯১৮ সালে যুদ্ধবিরতি ঘোষণা, রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির নীতি ঘোষণা, মণ্টেগু চেম্‌সফোর্ড শাসন সংস্কার নিয়ে আন্দোলন, রাওলাট বিলের বিরুদ্ধে আন্দোলন, গান্ধীজির ভারতীয় রাজনীতিতে অবতরণ, জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড ও অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তুতি। কিন্তু সে সব কথা পরে বলছি। ইতিমধ্যে জেল জীবনের দু'একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা ব'লে নিই।

পুজো এসে পড়লো। বেখেয়ালী গিরীনদার জেল জীবনের একঘেয়েমি ভাঙবার নানারকম খেয়াল ছিল। দরখাস্ত করা হ'ল গভর্ণমেণ্টের কাছে, আমরা যখন বিনাবিচারে বন্দী, আমাদের বাইরের জীবনের উৎসব আনন্দে, বিশেষতঃ ধর্মোৎসবে বাধা দেবার অধিকার সরকারের নেই। বাঙালীর জীবনের শ্রেষ্ঠ ধর্মোৎসব দুর্গা পুজা। তা করতে দিতে হবে।

আগে বলেছি, উপেন মুখার্জি কি প্রকৃতির জেলার ছিল। সে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে দিয়ে লেখাল, জেলের অফিসাররাও পুজো করবে, সেই সঙ্গে গভর্ণমেণ্ট যদি রাজবন্দীদের বাবদ একশ' দেড়শ' টাকার বরাদ্দ ক'রে দেয়, পুজোয় তাঁদের জন্যও সংকল্প করতে বাধা নেই। গভর্ণমেণ্ট অর্থাৎ ষ্টীফেনসন কিছু টাকার বরাদ্দ ক'রে, লিখে দিল, উপযুক্তমতো নিরাপত্তার ব্যবস্থা ক'রে জেলের কর্মচারীদের সঙ্গে একত্রে রাজবন্দীদের পুজো করার ব্যবস্থায় গভর্ণমেণ্টের আপত্তি নেই।

পুজোয় বিশ্বাস আমাদের আছে কারও কারও, আমার তখন আর নেই, কিন্তু উৎসব করব না কেন, আর সে উৎসব যখন বন্দীজীবনের চিরন্তন বিধিনিষেধকে উল্লঙ্ঘন করতে চলেছে ?

জেলের গেটের ঠিক বাইরে পুজোর মণ্ডপ হ'ল। আমরা যে সেখানে জেলার এবং জমাদার সিপাই পাহারায় শুধু অঞ্জলি দিতেই যাই, তা নয়। প্রায় যখন তখন বললেই গেটের সিপাই দরজা খুলে দেয়। গেটের বাইরে অবিশ্যি একজন জমাদার আর এদিকে ওদিকে দুচারজন সিপাই নজর রাখে। পুজোর দিন—সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সকালবেলা অল্প সময়ের জন্য জেলে আসে। তারপর জেলারের সঙ্গে ব্যবস্থায় আমরা বাইরে গিয়ে বসি। সহরের নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকেরা আসেন, আমরাই তাঁদের অভ্যর্থনা করি। এ যে জেলের পক্ষে কতো বড় কাণ্ড, তা জেলে যাঁরা না গেছেন, বিশেষতঃ ষ্টেট প্রিজনার না হয়ে গেছেন তাঁরা আন্দাজ করতে পারবেন না।

জেলার শাক্ত। পট্টাম্বর প'রে, শুধু পায়ে আমাদের জন্য "মায়ের প্রসাদ" নিজে বয়ে নিয়ে আসে। চক্ষু দুটি তখন তার রক্ত বর্ণ, ভাষা অসংলগ্ন। সে সময় আমাদের জন্য না করতে পারে এমন কাজ নেই। সেই অবস্থাগ্রস্ত জেলারের সঙ্গে গিরীনদা ব্যবস্থা ক'রে ফেললেন, আর অষ্টমীর দিন জেলের বারশ' কয়েদীকে আমরা লুচিমেঠাই খাওয়ালাম। কয়েদীদের খাওয়ানটা আমাদের রাজসাহীতে প্রায় নিত্যনৈমিত্তিকই ছিল, সে কথা আগে বলেছি। একসঙ্গে সবাইকে খাওয়াবার সুযোগ এই প্রথম।

কিন্তু চূড়ান্ত হ'ল নবমীর রাত্রে। সেদিন বায়স্কোপের ব্যবস্থা হয়েছে। সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট জেলার সিভিল সার্জনও সেদিন মফঃস্বলে গেছে। বিশেষতঃ ষ্টেট প্রিজনারদের সম্পর্কে দায়িত্ব সুপারিন্টেণ্ডের

অনুপস্থিতিতে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের। এদিকে জেলার ঠিক করেছে রাতের বেলা আমাদের ঘর খুলে বের ক'রে নিয়ে অফিসের একটা ঘরে বসিয়ে বায়স্কোপ দেখাবে। সে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটকে পুজোর আরতি দেখতে নেমন্তন্ন করেছে। ওদিকে তো নিজে টং হয়ে রয়েছে।

উপর-ওয়ালাদের খুসি করবার সেই সনাতন পন্থা। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ক্যাসেল পূজা মণ্ডপের বাইরে উঁকি ঝুঁকি মেরে পুজোর আয়োজনের সব কিছু দেখছে—উপেন মুখার্জি বলে, you can go in, sir. ওদিকে কিন্তু ব্রাহ্মণ ছাড়া, কায়স্থ, বৈদ্য যে সব কর্মচারী ছিল তাদের এবং তাদের বাড়ীর মেয়েদের পর্যন্ত মণ্ডপের ভিতরে ঢুকে পুজোর আয়োজন করতে দেয়নি। পীড়াপীড়িতে ক্যাসেল ঢুকতে গিয়ে যখন জুতোর ফিতে খুলছে, উপেন মুখুজ্যে তখন বলছে, you are my father, sir, you can go in with your shoes on, sir.

ক্যাসেল তো অবস্থাটা বুঝলো। সে জুতো খুলে রেখেই ভিতরে ঢুকলো।

এর পর যখন উপেন মুখার্জি আমাদের খুলে এনে বায়োস্কোপ দেখাবার অনুমতি চাইলো, ক্যাসেল দায়িত্ব নিতে সাফ্ অস্বীকার ক'রে বসলো।

বায়োস্কোপ রাত ৮ টায় হবার কথা। ১০টা অবধি স্থগিত রইলো। সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ফিরে এসে যখন জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটকে জিজ্ঞেস করলো, সে বললো, জেলারকে এমন অপ্রকৃতিস্থ দেখলাম যে আমি ভরসা পাইনি। তুমি যখন এসেছ, তুমি ব্যবস্থা করলে আমার আপত্তি নেই।

আরও কৌতুককর একটা উৎসবের কাহিনী বলি। সে ভূপতিদার একমাত্র পুত্র মিন্টুর সঙ্গে যোগেশের একমাত্র কন্যা ধলির বিবাহ উৎসব। সদব্রাহ্মণ মেজদা এতখানি সমাজ সংস্কারের পক্ষপাতী যে

তিনি এই অসবর্ণ বিবাহে পৌরহিত্য করতে রাজী হলেন : পাত্র হুগলি গুপ্তিপাড়ার বৈদ্য, আর পাত্রী বিক্রমপুরের ব্রাহ্মণ বংশীয়া। জেলের দর্জিখানার তৈরী বিচিত্র সাজে সজ্জিত বর আর কনে ফুলসাজে সাজানো দুই ডুলিতে চার কয়েদীর কাঁধে চেপেছে। আর চার কয়েদীর গলায় ঝুলানো চার কানিস্তারা। শালপ্রাংশু হেমেনদা বিবাহের শোভাযাত্রার অগ্রগামী, আমরা সব পেছনে। কানিস্তারার আওয়াজে যে যেখানে পেরেছে কয়েদী সিপাইরাও জমে নাতিদীর্ঘ শোভাযাত্রা বিপুল গভীর মধুর (!) মন্দ্রে জেলের বুক কাঁপিয়ে আর আফিসে চমক লাগিয়ে চলেছে। কিন্তু মুস্কিল হ'ল বর আর কনেকে নিয়ে। যেমন পোষাকেপত্রে, তেমনি বাদ্যসমারোহে তাদের অবস্থা এমনি দাঁড়িয়েছে যে এক একজনে আর তাদের স্বস্থানে চেপে রাখা চলছে না, ম্যাঁও ম্যাঁও ডেকে আঁচড়ে কামড়ে যেমন ক'রে পারে লাফিয়ে পড়বার জন্যে প্রাণপণ করছে। যাই হোক বিবাহ সুসম্পন্ন হয়ে গেল এবং সন্ধ্যায় বন্ধ হবার আগে পাড়ার কয়েদীদের প্রতি ইতর জনের মতো ব্যবহার করা হ'ল।

আর একটি ঘটনা অন্য ধরনের। রাজসাহী জেলের বিভিন্ন ইয়ার্ডে সাত আটজন রাজনৈতিক কয়েদী ছিলেন। আমরা গোপনে এঁদের খোঁজখবর রাখতাম, এবং প্রয়োজনমতো খাদ্য এবং অন্য জিনিসপত্র দিতাম। কাণাঘুষো একটা খবর শুনলাম, এঁদের ভিতর একজন পালাবার চেষ্টায় বাইরে কাউকে চিঠি লিখেছিলেন সেটা ধরা পড়েছে। হঠাৎ দেখা গেল এঁদের অনেককে যাঁর যাঁর ইয়ার্ড থেকে সরিয়ে ফেলা হ'ল, এবং এঁরা যেসব "বিশেষ সুযোগ" পেতেন, তা বন্ধ ক'রে দেওয়া হ'ল। বিশেষ সুযোগের মধ্যে তো বোধ হয় পেতেন একটু পরিষ্কার ধরনের ভাত আর তরকারি। জাঙ্গিয়ার বদলে একটু লম্বা পায়জামা।

আর খাটনি এঁরা করতেন নামমাত্র। তাছাড়া, এঁদের ভিতর তিন চারজন একসঙ্গে থাকতেন, তাঁদের নিয়ে "জালডিগ্রি"তে আলাদা আলাদা বন্ধ করতে সুরু করলো। "জালডিগ্রি" মানে একটা মানুষ যতোটা লম্বা, তার চেয়ে ফুটখানেক লম্বা, এবং মোট গজখানেক চওড়া এক একটা জায়গাকে লোহার শিক এবং তার দিয়ে ঘিরে এক একটা খাঁচার মতো ক'রে তৈরী আস্তানা—তার ভিতর পাশাপাশি চল্লিশ পঞ্চাশ জনকে রাত্তির বেলায় বন্ধ করে। এদের অধিকাংশই সাধারণ দাগী কয়েদী। তাদের সঙ্গে পাশাপাশি বন্ধ হওয়াটা রাজনৈতিক বন্দীদের পক্ষে বিশেষ আপত্তিজনক।

এঁরা আমাদের খবর পাঠিয়ে অনশন করতে সুরু করলেন। সঙ্গে সঙ্গে আমরা খবর পেলাম, লম্বা পায়জামা ছাড়াতে গিয়ে জমাদার এঁদের কারও কারও প্রতি অপমানসূচক ভাষাও ব্যবহার করেছে। শুনে আমরা জেলারকে ডেকে পাঠালাম। জেলার বুঝলো, আমরা সব জেনেছি। সে এল না।

আমরা তখন সুপারিন্টেণ্ডেণ্টকে লিখে পাঠালাম, রাজনৈতিক বন্দীদের প্রতি অন্যায় আচরণের প্রতিবাদে আমরাও অনশন সুরু করেছি।

জেলার বুঝলো, ব্যাপারটা সুবিধের দাঁড়াচ্ছে না। যে রাজনৈতিক বন্দীটির পলায়ন চেষ্টা নিয়ে এই সব ঘটছে, পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগে, তাঁকে গোপনে অন্য জেলে সরিয়ে দিল। পরদিন অন্যান্য বন্দীদের যাঁর যাঁর জায়গায় ফিরিয়ে নিয়ে এল এবং কাপড় ইত্যাদি যেমন ছিল, তেমনই সব দিয়ে দিল। কিন্তু হয়তো আমাদের জব্দ করার মতলবে, আমাদের কোনো খবর জানালো না।

আমরা খবর পেয়েছি। কিন্তু হাঙ্গার স্ট্রাইকের নোটিশ দিয়ে

হাঙ্গার স্ট্রাইক করেছি, খবর যতক্ষণ ওদের কাছ থেকে না আসছে, আমরা তো ততক্ষণ খেতে পারিনে। এই ভাবেই দিনটি কাটলো।

পরদিন সকালবেলা উপেন মুখার্জি এসে গিরীনদার ঘরে ঢুকলো। গিরীনদা ধমকে উঠতেই ওতো গিরীনদার হাত জড়িয়ে ধরলো। গিরীনদা অমনি নরম হয়ে গেলেন। আমি চীৎকার ক'রে গাল পাড়তে পাড়তে গিরীনদার ঘরে ঢুকেই ঐ অবস্থাটা দেখে থেমে গেলাম। এর পর যোগেশ দরজায় পৌছে গাল দিতে স্থরু করেছেন। গিরীনদা বললেন, যোগেশ, উনি ক্ষমা চেয়েছেন। যোগেশ থেমে গেলেন। কিন্তু ভূপতিদা ততক্ষণে এসে পৌছে গেলেন। গিরীনদা আর কয়জনকে থামান? ভূপতিদা বলতে স্থরু করেছেন, গিরীনদা, আপনি ঐ ছোট লোকটার সাথে কথা বলছেন? **He should be first kicked at, then talked to.**

গিরীনদা বলছেন, থাম, ভূপতি।

উপেন মুখুজ্যে মৃদু হেসে বলে, ছেলে মানুষ, একটু বকতে দিন গিরীনবাবু।

ভূপতিদা বাইরে থেকে ফেটে পড়লেন: **"No, I am not a child, I'm 28, and I have seen much of the world, much more than you have.**

এর পর প্রবোধ, সতীশবাবু সবাই পৌছে পাইকারী গালাগালি চালালেন। গিরীনদা তখন বেরিয়ে এসে সবাইকে শান্ত ক'রে উপেন মুখার্জিকে বিদায় করলেন।

আর একটি ঘটনা। ১৯২০ সালের গোড়ার দিক। গিরীনদারা তখন চলে গেছেন। ঝগড়াঝাটির আর দরখাস্ত লেখার পালা তখন আমার। ইতিমধ্যে নতুন নতুন ষ্টেট প্রিজনার সব অন্যান্য জেল থেকে

এসেছেন। তার ভিতর অন্তরীণ আইন ভেঙে জলপাইগুড়ি জেলে মেয়াদ খেটে নতুন ষ্টেট প্রিজনার হয়ে এলেন ক্ষেত্র সেন (চট্টগ্রাম), আলিপুর থেকে এলেন চারু, মেদিনীপুর থেকে শরৎ গুহ (ফরিদপুর), ঢাকা থেকে কুন্তল ও নরেন ব্যানার্জি (ফরিদপুর) এবং হাজারিবাগ থেকে মনোরঞ্জন গুপ্ত ও রবি সেন এলেন। মোট আমাদের সংখ্যা দাঁড়ালো বারো। কিন্তু সে কথা পরে।

ক্যাসেল চলে গেছে, নতুন জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট হয়ে এসেছে দার্জিলিং জলপাইগুড়ির চা বাগান অঞ্চলের কোনো মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট। নাম টর্ক, চেহারায়ও তাই। ক্যাসেল মাসিক পরিদর্শনে আসতো—কখনও আমরাও আগে গুডমর্নিং বলতাম, কখনও সে-ই বলতো। আমি তখন ১৬নং ছেড়ে ৭নং সেলে এসেছি, অর্থাৎ আমার সেলটাই ইয়ার্ডের মধ্যে প্রথম। আমি সেল থেকে বেরিয়ে বল্লাম Good morning. দেখলাম, কারও সম্ভাষণের জবাব না দিয়ে সোজা ইয়ার্ডের মাঝামাঝি একটা সেলের সাম্নে গিয়ে দাঁড়ালো। ততক্ষণে সবাই এসে জমেছে। ও একটা ফাইল বের ক'রে বলে, চিঠি সেন্সর করা নিয়ে পুলিশের বিরুদ্ধে আমি কয়খানা দরখাস্ত পেয়েছি। তার ভিতর এই একখানায় ভাষা রয়েছে "indiscriminate interdiction of letters" আর "unconscionable delay"—এটা কার দরখাস্ত? যোগেশ বলেন, আমার। কে এর মুশাবিদা ক'রে দিয়েছে? যোগেশ বলেন, তা দিয়ে তোমার কাজ কি? আমার সই রয়েছে, আমার দরখাস্ত।

টর্ক বলে, পুলিশের বিরুদ্ধে এই রকম ভাষা যদি ব্যবহার কর, তোমাদের দরখাস্ত বিবেচনা তো করাই হবে না, পড়াও হবে না।

আমি গুরুগম্ভীরভাবে জিজ্ঞেস করি, এমন কোনো আইন আছে?

আইনের কথা শুনেই পেছন ফিরে রওনা হ'ল। তখন যতো রকমের বচন আমাদের যার মুখে এল ঢিল ছোঁড়ার মতো ক'রে পেছন থেকে ছুঁড়ে মারা হ'ল। ও আর ফিরে দাঁড়িয়ে জবাব দিল না।

বচন শুধু মৌখিকই হ'ল না—পাতাতিনেক তখনই লিখে ভারত সরকারের বরাবর পাঠান হ'ল। বিকেলে জেলার এসে অনুরোধ জানায়, দরখাস্তখানা ফেরত নিন।

আমি বলি, ম্যাজিষ্ট্রেট ক্ষমা চেয়ে চিঠি লিখুক।

এর পর থেকে পাঁচ মাস পর্যন্ত আর জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের দর্শন নেই। অথচ আইনে বলে, জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট প্রতি মাসে একবার ক'রে ষ্টেট প্রিজনারদের দেখতে আসবে।

ষ্টর্ক বদলি হয়ে গেল। তার জায়গায় জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট হয়ে এল পরবর্তীযুগের স্বনামখ্যাত সিভিলিয়ান রীড্ সাহেব। আবার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের পরিদর্শন স্বরু হ'ল।

অপর একটি ঘটনা স্থপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে নিয়ে। অ্যাশ সাহেব তখন বদলি হয়ে গেছে। তার জায়গায় এল মেজর গয়েল। পাঞ্জাবী। পরে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ও বাংলা সরকারের সার্জন জেনারেল হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ এক জায়গায় বলেছেন, বউ হয়ে যে যত মার খায়, শাশুড়ী হয়ে সে ততো মারে। এই লোকটি তার একটি দৃষ্টান্তস্থল। উচ্চতর পদের কর্মচারীদের কাছে ধমক খেলে যতখানি কেঁচো হয়ে থাকত, নিজের অধীনস্থ কর্মচারীদের প্রতি ততো অন্যায় জুলুম করতো। রাজসাহীতে এসেই কয়েদীদের প্রতি শাসন কড়া ক'রে তুললো। জেলে জেলার বংশের সঙ্গে ডাক্তারদের ঝগড়া চিরন্তন। গয়েল নিজে ডাক্তার হয়েও জেলারের কথায় ডাক্তারদের সঙ্গে অকারণ ঝকাঝকি করতো।

রাজসাহীতে প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় জিনিস আমরা কি পরিমাণ পেতাম আগে বলেছি। গয়েল এসে কিছুদিন বাদে জেলারকে দিয়ে ব'লে পাঠাল, নতুন কাপড়জামা পেতে হলে পুরানো কাপড়জামা ফেরত দিতে হবে।

আমি বলি, দেব না।

জেলার পুনরায় এসে বলে, একটা পাত্র রেখে দেওয়া হবে, ছেঁড়া জামা জুতো তার ভিতর ফেলবেন।

আমি বলি, যেখানে খুসি ফেল্‌ব।

আর কোনো উচ্চবাচ্য শোনা গেল না।

আমরা ওখানে যারা দু'বছর আড়াই বছর যাবত আছি, তাদের এক একজনের দুটো তিনটে ক'রে কাঁঠাল কাঠের বাক্স হয়েছে। এবং সঙ্গে সঙ্গে সেগুলোর জন্যে জেলে তৈরী চৌকিদারী কাপড়ের একটা একটা ক'রে ঘেরাটোপ হয়েছে। এখন নতুন যাঁরা এলেন, তাঁদের মধ্যে একজন কেউ এক সঙ্গে তিনটি ঘেরাটোপের অর্ডার দিয়েছেন।

একটা খাতায় প্রতিদিন আমাদের প্রয়োজনীয় জিনিসের ফর্দ যেত, সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সই ক'রে দিলে জিনিসগুলো আমাদের কিনে বা তৈরী ক'রে দেওয়া হ'ত। গয়েল তো তিনটি ঘেরাটোপের অর্ডার এক সঙ্গে দেখে কেটে দিয়েছে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ভারত গভর্ণমেণ্টের কাছে পাঁচ পাতা দরখাস্ত—তাতে সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের রাজসাহী জেলে যতোরকম অন্যায় জুলুমের কাহিনী।

আবার জেলারের দৌত্য। অনেক ধরাধরির পর খাতায় লিখে দিলাম, সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট কোনো জিনিস না দিতে পারে, কিন্তু খাতায় কিছু কাটতে পারবে না। কোনো দাবী অন্যায় ব'লে মনে হলে

আমাদের ডেকে আলোচনা করবে। সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট লিখে দিল, "Agreed." দরখাস্ত ফেরত নেওয়া হ'ল। এর পর যে কয়মাস রাজসাহীতে ছিলাম, গয়েল সাহেবের সাথে আমাদের ভালই কাটে।

ইংরেজীতে একটি কথা আছে 'brass'—বাংলায় কি বলব 'ঠ্যাটামি?' অনেক বছরের অভিজ্ঞতায় বুঝেছি, বিনাবিচারে বন্দী হয়ে থাকতে গেলে ওর খানিকটা না হলে কর্তারা কাদার তলায় ঠেসে রাখতে চান—ন্যায় যুক্তির উপরে মাথা তুলে না রাখলে, ন্যায়-যুক্তির তলায়ও ওর স্থান হয় না, কারণ বিনাবিচারে বন্দী ক'রে রাখার ব্যাপারটাই ন্যায়যুক্তির সীমার বাইরের ব্যাপার। সেটাকে মনে মনে যে মেনে নিয়েছে, কর্তারা তাকে দিয়ে অনেক কিছুই মানিয়ে নেন। সে কথা স্পষ্ট হবে ১৯৪১ সাল থেকে ১৯৪৬ সাল পর্য্যন্ত আমাদের বন্দীজীবনের কাহিনী যখন বলব।

আর সব ছোট খাটো ঘটনার উল্লেখে কাজ নেই। এখন এসে পড়লো আমাদের রাজনৈতিক চিন্তার জগতে দ্বন্দ্বের দিন।

একটা ধারণা আমাদের অনেকে পোষণ করতেন, দেশ যখন একেবারে শান্ত হবে, আমরা যদি খালাস হই, তখন হতে পারি। কিন্তু কার্যত দেখা গেল, ঠিক উল্টো। ধরপাকড় যখন চলেছিল, দেশ তখন ক্রমেই ঝিমিয়ে পড়ছিল। এরই যেন সীমারেখা টেনে দিল অ্যানি বেশান্তের ধরা পড়ায়। আবার মরা দেশে সাড়া জাগ্‌লো। থার্মোমিটারে পারা দ্রুত উপরের দিকে উঠতে রইলো। বাংলার রাজবন্দীদের প্রতি অত্যাচারের প্রতিবাদ করতে গিয়ে শেষ পর্য্যন্ত বৃদ্ধ নেতা সুব্রহ্মণ্য আয়ারের 'সার' উপাধি ছাড়তে হ'ল। মণ্টেগু মনে করেছিলেন দো-আঁসলা ধরনের কিছু শাসন সংস্কার দিয়ে

দেশকে ঠাণ্ডা ক'রে ফেলবেন। ফল উল্টো ফল্‌লো। নরম-পন্থী কংগ্রেস গরম হয়ে উঠলো, শাসন সংস্কার গ্রহণে আপত্তি জানালো।

কিন্তু আগুন জ্বল্‌লো রাওলাট আইনের প্রস্তাবে। যুগান্তর বিপ্লবীদলের নেতৃত্বে ভারত-জার্মাণ ষড়যন্ত্র আর কোনো রকমে ফলপ্রসূ না হোক, গান্ধীজিকে ভারতের রাজনীতিতে নামালো। রাওলাট আইনের বিরুদ্ধে তাঁর সত্যাগ্রহ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে জালিয়ানওয়ালা-বাগের হত্যাকাণ্ড হয়ে গেল। সহস্র বৎসরের ঘুমন্ত দেশের চেহারা ফিরে গেল।

এই উতলপাতলের মধ্যেই রাজনৈতিক বন্দী ও রাজবন্দীদের মুক্তি দ্রুত হতে লাগল। আজ না হয় দু'দিন বাদে খালাস হবই। কি করব তখন বাইরে গিয়ে?

চারু এলেন আলিপুর জেল থেকে। ব্যক্তিগত জীবনের সুতীব্র দ্বন্দ্ব সংঘর্ষের ঝঞ্ঝা বয়ে গেছে দু'বছরের জেলের জীবনে। অন্তরের তলা অবধি কপোতাক্ষের জলের তলদেশের মতো স্পষ্ট। প্রীতিস্নেহ কোথাও যেন কোনো সীমারেখা মানতে চায় না। এরই সঙ্গে নিজেকে গড়ে তুলবার আগ্রহ বেদনা এক মুহূর্তও অসাড় হতে জানে না। আদর্শের কাছে আত্মনিবেদন কবে কোন্ মুহূর্তে স্তিমিত হয়েছে, তারই জন্য ক্ষমাহীন আঘাতের পর আঘাতে দেখি, অমন সদা উদ্দাম, চঞ্চল, সহাস্য মূর্তিটিকে মুষড়ে তুলেছেন।

বলি, কিচ্ছু হয় নি।

যুগপৎ কান্নাহাসিতে মমতা ফুটে ওঠে। প্রশ্ন করেন, কি করব বাইরে গিয়ে?

কুন্তল এলেন ঢাকা জেল থেকে। এখানকার অবস্থা ছিল রাজসাহী জেলের গোড়ার দিকের চেয়ে বরং খারাপ ছাড়া ভাল নয়। তীক্ষ্ণ

বুদ্ধি আর গভীর অনুভূতির অপরূপ সামঞ্জস্যে গড়া এ মানুষটিও জেল জীবনে অন্তরের দ্বন্দ্ব সংঘর্ষ থেকে অব্যাহতি পান নাই। অব্যাহতি পান নাই, শুধু তাই নয়, ক্ষতবিক্ষত হয়েছেন। রামানন্দ স্বামীর কথার অনুকরণে বলা চলে, যে মানুষ যতো গভীর, দ্বন্দ্ব সংঘর্ষ জেলের জীবনে তার ততো বেশী। কিন্তু আপনাকে ভুলে থাকার প্রকৃতি, প্রবৃত্তি কুন্তলের এমন মেদমজ্জায় জড়িত যে নিজেকে খুলে ধরলেন আস্তে ধীরে। তার আগেই প্রশ্ন ক'রে বসলেন, কি করব বাইরে গিয়ে ?

পড়াশুনো করার সুযোগ চারু অনেকখানি পেয়েছেন আগে হাজারিবাগ জেলে। ঢাকা জেলের অবস্থা ছিল সম্পূর্ণ পৃথক। কুন্তলের পড়াশুনো করার ক্ষমতা ছিল আমাদের অনেকের চাইতে বেশী। আগ্রহ দুজনারই সমান। রাজসাহী কলেজ থেকে বই আনিয়ে পড়তে সুরু করলেন। সারাদিন পড়াশুনো করেন। রাত্রে ঘরের এক কোণে পাটি বিছিয়ে তিনটি মাথা এক জায়গায় ক'রে ভবিষ্যতের কর্মপন্থা নিয়ে আলোচনা করি—রাত দুটো বাজে, তিনটে বাজে।

সুধুমাত্র গুপ্ত সমিতির আয়োজনে একটা দেশে বিপ্লব হয় না। জনসাধারণের ভিতর কাজ করা চাই। কি কাজ ? কি ভাবে করব ? কংগ্রেসে যোগ দেব ? কংগ্রেসের বিরুদ্ধে একটা সংস্কার ছিল। তার কারণ, আগেকার দিনে যে-কংগ্রেসকে আমরা চিনতাম, সে তো শুধু প্রস্তাব পাশ করার একটা সংঘ।

কিন্তু কংগ্রেস নতুন রূপ নিচ্ছে গান্ধীজির নেতৃত্বে। এখন শুধু প্রস্তাব পাশ করা নয়, কাজ করা, সে কাজ বিদেশী সরকারকে আঘাত হানার কাজ এবং দেশের জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ ক'রে।

কুন্তল চক্রবর্ত্তী

ইঙ্গিতটা আমাদের কাছে আরও স্পষ্ট হ'ল আমাদের দলের সত্যেন মিত্র প্রভৃতি মুক্তি পেয়ে যখন কংগ্রেসে যোগ দিলেন।

কিন্তু আমরা তিন জনতো দলের সব নই, অত্যন্ত ক্ষুদ্র একটি অংশ মাত্র। অন্যত্র আর সবাই কি ভাবছেন কে জানে?

সমস্যার অনেকটা সমাধান হ'ল ইতিমধ্যে মনোরঞ্জনদা যখন এসে পড়লেন হাজারিবাগ জেল থেকে। সেখানে সুরেন ঘোষ, অরুণ গুহ, সাতকড়ি ব্যানার্জি প্রভৃতি দলের প্রধান প্রধান কর্মী আর যাঁরা ছিলেন তাঁরা একটি মোটামুটি সিদ্ধান্তে এসেছেন। দেখা গেল, চিন্তার ধারা তাঁদের আমাদের এক। সিদ্ধান্তও একই। তবে সেখানে তাঁরা একটা চলবার পথের ইঙ্গিত দিতে পেরেছেন, এখানেও আমাদের কাছে মনোরঞ্জনদা সেটা স্পষ্ট ক'রে তুললেন।

রাজনৈতিক আন্দোলনের স্তরে স্তরে আমাদের জীবন পথ খুঁজেছে। এই তার সুরু। আনন্দ পেলাম এই ভেবে যে, আমাদের যাঁরা যাঁরা বিভিন্ন স্থানে ছিলেন, তাঁরা পথের সব দ্বন্দ্বের পরে মোটামুটি একই সমাধানে পৌচেছেন।

সমস্যা তখনও রইলো দুটি: প্রথম—গান্ধীজির অহিংসা। কিন্তু এ বাধা দুরতিক্রম্য ব'লে কারও মনে হয় নাই। কারণ জেলে চিন্তার বিকাশের যে সুযোগ জুটেছিল তাতে বুঝলাম, বিপ্লবের প্রথম ও প্রধান শক্তি জাগ্রত জনগণের স্বাধীন হবার মরিয়া আগ্রহ, অস্ত্র নয়। যে-জাতের (সেদিন পর্য্যন্ত) সেই আগ্রহই জাগে নাই, সে অস্ত্র পেয়েই বা কি করবে? তাছাড়া, জাতকে জাগাবার কালে, একথা প্রচার ক'রে বেড়ান চলে না যে, জাগ্রত জাত অস্ত্র সংগ্রহ ক'রে স্বাধীনতার যুদ্ধ ঘোষণা করবে। অহিংসাকে তাই আমরা নীতি বা policy হিসাবে গ্রহণ করি, গান্ধীজির মতো ধর্ম হিসাবে নয়।

দ্বিতীয় বাধা, জেলে আমরা যারা ছিলাম, তারাই দলের সব নয়। যতীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর যাঁরা দলের নেতৃস্থানীয় হয়ে দাঁড়ালেন, যথা, যাদুগোপাল মুখার্জি, অমরেন্দ্র চাটার্জি, অতুল ঘোষ, সতীশ চক্রবর্তী, নলিনী কর—এঁরা তখনও পলাতক। তাঁদের সঙ্গে আলোচনা না ক'রে দলের নীতি চূড়ান্তভাবে গৃহীত হতে পারে না। কিন্তু এ বাধাও সাময়িক। খালাস হয়ে গেলে এঁদের সঙ্গে দেখা ক'রে সিদ্ধান্ত পাকা করা শক্ত হবে না।

অনুশীলনের সঙ্গে পার্থক্য আমাদের এইবারে পাকা হয়ে দাঁড়ালো। তাঁরা হয়তো গোপনে অস্ত্র সংগ্রহ ক'রে সমরায়োজনের উপায়ই তখনও ভাবছেন। কাজেই তাঁদের কাছে অর্থের সমস্যাই প্রথম ও প্রধান সমস্যা। তাঁরা ভিন্ন পথ ধরলেন।

অপ্রীতিকর তুচ্ছ ঘটনা রাজসাহীর জেল জীবনে অনেক ঘটেছে। কিন্তু পড়াশুনো আর আত্মদ্বন্দ্বের মধ্যে পড়ে সেগুলোকে আমরা উপেক্ষা ক'রে চলেছি। ইতিমধ্যে প্রতুলবাবু খালাসের আগে অন্যত্র বদলি হয়ে গেছেন। পরে মনোরঞ্জনদার সঙ্গে এলেন রবি সেন। দু'জনে একটা হৃদ্যতা হয়েছিল হাজারিবাগ জেলে। সেখানে ৬৪ দিনের হাঙ্গার স্ট্রাইকের কালে একই সেল ব্লকে ছিলেন আমাদের মনোরঞ্জনদা ও অরুণদা এবং অনুশীলনের রবিবাবু ও নরেন ভট্টাচার্য (রাজসাহী)। ওখানকার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট উইলসন এঁদের চারজনকে ঠাউরেছিল হাঙ্গার স্ট্রাইকের নেতা। তাই জোর ক'রে নল চালিয়ে খাওয়াতে এসে এঁদের ঘুষিঘাষি মারতো, এবং প্রতিদানে জোড়াপায়ের লাথিও খেয়ে যেত।

এই সবের ফলে রবিবাবু সব ব্যাপারে মনোরঞ্জনদার পরামর্শ নিতেন এবং মনোরঞ্জনদাও রবিবাবুকে না জানিয়ে কিছু করতেন না।

রবিবাবুর সংস্পর্শে সতীশবাবুর ভিতর আশ্চর্য পরিবর্তন দেখা দিল, প্রবোধ তো দলাদলিতে কোনো সময়েই রস পেতেন না। অনুশীলনের আর একজন নতুন এসেছিলেন ঢাকা জেল থেকে, নরেন ব্যানার্জি। জেল জীবনের অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে তাঁর ভিতর এসে পড়েছিল এক সর্বব্যাপী ঔদাসীন্য। জেলের এই অর্ধসন্ন্যাসী খালাসের পর পাবনার "সৎসঙ্গে" যোগ দিয়ে পাকা সন্ন্যাসীই হয়ে যান।

ব্যক্তিগত জীবনে আমরা শান্তি পেলাম এবং সে শান্তি খালাসের দিন পর্যন্তই বজায় ছিল। কিন্তু রাজনৈতিক জীবনের পার্থক্য বরং গভীর হবার আশংকা দিন দিন বেড়ে চললো।

গোপনে তখন আমরা অমৃত বাজার, বেঙ্গলী প্রভৃতি সব রকম কাগজই পাই। তা'তে দেখি, ওদিকে আন্দামান থেকে বারীনবাবু, পুলিনবাবু প্রভৃতি খালাস হয়ে এলেন, এদিকে জেল ও অন্তরীণ থেকে শত শত বন্ধুরাও মুক্তি পাচ্ছেন। এর ভিতর লক্ষ্য করছি, অনেকের থাকবার আশ্রয় নেই, জীবিকার উপায় নেই। তা নিয়ে আলোচনা আন্দোলনও চলছে। দেশের নেতারাও কারও কারও উপায়ের জন্য উদ্যোগী হয়েছেন।

গভর্ণমেণ্টের তরফ থেকেও দেখা গেল, Y. M. C. A.-র O. R. Raha-র নেতৃত্বে এবং বি. সি. চাটার্জি, এস. আর. দাস প্রভৃতি গণ্যমান্য লোকের সহযোগিতায় মুক্ত রাজবন্দীদের জন্য একটা ফ্রী কিচেন জাতীয় মেস প্রতিষ্ঠিত হ'ল বেনেপুকুরে। এই মেসের বিশিষ্ট উদ্যোগী শ্রীনলিনী কিশোর গুহ।

ক্রমে দেখা গেল, আমাদের বন্ধু যাঁরা খালাস হচ্ছেন তাঁদের ভিতর প্রায় কেউই এ মেসের কাছ ঘেঁষলেন না, বরং কংগ্রেস ঘেঁষা হয়ে দাঁড়ালেন। এই মেসে আশ্রয় পেলেন প্রায় সবই অনুশীলনের

লোক, আর এই মেসের ভিত্তিতেই কয়েক মাসের ভিতর পুলিন বিহারী দাসের সঙ্গে যোগাযোগে গড়ে উঠ্‌লো "ভারত সেবক সংঘ", এর দু'খানি প্রচারপত্র পরে বের হ'ল "হক্ কথা" ও "শংখ"। নলিনীবাবু এ দু'খানার সম্পাদক। এর প্রচার কংগ্রেস ও অসহযোগ আন্দোলনের বিরুদ্ধে।

এগুলি অবশ্য হয় আমাদের খালাসের পরে। কিন্তু বেনেপুকুরের মেসটাকেই এমনকি অনুশীলনের যোগেশ ও আশু কাহিলী পর্যন্ত রাজনৈতিক বন্দীদের আত্মসম্মানের দিক থেকে সুনজরে দেখতে পারেন নাই। পালংএর আশুবাবু রাজসাহী জেল থেকে প্রায় সবাই খালাস হয়ে যাবার পর রাজসাহীতে আসেন। খবরের কাগজের খবর পড়তে পড়তে গভীর দুঃখে তিনি একদিন বলেন, ওরা এখানে গিয়ে ভিড় জমিয়েছে কেন? এর চেয়ে খবরের কাগজ ফিরি ক'রে খেতে পারেনি?

এদিকে খালাসের গতি দ্রুততর হতে হতে অবশিষ্ট প্রায় সব ক'জন এসে জুটেছেন রাজসাহীতে। একদিন দুপুরবেলা জেলার এসে বলে, অ্যাডিশনাল সেক্রেটারী নেলসন, আর আই. বি.র ডি. আই. জি. ডিকসন সাহেব এসেছেন, আপনাদের সঙ্গে দেখা করবেন, আফিসে চলুন।

আমরা কয়েকজন বেরিয়ে পড়ে আমগাছের ছায়ায় দাঁড়িয়েছি, বাদবাকীরা তৈরী হয়ে আসছেন। কুন্তল তখন বলেন, দেখ, এ লোক দুটোর কিন্তু একটা বাতিক আছে।

কুন্তল যে কাহিনী বললেন, তা এই : ঢাকা জেল থেকে কুন্তল বদলি হবার কয়েক দিন আগে এরা দুজন সেখানে যায়। সর্বশেষ কুন্তলকে আফিসে ডাকে। সেখানে পৌছে দেখেন দুজন দুখানা চেয়ারে ব'সে আছে, আর কোনো চেয়ার নেই।

কুন্তল বলেন, চেয়ার কোথায়? নেলসন বলে, আমার সঙ্গে যতক্ষণ কথা বলবে, ততক্ষণ দাঁড়িয়ে বলতে হবে। কুন্তল টেবিলের উপর চেপে বসতে বসতে জিজ্ঞেস করেন, তুমি কে শুনি?

নেলসন বলে, আমি বাংলা গবর্ণমেণ্টের অ্যাডিশনাল সেক্রেটারী। কুন্তল জিজ্ঞেস করেন, তোমার সঙ্গে কথা না বললে কি হয়?

ও বলে, না বললে! তখন কুন্তল উঠে দরজার দিকে যেতে যেতে বলেন, তোমার মতো অভদ্রের সঙ্গে আমি কথা বলিনে। ব'লে বেরিয়ে চলে আসেন।

কথাগুলো শুনতে শুনতে আফিসের দিকে একটা বটগাছের তলায় আমরা পৌঁচেছি। জেলারকে বললাম, যান, ভিতরে গিয়ে আগে চেয়ারের ব্যবস্থা করুন। জেলার বলে, সে হয়ে যাবে।

আমি বলি, হয়ে যাবে-তো কাজ নেই, আগে যান।

একটু বাদে জেলার মুখ কালো ক'রে ফিরে এসে বলে, সাহেব বললেন, দাঁড়িয়ে কথা বলতে হবে।

আমরা সেলে ফিরে এলাম, তু'একজন গেটের সাম্না সাম্নি গিয়ে একটু বেরালের ডাকও শুনিয়ে এলেন। আবার, এই চেয়ারের প্রশ্নটাকে এত বড় ক'রে তোলাতে তু'একজন একটু অসন্তুষ্টও হলেন।

দিন তিনেক পরে খানিকটা সম্পাদকীয় মন্তব্যের সাথে খবরটা অমৃত বাজার পত্রিকায় বেরিয়ে গেল। বের করার কাজটা অবিশ্যি ছিল আমারই।

ষ্টীফেনসন তখন বাংলা গভর্ণমেণ্টের চীফ সেক্রেটারী। কয়েকদিন বাদে খবর পেলাম, সে ঢাকা থেকে লঞ্চে ক'রে রাজসাহী আসছে। সে কিন্তু এই প্রশ্নটি তুলবারও স্বযোগ দিল না। সোজা আমার ঘরের ভিতর ঢুকে আলাপ জমিয়ে তুললো। আমার ঘরে যখন ঢুকেছে, তখন

আমার চেয়ারে ওকে আমিই বসালাম। রাজসাহীর মর্তমান কলা ও ও রাঘবসাহী সন্দেশও কিছু খেল। এবং আমাদের ভিতর যাঁর খুসি, আমার খাটে ব'সে, যাঁর খুসি, দাঁড়িয়ে আলাপ ক'রে গেলেন। সবার সাথেই দু'চার মিনিট ক'রে আলাপ করলো। সবই প্রায় weather talk. ওরই ভিতর খালাসের জন্য আমাদের মন পরীক্ষা হয়ে গেল।

আমায় বললো, আপনাদের তিনজন ছাড়া আর সবাইকে তো খালাস দেওয়াই আমরা স্থির ক'রে ফেলেছি।

আমি বলি, একজন তো বুঝ্ছি, এই গরীব বেচারি। আর দুজন কে ?

ষ্টিফেনসনের কথা ভাল বোঝা যেত না। একটা কার নাম বললো।

জিজ্ঞেস করলাম, কে ?

"Paresh," Amrita Sarker, you don't know Paresh of Anusilan ?

আমি বললাম, Yes, আর একজন কে ?

প্রশ্নটার জবাব এড়িয়ে ও অন্য কথা পেড়ে বসলো।

ইতিমধ্যে মনোরঞ্জনদা ও রবিবাবু ঢাকা জেলে বদ্লি হয়ে গেছেন। তাঁদের মায়ের অসুখ—তাঁরা যথাক্রমে বরিশাল ও ময়মনসিং গেলেন। দু'জনারই মায়ের মৃত্যু হ'ল ; সঙ্গে সঙ্গে দু'জনারই বন্দী অবস্থাও ঘুচলো।

চারু সেই বছরেই বি. এ. পরীক্ষা দেবেন এবং শরৎ গুহ বি. এল। এই উপলক্ষে দু'জনাই ছাড়া পেলেন।

এর পর একদিন ডিক্সন আবার এসে হাজির। ইতিমধ্যে ধড়ে বুদ্ধি এসে গেছে। ইয়ার্ডের মধ্যে একা একা ঢুকে দাঁড়িয়ে আমার

সাথে কথা সুরু করলো। বলে, আমরা তো সব ছেড়ে দেওয়াই ঠিক ক'রে ফেলেছি। তবে বাইরে কাজকর্মের যোগাড় হচ্ছে না, এই যা অসুবিধা। বিজয় (বি. সি. চাটার্জি) আমাদের খুব সাহায্য করছে, তবু পেরে উঠছি না।

আমি বলি, তা হলে কুন্তলকে আর প্রবোধকে ছাড়ছ না কেন? কুন্তলকে বিজয় নাগ (পরে পণ্ডিচেরি আশ্রমের) তাঁর ব্যবসায়ে যোগ দিতে ডাক্‌ছেন, আর প্রবোধের জন্য তাঁর ভাই কাজ যোগাড় ক'রে রেখেছেন।

তাই নাকি? আমরা তো জানতাম না! দেখা যাক্ কি করতে পারি। এর পর সপ্তাহখানেকের ভিতর ওঁদের খালাসের হুকুম এল।

ওঁদের দুজনকে অফিস থেকে বিদায় দিয়ে আমি আর সতীশবাবু হারাধনের দুটি ছেলের মতো ফিরছি, জেলার বলে, আজকের রাতটিই মাত্র নির্জনতা ভোগ করতে হবে। কালই আবার তিন জন আসছেন।

নেই তো প্রায় কোথাও কেউ, আবার কে আসছেন?

পরদিন এলেন অধ্যাপক প্রভাস দে, আর পালংএর আশু কাহিলি ও রাইহরণ সেন।

সাদরে অভ্যর্থনা ক'রে আনতে গেছি গেটে। প্রভাসবাবু সেলের দিকে আসতে আসতে হঠাৎ থেমে গিয়ে জেলারকে বলেন, ওখানে যাব না। জেলার বলে, চলুন, স্নান করুন, খান, তারপর হবে'খন।

প্রভাসবাবু বলেন, স্নান করতে কেন, মলত্যাগ করতেও ওখানে নয়।

আমি যত বলি, আমরা উপরেই থাকি, উনি যেন শুনেও শোনেন না।

প্রভাসবাবুর এই তৃতীয় বার রাজসাহী জেলে। প্রথম বারে ছয় মাস মাত্র তিন চারটি সেলের ব্যবধানে থেকেও বাল্য বন্ধু হরিশ শিকদারের সন্ধান পান নাই। দ্বিতীয় বারে জেলার রায় সাহেব গুরুচরণ দত্তের উপর ক্ষেপে গিয়ে এক লাথিতে অ্যান্টিসেলের কাঠের দরজা ফাটিয়েছেন। আর এই তৃতীয় বার।

এর পর, সপ্তাহ তিনেক এক সঙ্গে আমরা পাঁচজন রইলাম। এমন সময় পাইকারীভাবে খালাসের পরোয়ানা এল। ১৯১৮ সালের নভেম্বরে যুদ্ধবিরতির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের খালাসের নীতি ঘোষিত হয়েছে। আর এখন ১৯২০ সালের ডিসেম্বর।

আমিই প্রথম রাজসাহী জেল ছাড়লাম। আগের দিন রাত্রে প্রভাস লাহিড়ি খবর পেয়ে দল বল নিয়ে এসে রাস্তা থেকে ডাকাডাকি ক'রে আমন্ত্রণ জানিয়ে গেলেন। বছর চারেক আগে একদিন গৌহাটির পথে তাঁকে নলিনী ঘোষের সঙ্গে চন্দননগর থেকে ব্যাণ্ডেলে ট্রেণে চড়িয়ে দিয়েছিলাম।

পরদিন জেল থেকে বেরিয়ে প্রভাসবাবুর বাড়ীতে উঠলাম। সহরটা দেখা হ'ল। সন্ধ্যায় অনেকে মিলে নৌকায় পদ্মা বেড়ানো গেল। মুক্ত জীবনে প্রথম একটি শান্ত সন্ধ্যা, অন্তর যখন চঞ্চলতায় ভরপুর।

পরদিন কলকাতা রওনা হলাম।

দ্বিতীয়বার জেলে

২৫শে সেপ্টেম্বর। ১৯২৩ সাল।

উত্তরপাড়া বিদ্যাপীঠে রেখে চিকিৎসায় যত্নে অবস্থার উন্নতি হচ্ছে না, খরচেও কুলিয়ে ওঠা যাচ্ছে না ব'লে চারুকে কয়েকদিন আগেই বেলগেছে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়েছে। অসুখ থাইসিস্। ডাঃ পঞ্চানন চ্যাটার্জ্জি তখন হাসপাতালের স্থপারিণ্টেণ্ডেণ্ট —যাদুদা তাঁর নামে একখানা চিঠি দিয়ে দিয়েছিলেন। সহজেই ভর্তি করা গেল। নিকটে এক আত্মীয়ের বাড়ী থেকে খাবারটা আনিয়ে দেওয়া হয়। সকালে ৮টার আগে একবার যাই, বিশেষ অনুমতি ছিল, তেল মাখিয়ে স্নান করিয়ে দিয়ে আসি।

সেদিনও তেল লাগাব ব'লে জামাটা ছেড়েছি, দেখি পঞ্চাননবাবু, আর তাঁর পেছনেই আর একটি লোক, একটু ঠাহর ক'রে দেখলাম আই. বি.-র ইন্সপেক্টর ইসমাইল।

পঞ্চাননবাবু বললেন, দেখুন এরা কি বলছে, আপনাদের কার নামে কি পরোয়ানা আছে।

ইস্‌মাইল এগিয়ে এসে বলে, আপনাকে সাহেব একবার নীচে ডাকছেন।

আমি বলি, কে সাহেব? তার দরকার থাকলে তাকে উপরে আসতে বলুন।

মিনিট খানেক বাদে একটি সাহেবকে নিয়ে ফিরে এল। সে বল্‌লো, I have to take you under arrest.

আমি বলি, অপেক্ষা কর, আমি রোগীকে স্নান করিয়ে নিই।

ইস্‌মাইল দাঁড়িয়ে রইলো। সাহেবটা পঞ্চাননবাবুর সাথে নীচে চলে গেল।

চারুকে স্নান করাতে করাতে তাঁর সঙ্গে দু'চারটে কথা যা বলবার ব'লে নিলাম। ওঁর মনের আশংকাটা স্পষ্ট করেই বললেন, এইবারে শেষ! সান্ত্বনা দিলাম—অযত্ন হয়তো হবে, কষ্ট হবে—অমুককে অমুককে খবর দিস্‌, একটা কিছু ব্যবস্থা হবেই।

মনে মনে আমিও জানি, কি হবে। দু'জনেরই ব্যাথায় মন ভ'রে ওঠে, কিন্তু আশ্চর্য হইনে কেউই।

কিছুদিন আগেই খবর শুনেছিলাম, বাংলায় কুড়ি জনকে ৩নং রেগুলেসনে ধরবার জন্যে গভর্ণর লর্ড লিটন ও টেগার্ট দিল্লী সিমলা দৌড়াদৌড়ি করছে, ভারত গবর্ণমেন্ট রাজী হচ্ছে না।

খবরটা যাদুদাকে বললাম, তিনি বললেন, শাঁখারিটোলার মামলার সাক্ষীসাবুদ যখন কোর্টে বের হতে থাকবে, তখনই তোমাদের ধরবে।

অসহযোগ আন্দোলন যখন চলছে তখন মিহির ঘোষ—নামটা একটু বদলে বল্‌তে হ'ল—ব'লে একজন পুলিশের এজেন্ট প্রভোকেটর হিসেবে খুব গরম গরম কথা ব'লে বিপ্লবী দল করছিল। ফাঁদে পা দেবার মতো নানাবিধ প্রস্তাব নিয়ে সে আমাদের অনেকের কাছেই এসেছিল। প্রেসিডেন্সি জেলের ৪৪ ডিগ্রিতে ১৯১৬-১৭ সালে তার সঙ্গে যে গুপ্ত পুলিশের যোগাযোগ ছিল, তা অনেকে জানতেন। কিন্তু জেনেশুনেও দু'তিন জন তার খপ্পর থেকে অব্যাহতি পান নাই।

১৯২৩ সালে যখন স্বরাজ্য দল গড়ে উঠ্‌ছে, তখন এর দল থেকে কলকাতায় ও আশেপাশে কয়েকটা সামান্য ডাকাতি বা ডাকাতির চেষ্টা হয়। এর উদ্দেশ্য কি, আমরা অনেকে আন্দাজ করেছিলাম। আন্দাজেরও প্রয়োজন ছিল না। দৌলতপুরে ছাত্রজীবনে আমার

এক বন্ধু ও সহকর্মী ছিলেন নিরন্ময় মজুমদার। প্রথম বার জেল থেকে বেরিয়ে এসে দেখি, ইনি সরকারী চাকরী করছেন। প্রাণটা এঁর এত ভাল যে এঁর অনুতাপ হ'ত: বন্ধুরা যখন জেল খাটছেন আমি তখন সরকারী চাকরী করছি! আমাদের ভালবাসতেন ব'লেও বটে, আর এই অনুতাপের ফলে ইনি অনেক সময় সাধ্যের অতীত সাহায্যও আমাদের করতেন। ফলে, আই. বি.-র সুনজরে প'ড়ে যান। ভূপেন চ্যাটার্জি এঁকে মাঝে মাঝে ডাকিয়ে নিয়ে নানাবিধ সদুপদেশ দিত।

প্রতিবাদে নিরন্ময় আমাদের কথা বলেন, ওঁরা তো এখন বিপ্লবী দলের কাজ করছেন না, করেন কংগ্রেসের কাজ। ভূপেন চ্যাটার্জি বলে, ঐটেতেই তো আমরা বেশী ভয় পাই; কংগ্রেস, স্বরাজ্যদল— সবটার ভিতরই এরা আছে, এইটেই আমরা চাইনে।

কাজেই মিহির ঘোষের দল যে ১৯২৩ সালে ডাকাতি সুরু করলো, এবং তারই শাঁখারিটোলা ডাকাতির সাক্ষীসাবুদের মারফত যখন লোকের ধারণা জন্মালো যে দেশে বিপ্লবী কার্যকলাপ চল্‌ছে, তখন আমাদের ধরবে, এটা আমাদের কাছে খুব অপ্রত্যাশিত নয়।

ওদিকে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের যুগে যখন জেলে ছিলাম, তখন কাগজে পড়েছিলাম, লয়েড জর্জ আমেরিকার খোসামোদের অঙ্গ হিসাবে জর্জ ওয়াশিংটনের মর্মর মূর্তির পদপ্রান্তে ফুলের মালা দিয়েছিলেন। খবরটা পড়ে মনে হয়েছিল, জর্জ ওয়াশিংটনও তো ইংরেজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ক'রে দেশকে স্বাধীন করেছিলেন! যতীন মুখার্জিও দেশকে স্বাধীন করবার চেষ্টায় প্রাণ দিয়েছেন। তফাৎ, একজন সফল হয়েছেন, আর একজন চেষ্টার ব্যর্থতার ভিতর প্রাণ দিয়েছেন। আজ ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী একজনার পায়ে ফুল দিচ্ছেন, আর আমরা যদি যতীন মুখার্জির স্মৃতি দিবস পালন করি, ওরা কি করে?

কাজটা করার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও ১৯২১ সাল ২২ সালের রাজনৈতিক বিক্ষিপ্ততার ভিতর কথাটা কারও কাছে পাড়াও যায় নাই। ১৯২৩ সালে অনেককে বল্‌লাম। নিজেদের বন্ধুবান্ধব সবাই উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। অমরদা কথাটা দেশবন্ধুকে বললেন। দেশবন্ধু বল্‌লেন, "নিশ্চয়! একটা জাহাজ চার্টার ক'রে আমরা সবাই মিলে বালেশ্বরে যাব এবং যেখানে যুদ্ধ হয়েছিল, সেখানে একটা স্মৃতিমন্দিরের উদ্যোগ আয়োজন ক'রে আসব।"

ইতিমধ্যে দিল্লীর বিশেষ কংগ্রেস এসে পড়লো, এবং স্বরাজ্যদলের প্রোগ্রাম পাশ করানো নিয়ে সবাই এত ব্যস্ত হয়ে পড়লেন যে কথাটা ওখানেই চাপা পড়ে গেল।

আমরা কয়েকজন কিন্তু স্থির করলাম, ওখানে কথাটা চাপা পড়তে দেওয়া হবে না। বেশী আড়ম্বর না করতে পারি, কিন্তু সর্বত্র আমরা নিজেদের মতো ক'রে যতীন্দ্রনাথের স্মৃতিতর্পণ করব। তাছাড়া, কলকাতার যতগুলো কাগজে সম্ভব, ছবি সমেত যতীনদার পরিচয় ও বালেশ্বর যুদ্ধের কাহিনী ছাপতে চেষ্টা করব।

ইতিমধ্যে নতুন ক'রে আমাদের দল গড়ার কাজ সুরু হয়েছে। মনোরঞ্জনদা ও নরেশদা উত্তরবঙ্গ ঘুরতে বেরিয়েছেন। আমি পূর্ববঙ্গ ঘুরে এসে যুক্তপ্রদেশ ও পাঞ্জাবে গেছি। এইবারেই ভগৎ সিং-এর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়। এর পরই তাঁর রাজনৈতিক জীবনের সুরু। তখন তিনি জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। তাঁর বাবা সর্দার কিষেণ সিং-এর সঙ্গে আমার আগেই পরিচয় ছিল। আমি যেদিন যাই, সর্দারজী সেই দিনই তাঁর বৃদ্ধ পিতাকে ও সপ্তদশবর্ষ পুত্রকে গ্রামের বাড়ী থেকে খবর দিয়ে লাহোর শীশমহল রোডের বাড়ীতে আনান। যুবক ভগৎ সিং প্রায় সমস্ত রাত্রি ধরে ভারত-জার্মান

ষড়যন্ত্র, যতীন্দ্রনাথ ও বালেশ্বরের যুদ্ধের কাহিনী শোনেন। ৯ই সেপ্টেম্বরের আর বেশী দেরি নেই। ভগৎ সিং আমায় বলেন যতীন্দ্রনাথের কিছু ছবি এবং বালেশ্বর সম্পর্কে লেখা যা পারি, তা পাঠিয়ে দিতে। কাশীতেও তখন আমাদের ভাল দল ছিল। এইভাবে ১৯২৩ সালের ৯ই সেপ্টেম্বর বাংলা থেকে পাঞ্জাব পর্যন্ত বালেশ্বর দিবস পালন করা হয়। কলকাতার প্রায় সমস্ত দেশী কাগজে যতীন্দ্রনাথের ছবি, জীবনী ও বালেশ্বরের যুদ্ধের কাহিনী প্রকাশিত হয়। অমরদা ঐ দিনেই "স্বদেশ" ব'লে একখানা দৈনিক কাগজ বের করেন। তার প্রায় সব পাতা জুড়ে এই দিন ঐ সব ছবি ও কাহিনী ছাপা হয়।

এর কয়েক দিনের মধ্যেই "ইংলিশম্যান" কাগজে পর পর দুটি প্রবন্ধ বের হয়। তার মর্মকথা এই—বালেশ্বর স্মৃতি দিবস যে এইভাবে উদযাপিত হ'ল, তার অর্থ এই যে, বিপ্লবীরা আবার দল গড়তে সুরু করলো।

এর পর, ধর পাকড় সম্পর্কে গুজবটা যে সত্যি হ'তে বাকী নেই, সে ধারণা আমাদের কারও কারও ছিল।

তবু যাদুদাকে বল্‌লাম, আমি তো রোগী শুশ্রূষা করি, আমায় ধরবে না।

যাদুদা বলেন, বাংলায় যদি একজনকে ধরে তো তোকে ধরবে।

যাদুদা নিজেকে হয়তো বাদ দিয়েছিলেন। আমরাও কাকে ধরবে, কাকে ধরবে না, সে সম্বন্ধে কিছু ঠাহর করতে পারিনি। তাই যাঁকে যাঁকে খবর দেবার কথা চারুকে বল্‌লাম, তাঁদের ভিতর যাদুদা ও অমরদাও ছিলেন।

বেলগেছে হাসপাতাল থেকে ওদের গাড়ী ক'রে আমায় যখন লালবাজারে নিয়ে গেল সেখানে যাঁদের হাজির দেখলাম তাঁদের

ভিতর যাদুদা, অমরদাও রয়েছেন। আর আছেন উপেনদা, মনোরঞ্জনদা, ভূপতিদা, জ্যোতিষ ঘোষ, মনোমোহন ভট্টাচার্য, আর অনুশীলনের রবি সেন, অমৃত সরকার ও রমেশ চৌধুরী।

ঘরে ঢোকা মাত্র প্রচুর অভ্যর্থনা। অভ্যর্থনার মালমশলা—কয়েকটা ঠোঙ্গা ভরা খাবার, আর—উপেনদা যখন রয়েছেন,—প্রচুর হাসিঠাট্টা।

তারই ভিতর গম্ভীর হয়ে গেলেন যাদুদা, অমরদা ও মনোরঞ্জনদা। যাদুদা জিজ্ঞেস করলেন, চারুকে কেমন দেখে এলি? মনোরঞ্জনদা বললেন, তোমায় ওরা প্রেসে (সরস্বতী প্রেস) আশা করেছিল। মনোমোহন বললেন, এইবারে চারুটা মরবে।

যাদুদা বললেন, "চারুর নামেও বোধ হয় ওয়ারেণ্ট ছিল। আমায় গাড়ী থেকে নামবার আগেই, আমার পাশের গাড়ীতে অমরদা ছিলেন, ব্যামফোর্ড তাঁকে জিজ্ঞেস করছিল, Where's Bhupen Babu?

অমরদা বললেন, He must be nursing Charu.

"তখন এসে আমায় জিজ্ঞেস করে, How is Charu?

"তখন বললাম, তার অবস্থা শংকাজনক। ও একটু বিশদ ক'রে প্রশ্ন করলো, তারপর বল্লো, Excuse me for a minute please. একটু পরে একখানা গাড়ী বেরিয়ে গেল, তখন আবার আমার পাশে এসে গল্প সুরু করলো। বুঝলাম, তোমায় ধরতেই গেল।"

এর পর একে একে টেগার্টের কাছে ডাক পড়লো। নাম জিজ্ঞেস করার পর আমায় জিজ্ঞেস করে, Were you doing anything particular these days?

আমি বলি, If I have anything to say, I shall say before the court.

ও বলে, You won't be produced before any court,

you will be incarcerated under Regulation III of 1818.

আমি বলি, Thank you.

একে একে এনে একখানি ভ্যানে তোলে। উপেনদা টেনে টেনে বলেন, "মনোরঞ্জন, পতন অভ্যুদয় বন্ধুর পন্থা…।" সকলে এক চোট হাসলাম। মনোরঞ্জনদা ও অরুণদা তখন অনিলবরণ রায়ের সঙ্গে একত্রে "সারথি" ব'লে সাপ্তাহিক কাগজ বের করতেন। কাগজখানার উপরে লেখা থাকতো—

পতন অভ্যুদয় বন্ধুর পন্থা
যুগ যুগ ধাবিত যাত্রী,
হে চির-সারথি, তব রথচক্রে
মুখরিত পথ দিন রাত্রি।

নিয়ে চললো আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে। পথে পথে "বন্দে মাতরম্" চীৎকার ক'রে গলা ভেঙ্গে ফেল্‌লাম। আর উপেনদা মাঝে মাঝে খুব হাসাচ্ছেন।

জেলে ঢুকে স্নানাহার সেরে ম্যাজিষ্টেরিয়াল সেলের সামনের মাঠটায় গাছের ছায়ায় বিশ্রাম করছি, আর ধরপাকড় কেন, আর কাকে কাকে ধরবে, ইত্যাদি গবেষণা করছি, এমন সময় জীবনে যতগুলো ভুল করেছি, তার একটি ক'রে বস্‌লাম। যাদুদাকে আলাদা ক'রে ডেকে বললাম, এইবার জেলে এমনভাবে চলতে হবে যাতে ওদের (অনুশীলনের) সঙ্গে ভবিষ্যতে মেশা যায়। প্রতুলবাবু নেই, রবিবাবু ও অমৃত সরকার আছেন, অনেকটা সহজ হবে, কিন্তু রমেশ-বাবু আছেন। জেলে মিলমিশের সর্তাসর্তির কথা কিছু নেই, শুধু ভাল ব্যবহার।

অনুশীলনের সঙ্গে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীরই এত তফাৎ যে মিলমিশ

ওঁদের সঙ্গে আমাদের হতে পারে না, বরং সে চেষ্টায় অনিষ্ট হবে, একথা বুঝেও তখনও বুঝিনি, বারবারই অরাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীতে পেয়ে বসেছে, আর মিলমিশের কথা বলেছি। আমার কথাতেই যে মিলমিশের পরবর্তী চেষ্টা হয়েছিল, তা কিছু নয়, কারণ, সে চেষ্টা যখন হয়, তখন আমি বর্মার জেলে। কিন্তু গোড়াতে ঐ যে একটু উৎসাহ দেখিয়েছিলাম, তার জন্য আজও অনুতাপ হয়।

এই উৎসাহটুকু দেখাবার একটু কারণ ছিল। ধরা পড়ার কিছুদিন আগে থেকে প্রতুলবাবু ও রমেশবাবু আমার কাছে যাওয়া আসা করছিলেন। তখন এঁরা "ভারত সেবক সংঘ" করার দরুণ বাংলার রাজনীতি ক্ষেত্রে অপাংক্তেয়। প্রতুলবাবু একদিন আমায় বলেন, ও যা করতে গিয়েছিলাম, দেশের ভাল হবে ব'লেইতো করতে গিয়েছিলাম!

এর পর আমি চেষ্টা করি, এবং তার ফলে কয়েকদিন ওঁদের কয়েকজন ও আমাদের কয়েকজনে মিলে আলোচনা হয়। তার পর তো ধরাই পড়ি। কিন্তু দেশের ভাল হবে ব'লে ওঁরা এই সময়ে মিলতে এসেছিলেন—একথাটা যে কতো অসার, সেটা বুঝি ১৯২৮ সালে খালাসের পর। এসেছিলেন তখন স্বরাজ্য পার্টি গঠিত হচ্ছে ব'লে।

অসহযোগ আন্দোলনের কালে অনুশীলনের ওঁরা যখন Citizen Protection League-এর নীতি মেনে ও সাহায্য নিয়ে "ভারত সেবক সংঘ" গড়ে কংগ্রেসের বিরোধিতা করেন, আমাদের বন্ধুবান্ধবদের ভিতর অনেকেই তখন নিজেদের পরিচিত কর্মী ও অসহযোগী ছাত্র, শিক্ষক, অধ্যাপক ও আইন ব্যবসায়ীদের টানে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে কংগ্রেসের কাজ সুরু করেন। তার ভিতর সুরেন ঘোষ ময়মনসিংহে, মনোরঞ্জন গুপ্ত, সতীন সেন, অশ্বিনী গাঙ্গুলি বরিশালে,

জীবন চ্যাটার্জি ও জিতেন কুশারী ঢাকায়, পূর্ণ দাস ফরিদপুরে, সূর্য সেন চট্টগ্রামে, বসন্ত মজুমদার ও ললিত বর্মন ত্রিপুরায়, ক্ষিতীশ চৌধুরী নোয়াখালিতে, যতীন রায় উত্তর বঙ্গে, কালিপদ বাগ্‌চি রংপুরে, বিজয় রায় চৌধুরী গাইবাঁধায়, ক্ষিতীশ সরকার সিরাজগঞ্জে, ডাঃ আশুতোষ দাস ও ভূপতি মজুমদার হুগলীতে, জিতেন মিত্র বর্ধমানে, হরিকুমার চক্রবর্তী ২৪ পরগণায়, আমি খুলনায় ও বিজয় রায় যশোরে বসেন। হাওড়ার হরেন ঘোষ পরে আমাদের সঙ্গে যোগ দেন। বীরভূমের জিতেন্দ্রলাল ব্যানার্জির সঙ্গে পুরোনো গুপ্ত সমিতির দিনে প্রথমে অরুণদার এবং পরে কুন্তলের যোগাযোগ ছিল। ইদানীং বাঁকুড়ার অনিলবরণ রায় সরস্বতী প্রেসে মনোরঞ্জনদা ও অরুণদার সঙ্গে থাকতেন। ফলে, জেলার কংগ্রেস কর্মীদের সঙ্গে এঁদের যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে।

বিপিন গাঙ্গুলি ও জ্যোতিষ ঘোষ আমাদের থেকে একটু পার্থক্য অনেক সময়েই বজায় রাখছিলেন, কিন্তু পূর্বে বিপ্লবী দলে এবং এখনও কংগ্রেসে আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা ছিল। সেই হিসাবে বিপিনদা একদিকে যেমন ২৪-পরগণার কংগ্রেসের সঙ্গে অপর দিকেও তেম্‌নি যতীনদা (মুখার্জি) ও অমরদার সঙ্গে সম্পর্কিত নদীয়ার বিপ্লবী দলের বসন্ত বিশ্বাস, মন্মথ বিশ্বাস, জ্ঞান বিশ্বাসদের অনুগামী অনন্তহরি মিত্র ও তারকদাস ব্যানার্জির সঙ্গে যোগ রাখছিলেন। এঁরা ওখানে তখন কংগ্রেসের কাজ করছেন। আর, জ্যোতিষবাবুকে আমি অমৃতসরে ডাঃ কিচ্‌লুর আশ্রমে বসিয়ে সর্দার কিষেণ সিংদের দলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে আসি, কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই যখন তিনি ফিরে আসেন, তখন ভূপতিদা আবার তাঁকে ডেকে নিয়ে হুগলী কংগ্রেসে বসান।

এছাড়া, বরিশালে স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ প্রতিষ্ঠিত শংকর মঠ যুদ্ধের সময় থেকেই ছিল। অসহযোগের সময় আমি কুন্তল, চারু ও কিরণ

মুখার্জিকে নিয়ে দৌলতপুরে সত্যাশ্রম করি। সাতকড়ি ব্যানার্জি ও রসিকলাল দাস করেন আবদালপুর (ডায়মণ্ড হারবার) সত্যাশ্রম, জিতেন কুশারী বাহেরক (বিক্রমপুর) সত্যাশ্রম, যতীনদা (রায়) বগুড়া গণমন্দল, অমরদা উত্তরপাড়া বিদ্যাপীঠ, ভূপতিদা হুগলী বিদ্যা-মন্দির, সূর্য্য সেন চট্টগ্রাম সাম্যাশ্রম। এসব প্রতিষ্ঠান স্থায়ী প্রচার ও গঠনকেন্দ্র হিসাবে গড়ে তোলবার চেষ্টা হয়।

এই সবের ফলে বাংলায় অসহযোগ আন্দোলনের ভিতর দিয়ে কংগ্রেসের সংগঠন যা গড়ে উঠছিল, তা গড়ে উঠছিল প্রধানতঃ আমাদের যুগান্তরের বন্ধুবান্ধবের হাতেই। এদিকে কলকাতায় সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র, অরুণ গুহ, সুরেশ দাস প্রভৃতি প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সঙ্গে যোগাযোগ রাখছিলেন।

অপরদিকে কাউন্সিলে যাবার প্রোগাম নিয়ে আমাদের নিজেদের মধ্যেই মতবিরোধ দেখা দেয়। অনেক বন্ধুর সঙ্গে সেই থেকেই আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়।

ইতিমধ্যে অসহযোগ আন্দোলনের গোড়াতেই দেশবন্ধু একটি আদর্শ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় গঠনে উৎসাহিত হয়ে ওঠেন। আমাদের উপস্থিতিতে একদিন তিনি প্রশ্ন করেন কাকে এর ভার দেওয়া যায়? আমার পাশেই বসেছিলেন সুভাষের ঘনিষ্ঠতম বাল্যবন্ধু কৃষ্ণনগরের হেমন্ত সরকার। আর ছিলেন আমাদের তিনজনেরই বন্ধু অরবিন্দ মুখার্জি। হেমন্তকে বলি, সুভাষকে খবর দিলে কেমন হয়? হেমন্ত তখনই প্রস্তাব করেন। দেশবন্ধু সুভাষের সবিশেষ পরিচয় নেন। রাত্রে এ নিয়ে বাসন্তী দেবীর সঙ্গেও কথা হয়। এর পরই দেশবন্ধু সুভাষকে খবর দেন। সুভাষ তখন আই. সি. এস. পাশ ক'রে বিলাতে র‍্যাংলারশিপ পড়ছেন।

যাদুগোপাল মুখার্জি

বঙ্গীয় সর্ববিদ্যায়তন আর বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে উঠবার সুযোগ পেল না। জেল যাবার হিড়িকে সব ভেসে গেল। সবাই জেল থেকে ফিরে আসার পর স্বরাজ্যদল গড়ার মাতামাতি লেগে গেল। স্বরাজ্যদল গঠনে সুভাষ দেশবন্ধুর দক্ষিণহস্ত।

যাদুদা এর আগেই পলাতক জীবন থেকে ফিরে এসেছেন এবং ডাক্তারী পাশ ক'রে কলকাতাতেই আছেন। সুভাষ একদিন তাঁর কাছে গিয়ে হাজির কাউন্সিল প্রবেশের পক্ষপাতী এবং কাউন্সিল প্রবেশের বিরোধী জেলাগুলির হিসাব নিয়ে। যাদুদাকে তিনি দেখালেন ময়মনসিংহ থেকে মধুবাবু (সুরেন ঘোষ), বরিশাল থেকে মনোরঞ্জনবাবু ও হুগলী থেকে ভূপতিবাবু যদি মত দেন, তা হলেই কাউন্সিল প্রবেশের পক্ষপাতীরা জয়লাভ করেন।

আমাদের ভিতর জীবন চ্যাটার্জি ছিলেন এদিকে সব চেয়ে উৎসাহী, তারপর সত্যেনদা, কুন্তল, চারু, অরুণদা, যাদুদা ও আমি। মনোরঞ্জনদা ছিলেন সবচেয়ে বিরোধী। যাদুদা মধুদা ও ভূপতিদাকে ডেকে আলোচনা করেন ; তাঁরা নিজের নিজের জেলার সঙ্গে পরামর্শ ক'রে মত দিলেন। মনোরঞ্জনদার কিন্তু মত পরিবর্তন হয় ১৯২৩ সালে জেলে যাবার পর।

কিন্তু ইতিমধ্যে ময়মনসিংহ ও হুগলি জেলার সমর্থন পেয়েই দেশবন্ধুর দিকে সংখ্যাধিক্য হয়ে গেল। স্বরাজ্যপার্টির প্রোগ্রামকে এই সমর্থন দিয়েও কিন্তু আমরা স্থির করেছিলাম, আমরা অধিকাংশ কর্মীরা কাউন্সিল অ্যাসেমব্লিতে যাব না—সুভাষ, সত্যেনদা প্রভৃতি বন্ধুরা যেতে চাইলে তাঁদের সমর্থন করব।

যা-ই হোক্, স্বরাজ্যদল গঠনের ভার কিন্তু প্রায় সবটাই পড়লো আমাদেরই উপর। এবং তা-ই স্বাভাবিক। প্রতুলবাবুদের এই সময় আমাদের সঙ্গে মিলন কামনাও তেমনি স্বাভাবিক।

"ভারত সেবক সংঘের" কংগ্রেস বিরোধিতার ফলে তখনকার দিনের সদ্যোজাত "আনন্দবাজার পত্রিকা" এঁদের বিরুদ্ধে তীব্র প্রচার চালাতে থাকে। তার ফলে এঁরা বুঝতে পারেন যে আমাদের সঙ্গে অন্ততঃ সাময়িক মিল না হলে বাংলার রাজনীতিক্ষেত্রে আর এঁরা দাঁড়াতে পারবেন না।

তাঁদের এই মনোভাব যখন থেকে বুঝতে পারি, তখন থেকেই ঐ দিনের ঐ সামান্য একটি কথার অনুশোচনা আজও মনে রয়ে গেছে। কারণ, ঐ মিলনচেষ্টার—শুধুমাত্র চেষ্টারই—ফল বাংলার পক্ষে ভাল হয় নাই। সে কথা পরে আসবে।

সদ্য ধরা পড়ার উত্তেজনা নানাকথায়, হাসিতে, আমোদে চাপা দেবার চেষ্টা চলছে, এমন সময় অফিসে ডাক পড়লো আমাদের পাঁচজনের—যাদুদা, জ্যোতিষবাবু, রবিবাবু, অমৃত সরকার ও আমি। জেলখানার জীবনের এই ছিল এক চূড়ান্ত ট্রাজেডি। হাসিকান্নার ভিতর দিয়ে যা হোক একটা সংসার গড়ে ওঠে যার ভিতর মায়ামমতার সম্পর্ক কোনো পরিবারের ভিতর যা থাকে তার চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। অথচ বদলির টান যখন পড়ে, তখন একটা দীর্ঘশ্বাস চাপবারও অবকাশ মেলে না।

ট্যাক্সি যখন হাওড়ার পুলে উঠছে, যাদুদাকে ইঙ্গিতে দেখালাম, গোপীনাথ সাহা কলকাতার দিকে আসছেন। এই শেষবার গোপীকে দেখলাম।

মেদিনীপুর জেল। রাত্তির বেলায় ভাত, ডাল যা জোটাতে পারলো খাইয়ে দাইয়ে বিশ ডিগ্রীতে বন্ধ ক'রে যখন জেলার, জমাদার চলে গেল, তখন নতুন নতুন মশারি টাঙাতে গিয়ে দেখি, তার সবই আছে, শুধু চাল নেই। পাঁচ জনেরই ঐ একই অবস্থা। এক রাত্রির

জন্যে সেই ১৯১৮ সালের রাজসাহী জেলের অভিনয়—সারা রাত গরমে আর মশার কামড়ে এ সেল থেকে ও সেলে পরস্পরকে ডাকাডাকি আর চেঁচামিচি ক'রে কাটান গেল।

পর দিন সকালে সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট এল—ইয়ং সাহেব আই. এম. ডি. —মোগল বাদশাই ধাঁজধরন! সব শুনে জেলারকে ডেকে বললেন, হরপ্রসাদ, এঁদের কি এখানে রাখা চলে? আর কোথায় ভাল জায়গা আছে বল।

জেলার হরপ্রসাদ মিত্র পুরানো জেলার, তার ইচ্ছা আমাদের ওখানেই রাখে। ইয়ং একটা ওয়ার্ডের নাম বলতে ও বলে, সেখানে আমার প্রায় ৪০ জন কয়েদী থাকে, তাদের শোবার সব ঢিবি বাঁধা রয়েছে, তা ছাড়া ওঁরা কি সে জায়গা পছন্দ করবেন?

বাধা পেয়ে বাদশাই মেজাজ আরও মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে: ৪০ জন কয়েদীর জায়গা করতে আমাদের আটকাবে না। মাটির ঢিবি ভেঙ্গে ফেললেই গেল। আর, **I know they will like the place, that place is infinitely better than this.**

আমরা কোনো গতিকে সেল ছাড়া হ'তে চাই। আর জায়গাটা সত্যি সত্যিই ভাল। সেই দিনই আমাদের সেখানে নিয়ে যাওয়া হ'ল। সেই থেকে জায়গাটার নাম হয়ে গেছে ষ্টেট ইয়ার্ড।

আমরা এগার জন যে দিন কলকাতায় ধরা পড়ি, সেই দিনই ঢাকায় ধরা পড়েন, সতীশ পাকড়াশি। আর, দিল্লীতে কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে যোগ দিয়ে বোম্বে হয়ে কলকাতায় ফিরে ধরা পড়লেন, জীবন চ্যাটার্জি। এঁরা দু'জনও কয়েক দিনের মধ্যে মেদিনীপুর জেলে এলেন। ক্রমে অন্যত্র থেকে বদলি হয়ে মনোরঞ্জনদা, ভূপতিদা, মনমোহন ভট্টাচার্য, রমেশ চৌধুরী এঁরা সবও এসে মেদিনীপুরে জমলেন।

ইতিমধ্যে আমাদের প্রতি কি রকম ব্যবহার করা হবে, তার আইন বিধিবদ্ধ ক'রে পাঠালো তখনকার দিনের ইন্‌স্পেক্টার জেনারেল অফ প্রিজন্‌স্‌, কর্ণেল টমসন। লোকটি ছিল যেমন ভারতীয় বিদ্বেষী, তেমনি অসৎ। হুকুম হ'ল, আমাদের খাওয়া দেবে কয়েদী খানা এবং পোষাকও কয়েদীর পোষাক।

ইয়ং সাহেব অবাক হ'ল। খবরটা আমাদের কাছে গোপন ক'রে আই. জি.-র কাছেও প্রতিবাদ পাঠালো, সেক্রেটারিয়েটে তার এক বন্ধুর কাছেও চিঠি দিল। আই. জি.-কে জানালো, বিনাবিচারের বন্দীদের এরকম খাওয়াপরা দেওয়া সঙ্গত হবে না। তাছাড়া, ৩নং রেগুলেশনের ৬ ধারায় বলে, স্থপারিণ্টেণ্ডেণ্ট রাজবন্দীর স্বাস্থ্যের জন্য দায়ী। হুকুম অনুযায়ী খাদ্য দিলে এবং বিশেষতঃ চা, সিগারেট যারা খেতে অভ্যস্ত, তাদের তা বন্ধ করলে, স্বাস্থ্য খারাপ হতে পারে।

একদিন সন্ধ্যাবেলায় ইয়ং সাহেব এসে হাজির। আমরা তখন মুখহাত ধুচ্ছি, রাত্রের মতো বন্ধ হব। বললে, দেখুন, আমি যা করবার তা' করেছি, আমার conscience এখন clear. আমায় বলেছে, Carry out Government orders. কাল থেকে আমায় তাই করতে হবে।

রাত্রে নিজেদের মধ্যে গম্ভীর আলোচনা হ'ল। ভোরে ঘর খুলে দেওয়ামাত্র বাইরে বেরিয়ে বেড়াচ্ছি। এক বাল্‌তি লপ্‌সি এনে দরজায় রেখে গেল—কয়েদীর খানার ভোরের সংস্করণ।

সিপাই দাঁড়িয়ে ছিল, বালতিটাকে একটা লাথি মেরে কাৎ ক'রে ফেললাম। অন্য অনেক দিনই আমার ভাগের লুচি হালুয়া কয়েদীদের দিয়ে ওদের লপ্‌সি আমি খাই। শুধু খেতে ভালো লাগে না, হাজার কয়েদী রোজ যা খায়, তা খেয়ে একটা তৃপ্তিও পাই। জীবন,

অমৃতবাবু প্রভৃতিও প্রায়ই আমার সঙ্গী হন। আজ কিন্তু দেখা মাত্রই লাথি মেরে ফেলে দিলাম।

ঘরে এসে বলতে ভূপতিদা চ'টে উঠলেন, বললেন, খাবে না তো খাবে না, ফেলে দেবার কি প্রয়োজন ছিল?

বুঝলাম, বয়সের সুবুদ্ধি বিপ্লবীর আত্মসম্মানবোধের ঘাড়ে চেপে বসতে সুরু করলো।

একটু বাদে জেলারও এসে ঠিক ঐ ভাষায় ঐ প্রশ্নটিই করলো। বললাম, ফেলেছি, বেশ করেছি, যান, যা পারেন করুন গিয়ে।

সে গিয়ে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে ব'লে কিন্তু উল্টো কথা শুনলো: ফেলবেই তো! তুমিই বা ঐ লপ্‌সি পাঠাতে গেছ কেন? ভোরের খাবার আমাদের লপ্‌সিই দিতে হবে এমন কোনো কথা নেই। তাছাড়া, কয়েদীর রান্নাঘর থেকেই বা ওঁদের খাবার রান্না হয়ে যাবে কেন? গুদামে ভাল আটা আছে, গুড় আছে। তাই আমরা ওঁদের পাঠিয়ে দিতে পারি, ওখানে কাজ করবার কয়েদী আছে, তারা রুটি ক'রে দেবে। প্রয়োজনমতো medical groundএ আমি কাউকে কাউকে চা-ও দিতে পারি।

এরপর জেলারকে নিয়ে আমাদের ঘরে এসে পরিষ্কার চাল, ডাল, বাগান থেকে টাট্‌কা তরিতরকারি ইত্যাদি দেবার ব্যবস্থা ক'রে গেল। সঙ্গে সঙ্গে জানিয়ে গেল, গবর্ণমেণ্টের কাছে একটি ফর্দ তৈরি করে পাঠিয়েছে, যদি সেটাতে গবর্ণমেণ্ট সম্মতি জানায়, তা হ'লে দৈনিক এক টাকা এক আনার ভেতর আমাদের মোটামুটি ভাল খাবার ব্যবস্থা হবে।

এদিকে আমাদের কয়েদীর আহার চল্‌লো। গিরীনদার নামে সেইদিনই একটা টেলিগ্রাম গেল, Given convict diet. Make

outside arrangements. গিরীনদা টেলিগ্রাম পেয়ে বুঝলেন, বাইরের ব্যবস্থা মানে বাইরে থেকে খাবার দেওয়ার ব্যবস্থা নয়। পর দিনই খবরটা "অমৃতবাজার পত্রিকায়" বেরিয়ে গেল।

ষ্টীফেনসন তখন বাংলা গবর্ণমেণ্টের হোম মেম্বার। ষ্টেট প্রিজনারদের জন্য কয়েদীখানার হুকুম কি ক'রে গেল, অনুসন্ধানে বের হ'ল, ম্যাকআলপিন ব'লে একটা সেক্রেটারী ছিল, তার এক সই নিয়ে টম্‌সন অর্ডারটি চালু করেছে।

ষ্টীফেনসন চট্‌ করে ইয়ং সাহেবের সেই এক টাকা এক আনার ফর্দ পাশ ক'রে দিল। কাপড়চোপড়েরও এক আধা-কয়েদী গোছের ফর্দ এল। এ পর্যন্ত ইয়ং সাহেবের মেজাজ আমাদের সম্বন্ধে শরীফ।

আমরা কিন্তু খাদ্য ও কাপড়জামার ফর্দ সম্বন্ধে আপত্তি ক'রে গবর্ণমেণ্টের কাছে লেখালেখি সুরু করলাম। সেটা ইয়ং সাহেবের তেমন পছন্দ হ'ল না। 'তুমি সব কিছু করতে পার, তুমিই সবকিছু ক'রে দেবে' এই বলতে পারলে বাদশাই মেজাজ ভালো থাকতো। যাই হোক. এখন পর্যন্ত চলনসই রকমেই সব চললো, ভেতরের উষ্মা বাইরে প্রকাশ পেল না।

ইতিমধ্যে বাংলা কাউন্সিলের নির্ব্বাচন হয়ে গেল। দেশবন্ধুর এবং স্বরাজ পার্টির জয়জয়কার!

নির্বাচনের পর সত্যেন মিত্র, অনিলবরণ রায় ও অরুণ গুহ এলেন আমাদের সঙ্গে পার্টির প্রোগ্রাম আলোচনা করতে। সত্যেনদা ও অনিলবাবু যাদুদা, মনোরঞ্জনদা প্রভৃতির সঙ্গে আলোচনা করতে রইলেন। পার্টির আমার জানার ভিতর কোথায় কি আছে না আছে আমি অরুণদাকে ব'লে দিলাম।

এত লোকের সঙ্গে একসঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ! আই. বি. তুলকালাম

ক'রে ছাড়লো। সবার সঙ্গে দেখাসাক্ষাতের অনুমতি আগে থেকে ছিল না। কিন্তু মোলাকাতের ওখানে একজন ডেপুটি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অফ পুলিশ ছিল। ইয়ং সাহেব তার অনুমোদনে সবার সঙ্গেই দেখা করিয়ে দিল। এর পর ইয়ং সাহেবের এবং ডেপুটি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টটির অনেক কৈফিয়তের ঝক্কিতে পড়তে হ'ল। এবং ক্রমে মোলাকাতের আইনকানুনের নানাবিধ কড়াকড়ি দেখা দিতে লাগ্‌লো।

শীতকাল এসে গেল। আমাদের আলোয়ানের প্রয়োজন। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট একটি আলোয়ান আনালো। আমরা বললাম, একটি একটি আনালে চলবে না, কয়েকটি আনাবে, আমরা তা থেকে পছন্দ ক'রে দিলে সেই অনুযায়ী সবার জন্যে আসবে। ইয়ং সাহেব ব'লে পাঠালো, পছন্দ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের; আমরা বললাম, পছন্দ আমাদের।

ইয়ং সাহেব জিদ ছাড়লো না। আমরাও আধা কয়েদী কাপড়ের ফর্দ এইবারে তুলব। সরকারের কাছে দরখাস্ত গেল, আমরা কয়েদী নই, পছন্দ আমাদের।

বাদশাই মেজাজ এইবারে ক্ষেপলো।

খাওয়াদাওয়ার যে-ফর্দ ইয়ং সাহেব পাশ করিয়ে এনেছিল, তা নিয়ে আমাদের আপত্তি ছিল। এবং সে আপত্তিও সরকারকে জানানো হয়েছিল। ইয়ং সাহেব এইবারে প্রমাণ করতে উঠে পড়ে লেগে গেল, তার ব্যবস্থায় ত্রুটি নেই। একদিন তিনটি বাঙালী ভদ্রলোককে আমাদের খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা দেখাবার জন্য ডেকে নিয়ে এল। এঁদের একজন ঝুনো ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, একজন রায়বাহাদুর, আর একজন সিভিল সার্জনের জামাই।

ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটটি জিজ্ঞেস করেন, খাদ্য তালিকায় অভাব কিসের?

আমি বলি, দুধ, ফল, মিষ্টি ইত্যাদির। মাছের পরিমাণ কম।

ফল? বাড়ীতে কি ফল খান?

কেন, আম, কাঁটাল, আনারস, কলা, পেপে...

পেপে? আপনার বাড়ী কোথায়?

বাড়ীর পরিচয় বলি।

ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটী জেরা: সেখানে আমি ছিলাম, সেখানে তো পেপে হয় না।

অমৃত সরকার জিজ্ঞেস করেন, আপনার বাড়ীতে বেগুনের চাষ হয়?

জ্যোতিষবাবু গম্ভীরভাবে বলেন, **You have no right to cross-examine a gentleman.** আমাদের দিকে ফিরে বলেন, **Friends, let us retire.**

এর পর যার মুখে যা এল, ভদ্রলোকদের নির্বাক হয়ে কিছু সময় দাঁড়িয়ে শুনতে হ'ল। জানলা দিয়ে দেখছি, ইয়ং সাহেব বেল তলায় পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে মাথা দোলাচ্ছে, আর নিজের পায়ে মারছে। ভাবটা, এই নিমকহারামদের সাথে কেউ পারবে না—এত করলাম এদের জন্য, এখন আমি যা কিছু করেছি, তারই বিরুদ্ধে কথা!

নিজেদের পছন্দমতো কাপড় চাই, ওদের জানিয়ে দেওয়া হয়েছে তাগিদও দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু ইয়ং সাহেব এতে বাধা দিচ্ছে। কাজেই সরকারের অনুমোদনও পাওয়া যাচ্ছে না। এর পর একটা তাগিদ দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে সরকার থেকে এপর্যন্ত যা কিছু কাপড় জামা দিয়েছিল এক একটি পুঁটুলি বেঁধে আফিসে ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল। এর আগে মাঝে মাঝে অনশন ধর্মঘট হয়েছে, এইবারে এসে গেল বস্ত্রবর্জন। ধরা পড়ার সময়ে যার যা ধুতিজামা সঙ্গে ছিল, তাই রইলো সম্বল।

ইয়ং সাহেব কিন্তু পুঁটুলিগুলো আফিস থেকে ফেরত দিল, ব'লে পাঠালো, না পরতে হয়, না পরবে, পুঁটুলিগুলো আমাদের ঘরেরই এককোণে জমা থাকবে।

আমরা পুঁটুলিগুলো দেয়ালের উপর দিয়ে জেলেরই আর এক অংশে ছুড়ে ফেলে দিলাম। জেলখানায় এটার নাম হ'ল mutiny বা বিদ্রোহ—যা নাকি ১৮৫৭ সালে ভারতবর্ষে সিপাইরা করেছিল !

পরদিন স্নানের বেলার আগে একে একে আফিসে ডাক পড়লো—যাদুদা, ভূপতিদা, সতীশ পাকড়াশি। যে যায়, সে কিন্তু আর ফেরে না। আমরা স্নানের প্লাটফর্মে ওঁদের প্রতীক্ষায় ব'সে আছি। ডাক পড়লো অমৃত সরকারের। ব'লে দেওয়া হ'ল, এখন স্নানের বেলা হয়েছে, যাঁরা গেছেন, তাঁরা না ফিরলে আর কেউ যাবেও না, এবং খাবেও না।

তা-ই হ'ল। জেলখানায় দেখা গেছে, লড়াই যে ভাবেই সুরু করা হোক, শেষ পর্যন্ত অনশনটি প্রায় অনিবার্য হয়ে ওঠে।

বিকেল বেলায় আবার অমৃতবাবুর ডাক পড়লো, তখন তাস খেলা হচ্ছিল—চারজন খেলছিলেন আর সবাই আমরা মোক্তারী করছিলাম। ব'লে দেওয়া হ'ল, যাঁরা গেছেন, তাঁরা না ফিরলে আর আমরা কেউ যাব না।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই ওয়ার্ডের দরজা চিচিংফাঁক হয়ে গেল, আর ঢুকলো ইয়ং, জেলার, বড় জমাদার, এবং তাদের পেছনে জন ত্রিশ সিপাই।

তাস খেলা চলছে।

ইয়ং সাহেব চোখ এবং ব্যাটন ঘুরিয়ে বলে, You অমৃতা সারকার, Will you or will you not obey orders ?

অমৃতবাবুরও চোখ দুটো বেশ ঘুরতো, বল্লেন, তোমার brute force তো সাথে করেই নিয়ে এসেছ, তা-ই চালাও।

দু'জন সিপাই এসে দু'দিক থেকে ধরলো, উনি চল্‌লেন।

একে একে এই অভিনয় আমাদের সবার বেলাতেই হ'ল। সবাইকেই নিয়ে চল্‌লো সেই বিশ ডিগ্রিতে, সেলে।

আমি, জীবন, আর অমৃতবাবু খুব হাসছি। দরজা থেকে বেরিয়ে দেখি, একটা ওয়ার্ডে কয়েদীরা বন্ধ হচ্ছে। বলি, "বন্দে মাতরম্"।

সকলেই বলেন, "বন্দে মাতরম্।"

সেলে বন্ধ হয়েছি। ভারী বুটের শব্দ ক'রে ইয়ং সাহেব ছুট্‌তে ছুট্‌তে আসে। প্রথম সেলেই আমি। জিজ্ঞেস করে, Did you cry Bandemataram ?

"Yes I did."

আর দাঁড়ালো না। পরের সেলে জীবন। তাঁকে দেখিয়ে পেছনে বড় জমাদারকে হিন্দিতে বলে, এইতো চেহারা! মশলার মতো পিষে ফেলতে পারলে না ?

সব সেলের সামনে ঘুরে রাগে গর গর ক'রে বেরিয়ে গেল। যাদুদাদের তিন জনের কিন্তু তখনও খবর পেলাম না। রাতের বেলায় জানলাম, সংলগ্ন আর একটা সেল ব্লকে তাঁরা আছেন।

ডেভিস ব'লে একজন আই. সি. এস. তখন মেদিনীপুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট। সেই রাত্রেই ইয়ং সাহেব ক্লাবে ডেভিসের সঙ্গে দেখা ক'রে বলে, এরা জেলে মিউটিনি করেছে, প্রয়োজন হলে আমি এদের গুলি করতে পারি কি না ?

ডেভিস বলে, ভারত গভর্ণমেণ্টের বন্দী এরা, গুলি-ফুলি ক'রে কাজ নেই। সে অনেক হাঙ্গামার ব্যাপার। শুনলাম, বিদ্রোহের জন্যে

আমাদের নাকি সাজা হয়েছে, একমাস ক'রে সেলবাস করতে হবে।

সেলে অনাহারে দিন কাটে। সকাল সন্ধ্যায় বেড়াবার মাঠে যাদুদাদের সঙ্গে ফাঁকে ফাঁকে দেখা হয়। পরামর্শ হয়। গোপনে বাইরে খবর পাঠানো হয়।

চারদিনের দিন শোনা গেল লর্ড লিটন আসছে। যাদুদার ছোট ভাই ধনগোপালের সঙ্গে মিস ম্যাক্লাউডের ঘনিষ্ঠ পরিচয়। মিস ম্যাক্লাউড এক উচ্চবংশীয়া বৃদ্ধা আমেরিকান মহিলা। ইনিই নাকি চিকাগো কংগ্রেসে স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতা করার সুযোগ ক'রে দিয়েছিলেন। শেষ জীবনে ইনি রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে বিশেষ ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ধনগোপালের "My Brother's Face" পড়ে এদেশে এসে যাদুদার সঙ্গে আলাপ করেন। জেলেও একবার দেখা ক'রে গেছেন। তখন এক মজার ব্যাপার হয়েছিল। বিলিতি নামের কে একজন "মিস্" যাদুদার সঙ্গে জেলে দেখা করতে আসছেন—শুনে একজন মুসলমান অ্যাসিষ্টাণ্ট জেলারের মনে খট্‌কা লাগে। জেলারটি গোপনে পাত্র বুঝে ঠিক ভূপতিদা ও মনোমোহনকেই জিজ্ঞেস করে। তাঁরাও ইসারায় ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দেন, ব্যাপার গোলমেলে। তারপর, দেখা যখন করতে এসেছেন, তখন ছুটতে ছুটতে এসে বলে, "যান! ইনি তো যাদুবাবুর ঠাকুরমাও হতে পারতেন।" খুব হাসাহাসি হ'ল।

আমাদের সাজা ও অনশনের খবরটি কলকাতার কাগজে বেরিয়ে গেছে। বৃদ্ধা যখন শুনেছেন, যাদু উপবাসে আছেন, ছুটে গেছেন লর্ড লিটনের কাছে। গভর্ণরেরও তখন মেদিনীপুর, বাঁকুড়া যাবার কথা। জেলে গিয়ে যাদুদাকে ডাকাল।

যাদুদাকে আমাদের ইয়ার্ডে নিয়ে সব শুনে লিটন বলে, আপনারা অনশন ছাড়ুন, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকেও যা করবার আমি করব, আপনারাও জেলের আইন মেনে চলবেন।

কাপড়ের পুঁটুলিগুলো ইতিমধ্যে আমাদের ঘরে এসে পৌঁছে গেছে। দেখে যাদুদা ইয়ং সাহেবকে বলেন, ওগুলো সরিয়ে নাও।

মুখ গুমরে বল্‌লে, সরিয়ে নেবে।

আমাদের সবাইকে সেল থেকে ফিরিয়ে নিয়ে এল। আমরা আবার খেতে সুরু করলাম,—অনশন ছিল আমাদের পৃথক করার জন্য ও সেলবাসের জন্য। কাপড়ের পুঁটুলি কিন্তু ইয়ং সাহেব আর ফিরিয়ে নিল না। সেলবাসের সাজার সঙ্গে আমাদের আরও সাজা ছিল চিঠিপত্র লেখা এবং দেখাসাক্ষাৎ বন্ধ।

সে সাজার মেয়াদ ফুরিয়ে গেল। তবু চিঠিপত্র আমরা লিখলাম না। কাপড়ের পুঁটুলিগুলো ফিরিয়ে নিল না; সরকারের তরফ থেকেও আমরা যে কয়েদী নই, বিনাবিচারের বন্দী—এ স্বীকৃতি মিল্‌লো না—ওদের পছন্দ ও ফর্দ অনুযায়ী আমাদের কাপড় নিতে হবে।

মনের ভিতর একটা গুমোট জমে ছিল। বাইরেও আমাদের চিঠিপত্র কেউ না পাওয়াতে একটা গুমোট জমেছে। সেটা আমরা কাটতে দিতে চাইনি। চিঠির সংখ্যা বাড়ানোও আমাদের একটা দাবি।

তাছাড়া এ-ব্যাপারটা নিয়ে আরও বিরক্তির কারণ ছিল। অবস্থা প্রথমত যখন গোলমালের দিকে চল্‌ছিল, আমাদের কারও কারও চিঠিতে এক আধটু খবর দেবার চেষ্টা থাকতো। পুলিশ চিঠিগুলো আটক ক'রে লিখতো, চিঠিতে মিথ্যা খবর আছে। আমরা পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মংকটনকে চ্যালেঞ্জ ক'রে একে একে অনেকগুলো চিঠি দিলাম।

কোনো জবাব মিল্‌ল না। তখন আমি লিখ্‌লাম, I call you a cad, তুমি যদি মনে কর, তুমি ভদ্রলোক, আমাদের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ ক'রে প্রমাণ কর, আমাদের কোন্ চিঠিতে কি মিথ্যা ছিল।

এরও জবাব এল না।

ইতিমধ্যে টেগার্ট-ভ্রমে গোপী একদিন আর্ণেষ্ট ডে-কে হত্যা করলেন। গোপী একটি লোককে বিশ্বাস করেছিলেন। সে-ই এই ভ্রম ঘটিয়ে দিল। লোকটির নাম আবারও বলতে হবে। কিন্তু তার আসল নামটি বলব না। ধরুন তার নাম টুনু সেন। ব্যাপারটি রহস্য-জনক। এ যেন টেগার্ট নিজেই নিজের হত্যার ষড়যন্ত্র করছিল। অথচ আর্ণেষ্ট ডে-কে না মেরে কয়েক দিন আগে পার্সি ব্রাউনকেও মারতে পারতেন। গোপীর সুতীব্র আগ্রহের সুযোগ নিয়ে টুনু যে-কোনো সাহেবকেই টেগার্ট ব'লে দেখিয়ে দিচ্ছিল।

এই হত্যা উপলক্ষ্যে গোপী তো ধরা পড়লেনই। ফাউস্বরূপ Regulation III-তে সেইদিন ধরলো অরুণ গুহ, সতীশ চক্রবর্তী, অতুল ঘোষ, কিরণ মুখার্জি ও গোপেন রায়কে।

চারুর এদিকে বেলগেছে হাসপাতালে অবস্থা ক্রমে খারাপের দিকেই যাচ্ছিল। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষও আর দীর্ঘকাল রোগীকে রাখতে অনিচ্ছুক। খাওয়াদাওয়ারও অসুবিধা হচ্ছিল, দেখাশুনা করার লোকেরও অভাব ঘটছিল।

দেখে শুনে অরুণদা সরস্বতী প্রেসের বাড়ীতে তাঁকে এনে রাখেন। সরস্বতী প্রেস তখন সবে আরম্ভ হয়েছে। প্রেসের বাড়ীতে থাইসিস্ রোগী রাখার অসুবিধা সর্বরকমেই। সে অসুবিধা মেটান তিনি প্রাণের দরদ দিয়ে।

সন্ন্যাসীর দেওয়া ঔষুধে ভাল কিছু হচ্ছিল না। বন্ধু বান্ধবে পরামর্শ

ক'রে চুনার পাঠানো স্থির হ'ল। সঙ্গে গেলেন দৌলতপুর সত্যাশ্রমের দুইজন কর্মী—ময়মনসিং শেরপুরের জগদীশ নাগ এবং যশোর বিত্যানন্দকাঠির অমূল্যরতন দাস। অরুণদা ও অতুলদা নিজেরা যা' পারেন দেন, বন্ধু বান্ধবের কাছেও সংগ্রহ ক'রে পাঠান।

এখন তো এঁরা দুজনও ধরা পড়লেন। অতুলদাদের আর্থিক অবস্থা তখন শোচনীয়। তবু তাঁর ছোট ভাই অমর তখন সাহায্য করতেন। অন্য বন্ধুরাও যা' পারতেন দিতেন। থাইসিস রোগীর খরচ এভাবে জোটা শক্ত, তবু চল্‌তো।

চুনারেও অবস্থা খারাপ বই ভাল হ'ল না। অমূল্যর শরীর খারাপ হচ্ছিল। জগদীশও অনেক কাল চারুর সঙ্গে রয়েছেন। এঁদের জোর করেই চারু যথাক্রমে বাড়ীতে ও আশ্রমে পাঠিয়ে দিলেন। অন্য একজন আশ্রম কর্মী ফরিদপুরের কৃষ্ণদাস চক্রবর্তীকে সাথে নিয়ে চারু চুনার ছেড়ে ভাওয়ালী চলে গেলেন।

সেখানেও উন্নতি কিছু হ'ল না। আমার চিঠি না পেয়ে আমাদের অবস্থা চারু বুঝ্‌ছিলেন। মাঝে মাঝে ছোট এক একখানি চিঠি দিয়ে নিজের খবর এক একবার জানাতেন। ওঁর চিঠি পড়ে যাদুদা, মনোরঞ্জনদা, জীবন সবাই গম্ভীর হয়ে যেতেন। এম্‌নি একখানা চিঠির শেষে তুলে দিয়েছিলেন :

"স্মরণের আবরণে
মরণেরে যত্নে রাখে ঢাকি।
জীবনেরে
কে রাখিতে পারে।"

চিঠিখানা প'ড়ে মনোমোহন বললেন, এই শেষ!

সত্যিই শেষ। আর কোনো চিঠি আসেনি। পরে কৃষ্ণদাস

লিখেছিলেন, এই সময়ে চারুদা একদিন বল্‌ছিলেন, ভূপেনদার সঙ্গে যদি একবার দেখা হ'ত আরও ছয়মাস হয়তো বাঁচতাম।

চিঠি বন্ধ রাখার আলোচনা যখন হয়, সতীশদা তার ঠিক আগেই ঢাকা জেল থেকে মেদিনীপুরে এসে পড়েন। আলোচনার রাত্রে তিনি বলেন, সবার কথাই তো আমরা জানি, চিঠি লেখার প্রয়োজন থাক্‌লে এক ভূপেনের আছে, আর কারও নেই। মত নেওয়া প্রয়োজন তারই।

আমি বল্‌লাম, আমার জন্য ভাববেন না। জেলে ব'সে চারুকে লিখবার আমার কি আছে? না লিখলেও সে আমায় ভুল বুঝবে না। তার অন্য ব্যথা আমি তো চিঠি দিয়ে মেটাতে পারব না!

চিঠি বন্ধই রইলো।

এদিকে ইয়ং সাহেবের সাথে আমাদের বিবাদ নিয়ে গবর্ণমেণ্ট থেকে এক inquiry commission করলো। বিভাগীয় কমিশনার মিঃ জে. এন গুপ্ত ও জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ডেভিস্ তার সদস্য। ব্যাপার কি বলতে আরম্ভ করতেই মি. গুপ্ত বাংলায় বল্‌লেন, "আমি বিভাগীয় কমিশনার, কিন্তু বুঝ্‌ছেনই তো বাঙালী, ক্ষমতাটমতা বিশেষ কিছু নেই, now let us know what happened."

ইয়ং সাহেবের সমস্ত নাটকীয় ব্যাপার অভিনয় করেই দেখান হ'ল। শুনে ব্যাপারটা বুঝতে দেরি হ'ল না, বললেন, I'll ask the Superintendent not to lose temper and advise you to observe jail rules.

শুনলাম, অন্য সুপারিশের সঙ্গে এই কমিটিই গভর্ণমেণ্টকে বলে, রাজবন্দীদের জেলে রাখা সব দিক থেকেই অনুচিত, বরং এদের হিজলীতে রাখা উচিত। হিজলীর কথা ইয়ং সাহেব আমাদের কাছে

আগে বলেছিল। গভর্ণমেণ্টও এর পর আমাদের ওখানে নিতে চেষ্টা করে। কিন্তু জলাভাবের দরুণ সেটা তখন ঘটে ওঠে নাই। পরে টিউব ওয়েলের ব্যবস্থা ক'রে ১৯৩১ সালে ওখানে বিনাবিচারের বন্দীদের নেয়।

মাসের পর মাস যায়, শীতের প্রকোপ নিদারুণ। কাপড় নেই, জামা নেই, আলোয়ান নেই, জুতোও প্রায় নেই। বিছানার চাদর আর একখানি ক'রে সুজনি সম্বল। রাত্তির বেলায় তার সঙ্গে এক একখানি ক'রে কয়েদীর কম্বল জুড়ে নিই। দিন কাটে।

স্ফূর্তির কিন্তু অভাব নেই। আমাদের কাজ করার জন্য যে-কয়জন কয়েদী ছিল তার ভিতর কৃষ্ণদাস ব'লে একজন ছিল—মেথরের কাজ করতো। দাগী কয়েদী—পেশা পকেটমার। ছোট্ট মানুষটি, ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ, কিন্তু চেহারায় লাবণ্যের অভাব নেই। চলাফেরা সাধারণতঃ মন্থর, প্রয়োজনে অতি ক্ষিপ্র, কিন্তু সর্বদাই কাঠবিড়ালীর মতো নিঃশব্দ। রসিক লোক—সদ্য বিদেশ থেকে আগত এবং এদেশে বহুদিনের বাসিন্দা মেমসাহেবের চরিত্র বর্ণনা করলো একদিন, স্বভাবসিদ্ধ মৃদু ভাষায়: হাওড়া ষ্টেশনে হাত থেকে ভ্যানিটী ব্যাগটি টেনে নিয়ে ছুট্ দিতেই যে-মেমসাহেব O my God! ব'লে হা ক'রে থাকবে, বুঝতে হবে সে নতুন এসেছে। পালানো ভারী সুবিধে! আর এদেশে পুরোনো হয়ে গেছে যে-মেম সাহেব নিউ-মার্কেটে তার ব্যাগে টান পড়তে না পড়তেই বলবে, চোর, চোর, পাক্ড়ো পাক্ড়ো!

দুচার দিন ধ'রে অমৃতবাবু ওকে নিয়ে ঘরের পেছনে কি শলা-পরামর্শ করেন। তারপর একদিন বেলা ১০টা আন্দাজ সবাই যার যার জায়গায় শুয়ে ব'সে পড়াশুনা করছি—হঠাৎ দরজার কাছে আওয়াজ

হ'ল, Good morning, Babus! চম্‌কে যেমন সেদিকে সবাই তাকিয়েছি, কে একজন মাথা থেকে টুপি খুলে আবার বসাতে বসাতে বলছে, I am the টাট্টি-General, I come from Madras. বলেই লজ্জায় হোক্ বা বড় অফিসারের কর্তব্যসাধনের জন্যই হোক্ চট্‌পট্ আমাদের ঘরের ভিতরকার পায়খানায় ঢুকে পড়লো। বিস্ময় ভেঙ্গে ইতিমধ্যে আমরা সব হাসতে হাসতে দম নিচ্ছি, ও তাড়াতাড়ি বেরিয়ে মুখ নীচু ক'রে বলে, I find it all very neat and clean. Good morning! ব'লে ছুটতে ছুটতে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। মেথরের কাজ করতে জেল থেকে চুন, আলকাতরা, পাট, কয়েদীর ছেঁড়া কাপড় জাতীয় দু'চারটা জিনিস পেত। তা থেকেই মাদ্রাজী সাহেবের পোষাক তৈরী হয়েছে। উপদেষ্টা অমৃতবাবু।

সতীশ পাকড়াশী কৃষ্ণদাসকে সাতিশয় যত্নসহকারে বোলশেভিজম্ বোঝান। যাদুদা একদিন ওর পরীক্ষা নিতে গিয়ে বলেন, কারও ঘরে কিছু থাকবে না, কিন্তু যার যা প্রয়োজন, তা সে পাবে, কেমন হ'ল বল্‌তোরে কেষ্ট?

ধীরে ধীরে ও বলে, বাবু, সবই তো হলো ভালো! কিন্তু শালা চোরের বড় মুস্কিল হ'ল!

কেন রে?

সবাই সব পাবে, কিন্তু ঘরে কিছু না থাক্‌লে চোর ব্যাটা কি পাবে?

যার যেখানে ব্যথা!—যাদুদা উচ্চ হেসে বলেন।

যাদুদা, ভূপতিদা, সতীশ পাকড়াশী, জীবন এবং আরও কেউ কেউ মিলে এক যাত্রার দল খুলেছিলেন। রাত্রে খাওয়াদাওয়ার পর মাসিক পত্রের বিজ্ঞাপন খুলে গান ধরতেন, "নিদাঘে শীতল সিরাপ...।"

গান ধ'রে যাদুদা আলোকিত ঘরে একটি লণ্ঠন নিয়ে আগে আগে

চলতেন, আর নানাবিধ অঙ্গভঙ্গী সহকারে গাইতে গাইতে দলটি পেছনে। ঘরের এদিক থেকে ওদিক পর্যন্ত পরিক্রমা।

গোলমাল লাগবার আগে কয়েদীর খানা থেকে অব্যাহতি পেয়ে আমাদের অবস্থা যখন একটু উন্নতির দিকে তখন জেলার হরপ্রসাদ মিত্রের মনোভাবের ব্যাখ্যান ক'রে ভূপতিদা একটি গান বেঁধেছিলেন, প্রথম ত্নটি লাইন মনে পড়ে:

"মেদিনীপুর জেলে লেগেছে রেকুইজিশন-হাওয়া
দেখি নাই, কভু দেখি নাই এমন বিনামা-চাওয়া।"

ইদানীং নতুন duet স্থরু হ'ল—

"ইয়ং সাহেব গেলেন"
"কোথায় গেলেন?"
"গেলেন ক্ষেপে।"

পড়াশুনো বিশেষ নেই, স্থযোগও কম। বইপত্র প্রায় পাইনে। রাত্রে যাত্রাগান ভঙ্গের পর প্রায় পাশার উৎসাহ লাগে। আমি রস পাইনে, ঘুম তার চেয়ে মিষ্টি লাগে। শুয়ে পড়ি। অমৃত সরকার পেছনে লাগেন, জীবনও সঙ্গে থাকেন।

ঘুমোব এমন সময় বালতিভরা জলের ঢেউ খেলে গেল নারকেল ছোবড়ার গদির উপর দিয়ে। এরপর থেকে খেলোয়াড়দের কারও না কারও খাট দখল ক'রে চুপটি ক'রে শুয়ে পড়ি। একরাত্রে খেয়াল চাপ্‌লো, সব খাটেই জল থৈ থৈ! তারপর সারারাত ধ'রে যাত্রার পালা।

ওদিকে দরখাস্তের পর দরখাস্ত চলেছে। হঠাৎ একদিন ইয়ং সাহেবের বদলির হুকুম এল।

তার জায়গায় রাজনৈতিক বন্দীদের বন্ধু টমসনের কারসাজিতে এল মান্‌রো। আমাদের মধ্যে ত্ন'চার দিনের মধ্যেই সে নাম পেল

তিলেখচ্ছর। ছিল পাগলা গারদের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট। অত্যন্ত সন্দেহ বাতিকগ্রস্ত—ঘরে ঢুকেই আলমারীর পেছনে উঁকি দিয়ে দেখে পিস্তল লুকানে আছে কি না, থুকদানির চুন পা দিয়ে নেড়ে চেড়ে বিপজ্জনক জিনিসের সন্ধান করে।

যে কোনো জিনিস চেয়ে পাঠাই, জেলারকে বলে, দেখ, আইনে আছে কি না। জুতো মেরামতের কথা আইনে নেই, বরং নতুন জুতো কিনতে রাজী, জুতো মেরামত করিয়ে দেবে না। জিভ্-আঁচড়া আইনে নেই, তা দেবে না। জিনিসপত্র চেয়ে পাঠাই একটা খাতায় লিখে, খাতা আফিসে আটকে রেখে দিল। শ্লেটে লিখে পাঠাই। শ্লেটের কথা তো আইনে নেই, তাও একে একে সবগুলি আটক করলো। আট্‌কাতে চেয়েছিল দরখাস্তের কাগজও। একজন অ্যাসিষ্টেণ্ট জেলার বলে, সেটা পার না সাহেব, আসল আইনেই আছে যতো খুসি দরখাস্ত ওরা করতে পারে।

প্রতি ব্যাপারে রোজ দু'চারখানা ক'রে দরখাস্ত যায়। ষ্টিফেনসন তো পেয়ে আগুন, **Who sent Maj. Munroe there ?**

অসহযোগের সময় মান্‌রো ছিল বরিশাল জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট। গীতা ও কোরাণ নিয়ে সেখানে এমন কাণ্ড করেছিল যার ফলে, লাটসাহেবের **Executive Council**-এ স্যার আবদার রহিমকে জেল বিভাগ ছাড়তে হয়।

বিশ দিনের ভিতর মান্‌রো সাহেবের মেদিনীপুরের খেলা ফুরোলো। টেলিগ্রাফে বদলি হয়ে গেল। মেজাজ এত খারাপ হয়ে গেল যে পরবর্তী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে বাড়ীর চাবিটি পর্যন্ত না দিয়ে সরে পড়লো।

সবে ভোর হয়েছে। কেউ কেউ মুখ ধুচ্ছেন, এমন সময় দেখি, জেলারকে সঙ্গে নিয়ে ঢুকলেন Maj. Denham-Whyte. নতুন স্থপারিণ্টেণ্ডেণ্ট।

বললেন, চাটগাঁয় টেলিগ্রাম পেলাম, মেদিনীপুর যাবার আগে সেক্রেটারিয়েটে এসে সব কাগজপত্র দেখে যেয়ো। What are those miles length of petitions about? Who is the gentleman who wanted a tongue-scraper?

বল্‌লাম, আমি

জেলারকে জিজ্ঞেস করলেন, একটার দাম কত?

ছ'পয়সা, কি দু'আনা

একটু মুখ টিপে হেসে বেরিয়ে গেলেন।

একে একে যা' চাই সবই আসতে লাগ্‌লো। সরকারী চিঠি এল: খাদ্যের জন্য দৈনিক বরাদ্দ একটাকা চার আনা, তার ভিতর আমরা যা পারবো আনিয়ে নেব। কাপড়, জামা ইত্যাদি পাব নিজেদের পছন্দমতো। ঝগড়ার পাঁচমাস কেটে গেল। শীত গিয়ে তখন বেশ গরম পড়ে গেছে।

ডেনহাম-হোয়াইট্‌ আসেন, এক এক দিন অনেকক্ষণ ধরে গল্প করেন। তাঁর স্ত্রী মাঝে মাঝে নিজে হাতে বয়ে আমাদের জন্ম অনেকগুলো ক'রে বই নিয়ে আসেন, আর আনেন চকোলেট।

যাদুদা পলাতক হবার আগে মেডিক্যাল কলেজে ডেনহাম-হোয়াইটের ছাত্র ছিলেন। এখানে মাঝে মাঝে বাইরের রোগী সম্বন্ধে ভূতপূর্ব ছাত্রের সঙ্গে আলোচনা ক'রে আনন্দ পান। জেল হাসপাতালে কোনো কোনো দিন সাথে ক'রে নিয়ে যান বিশেষ বিশেষ রোগী দেখাতে।

মনোরঞ্জনদা আর ভূপতিদা একদিন বড় আঘাত দেন। আলোচনার মধ্যে বলেন, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ওরা ঢাকার তাঁতীদের আঙ্গুল কেটে ফেলেছিল।

Don't say, they were so bad !

এঁদেরও ধৈর্যের অভাব নেই, স্নানের সময় চলে গেছে, আমরা সব খেতে বসেছি, তখনও আলোচনা চল্‌ছে।

বর্মার পথে

২৯শে মে, ১৯২৪ সাল।

সবে রোদ উঠেছে। কেউ কেউ ভোরের খাবার দিতে বলেছেন, দেরিতে ঘুম থেকে ওঠার দল মুখ ধুচ্ছেন—সবাই প্রায় স্নানের প্লাটফর্মের কাছাকাছি আড্ডা জমিয়েছি। ঢুকলো দুটি অ্যাসিষ্টাণ্ট জেলার, হাতে কতকগুলো ক'রে সাদা কাগজ।

মুহূর্তে ব্যাপারটা বুঝে জিজ্ঞাসা করি, কার কার বদলি?

জেলার দুটি হেসে ফেললো, নাম বললে—আমি, জীবন, সতীশদা ও জ্যোতিষবাবু।

কোথায়?

কিছুই জানিনে। এখান থেকে আপনাদের কলকাতায় পাঠাবার হুকুম। তারপর কোথায় পাঠাবে বলতে পারিনে।

পাঁচ মাস ধ্বস্তাধ্বস্তির পর এই সেদিন থেকে মেজর ডেনহাম-হোয়াইটের কল্যাণে একটু স্বস্তিতে আছি। এরই মধ্যে আবার ছাড়াছাড়ি! ছাড়াছাড়ি নয় শুধু—অনির্দেশ যাত্রা!

আমরা যারা যাব, তারা যতোখানি বিচলিত হ'লাম, তার চেয়ে বিমর্ষ হয়ে পড়লেন যাঁরা রয়ে যাবেন।

কিন্তু হায়, নাই যে সময়! আমাদের সঙ্গে জিনিসপত্র যার যা যাবে, জেলাররা তার ফর্দ ক'রে ফেললো। মনোমোহন ও অমৃতবাবু সব গুছিয়ে প্যাক ক'রে দিলেন, বন্ধুরা তাড়াতাড়ি রান্নার আয়োজন ক'রে খাইয়ে বিদায় দিলেন।

কোথায় যাচ্ছি, তা নিয়ে সবারই মনে দারুণ উৎকণ্ঠা—আফিসে

জেলারকে জিজ্ঞেস করলাম—ফল নেই জেনেও। সুপারিন্টেণ্ডেণ্টকে জিজ্ঞেস করলাম—অত শিক্ষিত, অত ভাল লোক, অসত্য বলতে পারবেন না, আশা করেছিলাম। একথাও বলতে পারতেন, বলা আমার পক্ষে অন্যায় হবে, আমায় জিজ্ঞেস করবেন না। কিন্তু বললেন, **Haven't the least idea, probably to Cox's Bazar.** অভ্যাসটা মজ্জাগত বলেই হয়তো মিথ্যাবাদী বল্‌লে ইংরেজজাত অত খাপ্পা হয়।

ইতিপূর্বে সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের সঙ্গে যখন আমাদের গুরুতর রকমের ঝগড়া চলছিল, তখন আমাদের কোথায় পাঠানো যায়, তা নিয়ে ভারত ও বাংলা গবর্ণমেণ্টে মিলে নানাবিধ আলোচনা চালিয়েছিল। মেজর ডেনহাম-হোয়াইট দার্জিলিং-এর কোন জায়গা—সম্ভবতঃ তাক্‌দার জঙ্গল অথবা কক্সবাজারে পাঠাবার সুপারিশ করেছিলেন। আমাদেরও সে কথা বলেছিলেন। সেই কথারই রেশ টেনে এখন কক্সবাজারের নাম করলেন।

কিন্তু আশ্চর্য, আমরা জেল ছাড়বার পরক্ষণেই জেলের প্রায় সব অফিসাররা আমাদের বন্ধুদের বলেছিল যে, আমরা বর্মায় পাড়ি মারছি। আরও আশ্চর্য, বর্মার জেলে পৌছে দেখলাম, আমাদের বদলির পরোয়ানা ভারত গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী সই করেছে ১৯২৪ সালের ১৬ই জানুয়ারী।

গাড়ী খড়্গপুরে পৌছাতে দেখলাম, প্লাটফর্ম খালি ক'রে রেখেছে, আমাদেরও প্লাটফর্মে দাঁড়াতে দিল না, একটি পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট হাজির ছিল, সে সোজা ষ্টেশনের দোতলার ঘরে নিয়ে বসাল।

বিকেলের দিকে যখন হাওড়ায় পৌছালাম, ভাবছিলাম, প্রেসিডেন্সি বা আলিপুর জেলে নিয়ে যাবে, অথবা হয়তো শিয়ালদয় নেবে অন্য

কোনো জেলের পথে। সঙ্গে যে ইউরোপিয়ান ইন্‌স্পেক্টারটি ছিল, সে কিন্তু ট্যাক্সিওয়ালাদের বললো, "লালবাজার"।

আমি জীবনকে বলি, ষ্টেট প্রিজনার, লালবাজার বলে কি হে? সতীশদা ও জ্যোতিষবাবু একটু হাসেন।

লালবাজারে তো মালপত্রসহ ঢুকিয়ে দিল একটি ঘরে চারজনকেই। বিছানা বিছিয়ে বসে গভীর গবেষণা করি—জেল থেকে উল্টাপথে থানায় কেন?

তবে কি মামলা?

কিছুদিন আগেই চট্টগ্রামে রেল কোম্পানীর টাকা ডাকাতি হয়ে গেছে। কার মুখ দিয়ে নামটা প্রথম বের হ'ল, ঠিক মনে নেই, তবে যে-নামটি চার জনেরই মনে বিরাজ করছিল, সে "টুনু সেন"।

সতীশদা বললেন, "নির্ঘাত"।

জ্যোতিষবাবু আমার আর জীবনের সাথে খুব হাসছিলেন, বললেন, এবারে রক্ষে নেই।

আমরা সবাই মোটের উপর সিদ্ধান্ত ক'রে নিলাম, চাটগাঁয়ে একটি ষড়যন্ত্রের মামলা হবে, এবং তাতে রাজসাক্ষী দাঁড়াবে টুনু সেন।

খবর নেবার জন্যে উচাটন হয়ে পড়লাম, আর কাকে কাকে অন্য কোন জেল থেকে অথবা নতুন ক'রে ধ'রে নিয়ে আসে একসঙ্গে চাটগাঁয় চালান দেবার জন্যে।

একজন রাইটার কনষ্টেবল আমাদের খাওয়াদাওয়ার তত্ত্বতলাসি করছিল। তাকে বার বার জিজ্ঞেস করি, আর কাউকে এনে অন্য কোনো ঘরে রেখেছে কি না। বার বার এসে বলে, না।

সন্ধ্যার পর হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে বলে, দুজনকে এনেছে প্রেসিডেন্সি জেল থেকে। প্রেসিডেন্সি জেলে দুজনাই ছিলেন—পূর্ণদা ও বিপিন

গাঙ্গুলি—আমরা আগেই জানতাম। তাঁদের আর একটা ঘরে নিয়ে বন্ধ করলো।

এবারে আমাদের সন্দেহের অবকাশ রইলো না যে, টুনু সেনের কল্যাণে আমাদের ষড়যন্ত্রের মামলায় পড়তে হবে। কারণ, আমাদের পুরোনো পাপীদের মধ্যে ঠিক এই ছয়টি লোকেরই টুনুর সঙ্গে প্রত্যক্ষ-ভাবে কাজের যোগ।

তার জেলার তরফ থেকে টুনুকে যখন আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে কলকাতা পাঠানো হয়, তখনও আমি জেলে। টুনু এসে পুর্ণদার সঙ্গে আলাপ করে, আমি খালাস হতেই পুর্ণদা আমার সাথে পরিচয় করিয়ে দেন। আমি জ্যোতিষবাবু, জীবন, সতীশদার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই, আর, আমার যখন বসন্ত, সেই সময় মুষ্টিযুদ্ধ শিখবার জন্য, ও আমায় ব'লে আমার পরিচয়ে বিপিনবাবুর সঙ্গে পরিচয় করে। তারপর অসহযোগ আন্দোলন শেষ হয়ে যেতে দলের ভিতর আলোচনার ফলে যাদুদা যখন অস্ত্রসংগ্রহে সম্মতি দেন, টুনুর সঙ্গে এই কাজে জীবন ও আমি জড়িত হয়ে পড়ি। সতীশদা, জ্যোতিষবাবু ও বিপিনবাবুরও অন্যরকম কাজে ওর সঙ্গে যোগাযোগ হয়।

কিন্তু টুনুর চলাফেরায়, হাবভাবে ক্রমে ওর সম্বন্ধে আমাদের মনে সন্দেহ জমতে থাকে। সে সন্দেহে আমরা যে ভুল করিনি, পরে তা প্রমাণ হয়। গোপীকে বিভ্রান্ত করে আর্নেষ্ট ডে-কে হত্যা করায়; পলাতক সেজে পণ্ডিচেরীতে গিয়ে শ্রীঅরবিন্দের বিপ্লবী কাজে সায় আছে কি না বুঝতে চেষ্টা করে; ১৯২৫-২৬ সালে বিভিন্ন জেলে ঘুরে অল্পবয়স্ক সহকর্মীদের দিয়ে স্বীকারোক্তি করাতে চেষ্টা করে; চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের আগে সামান্য খবর পেয়েই কিছু একটি আয়োজন হচ্ছে সে খবর দিয়ে দেয়; ডালহাউসি স্কোয়ারে যে বোমা ফাটে, সেই বোমা কারা

তৈরী করছিল, সে খবর আগে থেকে দিয়ে রাখে ; চন্দননগরে অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পলাতক আসামীদের বাড়ীটি সম্পর্কে টেগার্টকে ওয়াকিবহাল ক'রে দেয় ; বাংলার জেল ও ক্যাম্পগুলো থেকে ১৯৩১ সালে পুরোনো রাজনৈতিক কর্মী জনকতককে ৩নং রেগুলেশনে বাংলার বাইরে চালান ক'রে দেবার পর বিভিন্ন জেল ও ক্যাম্প ঘুরে ঘুরে দলের ভিতর ভাঙন আনবার কাজ করে। এই ভাবে বাংলার আই. বি. পুলিশের কাছে এর দান অসামান্য। এ প্রথমে ছিল মেদিনীপুরবাসী একজন আই. বি. কর্মচারীর source বা গোপন খবরের উৎস এবং পরে হয় টেগার্টের খাস চর। এই ধরনের adventurer বাংলার বিপ্লবীদলে কম জুটেছে। আগে যে মিহির ঘোষের নাম করেছি, তার কথা আবারও বলতে হবে। আধুনিক ভাষায় দু'জনেরই অবদান প্রায় সমান সমান। ফলে, দু'জনের যে প্রতিযোগিতা, তারই নিদর্শন ফুটে ওঠে আরও বছরখানেক পরে : টুনুর উত্তেজনায় ও আয়োজনে মিহিরের দোকানে বোমা পড়ে। ইতিমধ্যে আমি ও জীবন বর্মার বেসিন জেল থেকে সেক্রেটারী অব ষ্টেটের কাছে এক দরখাস্ত পাঠাই, তার নকলের সঙ্গে দেশবন্ধুর কাছে যে চিঠি দিই, তাতে মিহিরের কার্যকলাপ সম্পর্কে অনেক কথা ছিল, দেশবন্ধু সে চিঠিও প্রকাশ করে দেন। ফলে মিহির সরাসরি আই. বি.-র চাকরী নিয়ে যুক্তপ্রদেশে চলে যায়।

এসব পরের ঘটনা। সেই রাত্রে যখন আমরা চারজনাই পাকা ধারণা করে বসলাম যে, ষড়যন্ত্রের মামলার আসামী হয়ে আমরা চাটগাঁয় যাচ্ছি, যার কাছে যা চিঠিপত্র ছিল, যার খাতায় রাজনৈতিক লেখা যা-কিছু ছিল, সব ছিঁড়ে টুকরো টুকরো ক'রে ফেললাম। জীবন সেগুলোকে একটা মগের ভিতর সাবানজলে গুলে পায়খানায় ঢাললেন।

রাত ভোর হবার আগেই বহু জুতার শব্দ সিঁড়িতে। একটি

আই. বি. অফিসার ঘরের দরজায় এসে বলে, আপনারা মুখ হাত ধুয়ে নিন। এখনই বের হতে হবে।

এপর্যন্ত সব মিলে যাচ্ছে—ভোরবেলায় চাটগাঁ একসপ্রেস ছাড়ে।

থানার সামনে খোলা একখানা ভ্যানে যখন তুললো—পেছনে অন্যান্য ভ্যানে অগণিত পুলিশ—ভ্যানগুলোর মুখ দেখি গঙ্গার দিকে। বল্‌লাম, আউটরাম ঘাট, আজ শুক্রবার, তা হলে তো রেঙ্গুন ?… আজ অবশ্য চাটগাঁর জাহাজও ছাড়বে। (তখনকার দিনে কলকাতা থেকে চাটগাঁ পর্যন্ত সপ্তাহে একখানা করে জাহাজ যেত।)

কুমার মজুমদার ব'লে একটি আই. বি. অফিসার সঙ্গে। পূর্ণদা তাকে জিজ্ঞেস করেন, বলুন না মশাই, কোথায় যাচ্ছি ?

সে বলে, ঐ তো ভূপেনবাবু বল্‌লেন।

ঘাটে গিয়ে দেখি, আরও পুলিশ দড়ি ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে, জেটির সামনে কাউকে দাঁড়াতে দেয়নি। গ্রীনফিল্ড ব'লে একটি স্পেশাল স্থপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অব পুলিশ আমাদের রক্ষীদলের চার্জে। ডাক্তার দাঁড়িয়ে—তিনি আমাদের বুকে হাত ছুঁইয়ে পরীক্ষা করবার আগে জিজ্ঞেস্ করেন, **Are all these six gentlemen going to Rangoon ?"**

গ্রীনফিল্ড একটু থতমত খেয়ে বলে, **Yes.**

আমরা পরস্পরের মুখের দিকে চেয়ে হাসি।

মনে পড়ে পনের বছর আগের কথা। বর্মার দিকে এমনি ক'রে পাড়ি মেরেছিলেন আর চারজন বাঙালী : শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, রাজা সুবোধ মল্লিক, সতীশ চাটার্জি ও মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা। তার আগে লালা লাজপৎ রায় ও সর্দার অজিত সিং। আরও এক জনকে ছয় বৎসরের কারাদণ্ড ভোগ করতে বর্মায় যেতে হয়েছিল, তিনি লোকমান্য বাল গঙ্গাধর তিলক।

জাহাজে উঠে দেখি—ব্যবস্থা : আমি ও সতীশদা থাকব এক কেবিনে, জ্যোতিষবাবু ও জীবন এক কেবিনে এবং পূর্ণদা ও বিপিন-বাবু এক কেবিনে। প্রত্যেক কেবিনে একজন করে আই. বি. সাব ইন্‌স্পেক্টার, দরজায় একটি ক'রে সঙ্গিনধারী পুলিশ। আর কেবিন-গুলোর ঠিক সামনে কয়েকটি জমাদার, হাবিলদারসহ আরও জনকুড়ি পুলিশ। আর গ্রীনফিল্ড দূরে—তার প্রথম শ্রেণীর কামরায়। আমাদের মালপত্রগুলো রইলো পুলিশের হেফাজতে।

নোঙর তুলে জাহাজ ঘুরিয়ে ছাড়তে অনেক সময় নিল। আমরা একে একে ডেকের উপর এসে জমলাম—আই. বি.-র লোকগুলো পিছনে। খিদিরপুরের নীচে গ্রীনফিল্ডের ইঙ্গিতে ওরা আমাদের কেবিনে ডেকে নিয়ে এল। একটু বাদে আবার যথারীতি ডেকে এসেই বসলাম। ওরা তখন বলে, আপনারা যার যার ব্যাচের বাইরে পরস্পরের সঙ্গে কথা বলবেন না।

একটু হাসি—মনে মনে বলি, তেমনি সুবোধ বালকই পেয়েছ! আমরা ছ'জন একসঙ্গেই ঘুরি, কথাবার্তা বলি। ওরা গ্রীনফিল্ডের সাথে পরামর্শ ক'রে এসে বলে, আপনারা মেদিনীপুর থেকে যে চারজন এসেছেন, তাঁরা একসঙ্গে কথা বলতে পারেন, আর ওঁরা দুজন আলাদা। তিনটি অফিসার—কুমার মজুমদার, জয়নারায়ণ মিত্র এবং ভুজেন সরকার। এর ভেতর ভুজেনটিই পেছনে ফিঙে হয়ে লেগে থাকে। বার বার এসে বলে, আপনারা একসঙ্গে কথা বলছেন—সাহেব দেখলে আমাদের চাকরী যাবে।

ভারি আমাদের দুঃখু হবে—মনে মনে বলি।

কিন্তু এই খেলা বেশীক্ষণ চললো না। সাগর দ্বীপ পার হবার আগেই পূর্ণদার বমির বেগ সুরু হলো—বলেন, খাবার ঘরে কি মাংস

খেতে দিয়েছে, আমার বেজায় অভক্তি লাগছিল। তিনি শয্যা নিলেন। সতীশদা আর জ্যোতিষবাবু অসুস্থ মানুষ—তাঁদের তো কথাই নেই। বিপিনবাবু মুখে কিছু বলেন না, বাইরেও কম আসেন—তাঁর গুরুগম্ভীর মর্যাদাবোধেও তিনি বিছানা থেকে ওঠাটা তেমন পছন্দ করেন না। খানিকটা রাত অবধি ডেকে ঘুরে বেড়াই বা ডেক-চেয়ারে বসে কাটাই আমি ও জীবন। খোলা হাওয়ায় ঘুরে বেড়ালে গা বমি বমি কম করে।

ওদিকে অফিসারদের মধ্যেও জয়নারায়ণ ও কুমার ফ্ল্যাট—একমাত্র ভুজেনই কর্ত্তব্যপরায়ণ।

পরের দিন কড়াকড়ি কেটে গেল। গ্রীনফিল্ড ডেক্ টেনিসে মেতে উঠলো। কুমার ছিল সাহিত্য-বাতিক-গ্রস্ত। কি নাকি উপন্যাস লিখেছিল—শরৎবাবুর অনুকরণে বর্মা এনে ফেলেছে তার ভিতর। তাই উপর ওয়ালাদের ব'লে বর্মার সাথে সাক্ষাৎ পরিচয়ের এই সুযোগ নিয়েছে। ডেকচেয়ারে একখানা খাতা হাতেই অনেক সময় কাটাতে চেষ্টা করে। কিন্তু মাথা ঘোরে। আমাদের কেবিনে এসে জয়নারায়ণের সাথে শুয়ে শুয়ে গল্প জোড়ে। এদের গল্পের ফাঁকে ফাঁকে আমার একটা পরিচিত গল্পের হারানো সূত্র খুঁজে পাই। গল্পটা এখানে বলব—বাংলার অপ্রকাশিত ইতিহাসের সেটা একটা অঙ্গ।

১৯২০ সালের ডিসেম্বরে খালাস হয়ে রাজসাহী থেকে যেদিন এসে কলকাতায় পৌছাই, সেই রাত্রেই চন্দননগরে যাই পলাতক অতুলদার (ঘোষ) সঙ্গে দেখা করতে। সঙ্গে কুন্তল ও সুরেশ দাস।

অন্য নানা কথার পর অতুলদা একটি কাহিনী বলেন—কিছুকাল আগে থেকে মধ্যবয়স্কা একটি মহিলা গঙ্গার ধারে একখানি বাড়ী ভাড়া নিয়ে ওখানে আছেন। মহিলাটির বাবা কাশ্মীরি পণ্ডিত, মা ফরাসী,

স্বামী একজন পাঞ্জাবী ডাক্তার—রেওয়া ষ্টেটে চাকরী করেন। মহিলাটি ইংরাজী ও উর্দুতে খুব তোড়ের সাথে কথা বলেন, অন্য কি ভাষা জানেন না জানেন জানা নেই। নিজের পরিচয় দেন ম্যাডাম দাস ব'লে। স্বামী পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের ভক্ত। মহিলাটি বাংলা দেশে একখানি খবরের কাগজ বের করবেন ব'লে মালব্যজীর অনুরোধে স্বামীর অনুমতি পেয়ে বাংলায় এসেছেন।

আসলে কিন্তু এঁর মিশন ভিন্ন। রাওলাট রিপোর্টে "রেশমী রুমাল ষড়যন্ত্র" ব'লে যে অধ্যায়টি আছে, তার নায়ক ছিলেন রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ ও শেখ-উল-ইসলাম-ই-হিন্দ। আলী ভ্রাতৃদ্বয়, ডাঃ কিচলু, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু প্রভৃতি আরও অনেকে এর ভিতর কাজ করেছিলেন। বিদেশে হেরম্বলাল গুপ্ত, বীরেন চট্টোপাধ্যায়, এম. এন. রায় প্রভৃতিও এঁদের সঙ্গে একযোগে কাজ করছিলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের জন্য এক অস্থায়ী বিপ্লবী সরকারও গঠন করেছিলেন। তখনকার তাঁদের চেষ্টার ফলে টার্কি থেকে কতকগুলি অস্ত্র ও টাকা এসে জমে আফগানিস্থানে। আমানুল্লা গবর্ণমেন্ট সেগুলিকে দুই রাষ্ট্রের মাঝখানে যেসব উপজাতির দেশ আছে, সেখানে পাঠিয়ে দেন। এখন এইগুলিকে কি ক'রে দেশের ভিতর আনিয়ে ফেলা যায় ম্যাডাম দাস সেই চেষ্টায় ব্যাপৃত।

তাঁর ধারণা, বাঙালী বিপ্লবীরা এই ধরণের কাজ আগে করেছেন, তাঁদের এসব ব্যাপারে অভিজ্ঞতা আছে, কাজেই একাজে তাঁদের সাহায্য পেলে বিশেষ সুবিধা হবে। সেই সাহায্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যেই তিনি বাংলায় আছেন। এখানে তিনি মৌলানা আজাদের নির্দেশমত কাজ করেন।

দু'একজন মুক্ত রাজবন্দীর সঙ্গে ইতিপূর্বে আলাপ করেছেন।

-সুবিধা হয়নি। তিনি বললেন, তিনি খুঁজছেন অতুল ঘোষকে ও ভূপেন দত্তকে। শুনেছেন, এরা বিশ্বাসযোগ্য—পলাতক অতুল ঘোষকে পুলিশ বিশেষ ভয় পায়, আর ভূপেন দত্ত ধরা পড়ার পর পুলিশকে বেপরোয়া ধমক ধামক করেছেন।

অতুলদা দু'একদিন দেখা ক'রে ম্যাডাম দাসের সব কথা জেনে নিয়েছেন। কিন্তু আর বেশী দেখা সাক্ষাৎ করতে চান না: ম্যাডাম দাস ভালও হ'তে পারেন, আবার স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের চরও তো হ'তে পারেন। অতুলদা তখনও পলাতক, পাঁচ হাজার টাকার হুলিয়া জারি আছে তাঁর বিরুদ্ধে। তাঁর ধারণা, তাঁরই নাম যে অতুল ঘোষ, সেকথা ম্যাডাম দাস জেনেছেন—যদিও রাতে রাতে দেখা করেন ব'লে ম্যাডাম দাস তাঁর নাম দিয়েছেন মিঃ ব্যাট।

অতুলদা ম্যাডাম দাসের কাছে আর যাওয়া আসা করতে চান না। আমরা আলাপ ক'রে যদি ভাল বুঝি, এই ব্যাপার নিয়ে যা খুসি করতে পারি।

ঐ রাত্রেই আলাপ ক'রে স্থির হ'ল, ম্যাডাম দাস কলকাতা এসে মৌলানা আজাদের সঙ্গে আমার ও কুন্তলের আলাপ ক'রে দেবেন। তারপর আমরাই যা হয় করব, ম্যাডাম দাস আর ওর ভিতর থাকবেন না।

তা-ই হ'ল। ইতিমধ্যে যাদুদা তাঁর পলাতকের আশ্রয়স্থল থেকে একবার এলেন, ভবিষ্যৎ কর্মপদ্ধতি নিয়ে আলোচনা হ'ল। গান্ধীজির সংগে, শ্রীঅরবিন্দের সংগে, অন্যান্য নেতাদের সংগে আমার যা সব কথা হয়েছিল, সব শুনলেন। আমরা কাজের যে-ধারা ধরতে চাই, তাতে অনুমোদন জানালেন। এই ব্যাপারটা সম্পর্কে বললেন, প্রকাণ্ড একটা জাতীয় আন্দোলন এসে পড়েছে, তোমরা তাতে ঝাঁপিয়ে

পড়তে যাচ্ছ। ঠিক এই রকম সময় বিদেশী ষড়যন্ত্রের সঙ্গে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহের ব্যাপারে তোমরা যদি জড়িত হয়ে পড়, সমস্ত আন্দোলনটিরই ক্ষতি হ'তে পারে। এই অস্ত্র ও টাকার লোভ তোমরা সংবরণ কর এবং মৌলানা আজাদকেও সেই রকম জানিয়ে দাও।

মৌলানা আজাদ ধুরন্ধর লোক। সব শুনে তিনি বল্লেন, কংগ্রেসের বিশেষ লাইনটি তাঁরাও ধরেছেন, কাজেই স্থির করেছেন, এ ব্যাপার থেকে তাঁরা হাত ধুয়ে ফেলবেন।

কিছুদিনের ভিতরই টের পেলাম, হাত তাঁরা ধুয়ে ফেলেন নি। আমরা ও কাজ হাতে নেব না জেনে আর চারটি লোককে লাগিয়েছেন। এঁদেরও নাম বদ্‌লে বল্‌ছি : ফজলুল করিম, আবদুল গণি, আশুতোষ মিত্র ও মিহির ঘোষ।

মিহির ঘোষের কথা আগে বলেছি। জেল থেকে বেরিয়ে এসে সে যখন আমায় তার জালে ফেলতে চেষ্টা করে তখন দেখি, সর্বদিক থেকে লোকটি জঘন্য প্রকৃতির। তখনকার দিনের রাজনীতির এক আড্ডায় আমায় নিয়ে গেল, দেখাল, হাজার হাজার টাকার খেলা। আর এক জায়গায় দেখলাম, এম্‌নি টাকা সে অবাধে আত্মসাৎ করলো। মেয়েদের সঙ্গে ইতর ব্যবহারও চোখে পড়লো। পুলিশের সঙ্গে তার সম্পর্কের কথা আগেই জানি। কাজেই এড়িয়ে চলি। ও কিন্তু আমার আশা ছাড়ে না।

তখন সে কলকাতায় এক সরবতের দোকান করেছে। মৌলানা আজাদের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগের কথা ও কিছু টের পায়নি। একদিন আমায় ডেকে বাদামের সরবৎ খাওয়াতে খাওয়াতে সীমান্ত প্রদেশের বাইরে জমা অস্ত্রের কাহিনী পাড়ে। কি ক'রে জানলো সঠিক জানিনে। পুলিশ থেকেও মৌলানা সাহেবের পেছনে লাগাতে

পারে; অথবা অসহযোগের দিনের ছাত্র-ক্ষ্যাপানো বক্তা ফজলুল করিম, আবদুল গণি ও আশুতোষ মিত্রকে একদিকে মৌলানা আজাদের সহকর্মীরা দলে টানতে চেষ্টা করছিলেন, অপর দিকে মিহিরও তার জালে টান্‌ছিল। আশুতোষ তো শেষ পর্যন্তই সেই জালে থেকে যায়।

সে যা-ই হোক্‌, মিহির এখন আমায় বলে, মৌলানা তো প্রথমটা আমায় বিশ্বাস করেননি, পরে জওহরলালের কাছ থেকে পরিচয়পত্র এনে মৌলানার বিশ্বাসভাজন হয়েছি। এখন আমরা চারজন যাচ্ছি, সীমান্তপ্রদেশের বাইরে থেকে অস্ত্র ও টাকা আনার ব্যবস্থা করব।

সর্বনাশ! পাছে কংগ্রেস আন্দোলন আঘাত খায়, এই আশংকায় আমরা এই ব্যাপার থেকে সরে দাঁড়িয়েছি—আর, এখন মৌলানা মহম্মদ আলি, শৌকৎ আলি, আজাদ, পণ্ডিত জওহরলাল প্রভৃতি মিহির ঘোষের জালে জড়িয়ে পড়ছেন!

কুন্তল ভাল উর্দু বলতে পারতেন, তিনিই মৌলানার কাছে যাওয়া আসা করতেন। মিহির সম্পর্কে ওকে সাবধান ক'রে দিয়ে এলেন। মৌলানা সাহেব বললেন, এর বিহিত যতোটা পারা যায় করবেন।

শুনলাম, ওদের চারজনকে ডেকে তিনি বলেছেন, অস্ত্র আনতে হবেই, সে সব ঠিকই আছে, 'লেকিন' (মৌলানা সাহেবের প্রসিদ্ধ 'লেকিন') অস্ত্র এনে তো জমিয়ে রাখা চলবে না। আমাদের এমন দল নেই, যার ভিতর আসামাত্র অস্ত্র ছড়িয়ে দেওয়া চলে। আপনারা চারজন বেরিয়ে বাংলায়, বিশেষ ক'রে পূর্ব বাংলায় দল গড়ুন, তার পর অস্ত্র আনতে যাবেন।

ফজলুল করিমকে কিন্তু আলাদা ক'রে ডেকে মৌলানা সাহেব আলাদা কথা বলেন। ফলে, অপর তিনজন পূর্ববঙ্গে রওনা হয়ে যায়,

ফজলুল করিম কলকাতায়ই রয়ে যায়। মিহিরও কম যায় না। সে ফজলুল করিমের গতিবিধির খবর পাবার ব্যবস্থা রেখে পূর্ববঙ্গে যায়।

খবর পেয়ে মিহির যেদিন বিক্রমপুর থেকে কলকাতায় এসে পৌঁছাল, ফজলুল করিম সেই দিনই বা তার আগের দিন পেশোয়ার রওনা হয়ে গেছে। পুলিশে খবর পৌঁছে গেল।

এই পর্যন্ত খবর আগেই জানতাম। এখন কুমার ও জয়নারায়ণের গল্পের ভিতর থেকে, খবর পেলাম, ওরাই যায় ফজলুল করিমের পেছনে পেছনে। তারপর সীমান্তপ্রদেশের পুলিশ ও মিলিটারীর সাহায্য নিয়ে যেখানে সেই অস্ত্র ও টাকা ছিল, সেইখানে ঐ সব সমেত ফজলুল করিমকে ধরে। ফজলুল করিম যা-কিছু জানতো সব ব'লে দেয়। ফলে তাকে মুক্তি দেওয়া হয়। তার বিরুদ্ধে রাজদ্রোহজনক বক্তৃতার একটা মামলা ছিল, তাও তুলে নেওয়া হয়।

এই অস্ত্রের কিছু অংশ দুটি একটি করে এর ওর মারফত বাংলায় আগে এসে পৌঁছে গিয়েছিল। আমাদের কোনো কোনো বন্ধু এবং কয়েকজন খিলাফৎ কর্মী সেগুলি সংগ্রহ করেছিলেন।

গল্পটা শোনার আমার প্রয়োজন ছিল। শোনবার জন্যে অন্যমনস্কতা বা ঘুমের ভানও করতে হচ্ছিল। কিন্তু নিশ্চিন্তে গল্প শুনেই জাহাজের দিন কাটছিল না। বিড়াল ছানা পার করার মতো চুপিচুপি বস্তা ভর্তি করে বর্মায় নিয়ে চলেছে। পুলিশের খবরদারি যতই থাক্‌, খবরটা দেশকে ও দুনিয়াকে জানাতে হবেই।

জাহাজের বেতার বিভাগে কাজ করে একটি ছেলেকে পাওয়া গেল। উত্তরপাড়ায় বাড়ী, আলাপে জানতে পেলাম উত্তরপাড়া বিদ্যাপীঠে এক আধবার গেছে। আমাদের যে কোন কাজ করতে পেলে খুসি হয়। কিন্তু এক কথায় তো কাজ নয়। আমাদের

ছু'জনারই নাম পরিচয় মুখস্ত করিয়ে দিতে হবে, রেঙ্গুনে কাকে কি বলতে হবে, এ সব শেখাতে সময় লাগে। জীবন ও আমি ফাঁকে ফাঁকে ধরি। ভুজেন সরকার পিছু ছাড়ে না। দেখছে, ঘুরেফিরে হয় ছেলেটি আমাদের কাছে আসছে, না হয় আমরা কেউ ওর কাছে যাচ্ছি। গোড়া থেকেই দেখছে, আমাদের ব'লে কোনো লাভ নেই। তখন ছেলেটিকে এক ফাঁকে ধ'রে বলেছে, সাবধান, এরা ষ্টেটপ্রিজনার, আমরা আই. বি., এদের সংগে যদি কথা বলেন, আমরা রিপোর্ট করলে আপনার চাকরী নিয়ে টানাটানি হবে। ছেলেটি কথাটা আমাদের এক ফাঁকে জানালো। আমরাই তখন ওর থেকে দূরে দূরে থাকি। আমাদের জন্যে বেচারীর কেন অনিষ্ট হয়?

এরপর খুঁজে বের করা গেল আর একটি ছেলেকে। ভবানীপুরে বাড়ী। আই. এ. পড়তে পড়তে অসহযোগ আন্দোলনের ভিতর পড়া ছেড়ে দিয়েছে। স্থভাষের বাড়ীতে আনাগোনা ছিল। এখন বর্মায় এক আত্মীয়ের কাছে বেড়াতে যাচ্ছে।

ভুজেন একেও ধমক-ধামকে দমিয়ে দিতে চেষ্টা করে। কিন্তু এ তো চাকরী করে না—বাটপাড়ের ভয় বিশেষ কাজে লাগলো না। সবাই মিলে ছেলেটিকে সাথে নিয়ে ডেক চেয়ারে বসা গেল। পূর্ণদা রীতিমতো বক্তৃতা দিয়ে আমাদের এক একজনের নাম পাঁচবার সাতবার ব'লে ওকে মুখস্থ করিয়ে দিতে চেষ্টা করলেন, এবং প্রত্যেকের প্রায় জীবনের ইতিহাস ব'লে দিলেন। এ সব হ'ল তিনটি আই. বি. অফিসারেরই সামনে। কেবল গোপনে ব'লে দেওয়া হ'ল—অধ্যাপক নৃপেন্দ্রচন্দ্র ব্যানার্জী তখন "রেঙ্গুন মেল" কাগজের সম্পাদক—রেঙ্গুনে তাঁর সংগে দেখা ক'রে আমাদের কথা সব তাঁকে জানাবে।

এত নাম পরিচয় ছেলেটির মনে না-ও থাকতে পারে। পায়খানায়

বসে টয়লেট পেপারে সব লেখা হ'ল, বাথরুমের দরজায় ওর হাতে দিয়ে মোড় ঘুরতেই দেখি, ভুজেন সামনে। ছেলেটিরও পায়খানায় ঢুকে পড়তে দেরি হয়নি। ভুজেন দেখতে কিছু পায় নাই, কিন্তু সন্দেহ করেছে। পেছনে পেছনে ঘুরে ক্রমাগত সওয়াল জবাব। কিছু লাভ হ'ল না—আমরা রেঙ্গুন সহর ছাড়তে না ছাড়তেই "রেঙ্গুন মেলের" বিশেষ সংস্করণে বাঙালী রাজবন্দীদের গোপনে বর্মায় পাঠাবার খবর বেরিয়ে গেল—সব নাম পরিচয় সহ। তবে বর্মার কোন্ জেলে কে গেল, তা বের হতে কয়েকদিন সময় লাগলো।

সমুদ্রের উপর দ্বিতীয় দিনটি বেশ কাটলো। বিকেলের দিকটায় মেঘ ক'রে অন্ধকার হয়ে এল। সন্ধ্যা হ'তে না হ'তে সব কেবিনে ঢুকে পড়লাম। অনেক রাত্রে খুব ঝড় উঠলো, জাহাজে সাইক্লোনের ঘন্টিও বাজিয়ে দিল। একবার বাইরেটা দেখে এলাম। ডেকের উপর দিয়ে এদিকের ঢেউ ওদিকে ভেঙ্গে গড়িয়ে পড়ছে, জাহাজ যেন ডুব সাতার দিয়ে এগিয়ে চলেছে। অনেকের বমি হ'ল। আর বিশেষ কিছু নয়।

পরদিন খবর শুনলাম, আমাদের বইকাপড়ের বাক্স সব ডেকের উপর ছেড়ে রেখেই পুলিশ পুঙ্গবরা কর্তব্য সাধন করেছেন নিজ নিজ লোটাকম্বল নিয়ে স'রে প'ড়ে। নোনাজলে বইকাপড়গুলো শেষ হবে—hurricane deckএ উঠে ওগুলোকে শুকিয়ে নেওয়া গেল।

বিকেলের দিকে আবার মেঘ আর আঁধার জমলো। জীবন আর আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কালো কালো ঢেউগুলো দেখছি, আর বন্ধু-বান্ধবের সম্বন্ধে অস্ফুটে দু'একটা কথা বলছি বা শুনছি। কুমার মজুমদার সাহিত্যচর্চার খাতা গুটিয়ে পাশে এসে দাঁড়ালো। জীবনের উৎকণ্ঠা কানায় কানায় ভরে উঠেছিল আমার উৎকণ্ঠার সাথে মিলে; শুধু নিজের হ'লে হয়তো চুপ করেই সয়ে যেতে পারতেন।

চারু ঘোষ

কুমার এসে একটু সহানুভূতির সুরে আলাপ জমাতে চেষ্টা করে: জেলেই তো বন্ধ করে রেখেছে, আবার পাঠিয়ে দিচ্ছে কোন্ বিদেশে বিভূঁয়ে, কালে ভদ্রেও একবার আপনার জন কারও সংগে দেখা হবে না।

জীবন বলেন, তার জন্যে ভাবছিনে। ভাবছি, একটি বন্ধুর কথা, বহুমাস হয় চিঠি পাইনে, চারু ঘোষ, দীর্ঘকাল যাবত থাইসিসে ভুগছিলেন, ভাওয়ালিতে ছিলেন…

সম্প্রতি মারা গেছেন—এইতো ?—বল্‌লো কুমার।

মারা গেছেন ?

আমি ঠিক বলতে পারিনে, আমার ভাল মনে নেই, কয়েকদিন আগে খবরের কাগজে মনে হয় এই রকম কার একজনের কথা পড়েছিলাম। নামটা আমার ঠিক মনে নেই।

বুঝলাম সবই।

দাঁড়িয়েই রইলাম। জীবনও একটি কথা না ব'লে আমার হাতখানা ধ'রে দাড়িয়ে রইল—কতক্ষণ খেয়াল নেই।

সমুদ্রের অবিশ্রান্ত গর্জনও একটা গভীর নিস্তব্ধতা। আর সব নীরব, আঁধার। রাত হয়ে গেছে। জীবন টেনে নিয়ে আসে কেবিনের দিকে। চলতে চলতে অনেককাল আগের পড়া একটা কবিতার একটুকরো মনটা অকস্মাৎ আওড়াতে শুরু করলো।

…"Comes he thus, my friend ?
Is this the end of all my care ?
And circle moaning in the air
'Is this the end ? Is this the end ?'

রোজ রাত ভোর হয়। আজও হ'ল।

রেঙ্গুনের ঘাট।

বর্মার আই. বি-র ছোটকর্তা যোগেন ভট্টাচার্য ঘাটে হাজির। আমাদের চার্জ বুঝে নিল। জিজ্ঞেস করে, ভূপেনবাবু কে?

আমি।

আপনি আর সতীশবাবু একসঙ্গে ছিলেন তো?

হাঁ।

কিন্তু এখন আপনি আর জীবনবাবু একসঙ্গে যাবেন।

কি হ'ল আবার?

পরে আমরা টেলিগ্রাম পেয়েছি, আপনাকে আর সতীশবাবুকে একসঙ্গে রাখা চলবে না।

কে কোথায় যাব, এখনও বুঝলাম না, তবে এটুকু বুঝলাম, এই সুদূর বর্মামুলুকেও আমরা দুজনের বেশী একসঙ্গে বা এক জেলে থাকতে পাব না।

একখানি মোটর লঞ্চ এসে পাশে ভিড়লো। আমাকে আর জীবনকে তাতে তুলে দেওয়া হ'ল। এখন সঙ্গী হ'ল বর্মার পুলিশ। এতক্ষণ যা গোপন ছিল, আমাদের নিয়ে চলেছে যে এংলো-বার্মিজ রিজার্ভ ইন্‌স্পেক্টরটি, সে তা খোলাখুলি ব'লে দিল। আমরা দু'জন যাচ্ছি বেসিন সেণ্ট্রাল জেলে। এখনি আর একখানা লঞ্চ ছাড়বে, তাতে যাবেন সতীশদা আর জ্যোতিষবাবু থেইটমিও সেণ্ট্রাল জেলে। পূর্ণদা আর বিপিনবাবু সারাদিন জাহাজেই কাটাবেন। সন্ধ্যায় ট্রেণ ছাড়বে, সেই ট্রেনে তাঁরা যাবেন মৌলমিন ডিষ্ট্রিক্ট জেলে।

এই ইন্‌স্পেক্টরটি ছাড়া আর ছিল কয়েকটি গাড়োয়ালী পুলিশ আমাদের পাহারায়—যেমন বুদ্ধিমান এরা, তেমনি চমৎকার এদের ব্যবহার। নিজেদের নোকরিকে এরা ঘৃণা করে—বোঝে, নিজেদের

দেশের স্বার্থের বিরুদ্ধে কাজ ক'রে পেটের খোরাক জোটাচ্ছে। যতবারই গাড়োয়ালী পুলিশের সাথে চলেছি, দেখেছি যেন এরা পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে ছোটখাটো কাজে আমাদের সাহায্য ক'রে।

এর ঠিক বিপরীত ছিল আমাদের এযাত্রার পাচকটি। এ এক অভিনব পাচক—এমনকি, আমাদের রাজবন্দী জীবনের এত বছরের সামগ্রিক অভিজ্ঞতায়ও।

আমরা বিশিষ্ট কয়েকটি বাঙালী আসছি, পথে রেঁধে খাওয়াবার জন্য একজন পাচকের প্রয়োজন। প্রতিবেশীর বাড়ীতে বেড়াতে এসেছিল—যোগেন ভট্টাচার্যের অনুরোধে সেই প্রতিবেশীই একে বলেছে আমাদের সংগে আসতে। এই পরিচয় প্রথমটায় দিল আই.বি.র এই এ্যাসিষ্টাণ্ট সাব-ইন্‌স্পেক্টরটি। রিজার্ভ ইন্‌স্পেক্টরটি বোধ হয় অতশত জানে না। আমাদের বলে, দেখুন, ও আপনাদের রেঁধে খাওয়াবে, যদি ভাল না রাঁধতে পারে, লাথি মেরে তাড়িয়ে দেবেন, আমি অন্য পাচক যোগাড় করে দেব। আই. বি.র লোকটি—অপমানটুকু অক্লেশে হজম করলো। যদিও ভাদুড়ি নামক এই জীবটি যোগেন ভট্টাচার্যের ভাগ্‌নে।

সারাদিন কিন্তু ওর আই. বি. পরিচয় আমাদের কাছে গোপনই রাখলো। জীবন আর আমি অবিশ্যি বুঝে নিয়েছিলাম কোন্ ধরণের একটি শিক্ষিত বাঙালী যুবককে যোগেন ভট্টাচার্য আমাদের সংগে পাচক ক'রে পাঠাতে পারে।

দক্ষিণ বর্মার নদীনালা জঙ্গল সুন্দরবনের মতো এবং সুন্দরবনের মতোই অবিশ্রান্ত বৃষ্টি। ইন্‌স্পেক্টর এবং লঞ্চের মাঝিরা বললো, রাত হবার আগেই খেয়ে নেবেন, তা না হ'লে এত পোকা হবে যে খেতে পারবেন না। আমরা কিন্তু খেতে বসলাম সন্ধ্যার পর। চারদিকের

কাঁচের জানালা দরজা বন্ধ করে ভিতরের আলো খুললো। খাবার পর বেরিয়ে এসে দেখি ইঞ্চি দুয়েক পুরু হয়ে চারপাশে পোকা জমেছে। তেমনি মশার উপদ্রব। বোধহয় ছদ্মবেশ পূর্ণাঙ্গ করবার উদ্দেশ্যে ভট্টাচার্য ভাগনেকে বিছানা মশারি পর্যন্ত আনতে দেয়নি। আমি আর জীবন একটা বিছানা খুলে দুজনে শুয়ে পড়লাম, ওকে আর একটা বিছানা দিলাম। এটা ও ভাবতেও পারে নি। এর পর সামান্য জেরাতেই রাতের অন্ধকারে ওর ছদ্মবেশ খুলে গেল, স্বীকার ক'রে ফেললো, ও মামারই অনুচর, তবে এখনও নভিস্। সে যে পেকে এ্যাসিষ্টাণ্ট সাব ইন্‌স্পেক্টর হয়েছে, এ স্বীকৃতি পাই আরও কয়েকমাস পরে।

পরের দিন রাত্রিও লঞ্চেই কাটলো। পথে পথে তাজা মাছ কিনতে যেয়ে দেখলাম, এ অঞ্চলের অধিকাংশ জেলে এসেছে পাবনা জেলা থেকে। পরদিন ভোরে বেসিনের ঘাটে আমাদের অভ্যর্থনা করলো ওখানকার পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট গ্রাণ্টহাম।

আলাপ পরিচয় উপলক্ষে বললো, **Many years ago I had the honour to escort the great Tilak from Rangoon to Mandalay.**

আমাদের জেলে পৌছে দিয়ে করমর্দন ক'রে বিদায় নিল।

বর্মার জেলে তিন বৎসর

জেলের ভিতর কোথায় থাকব, সাধারণতঃ আগে থেকেই স্থান নির্দিষ্ট হয়ে থাকে। বেসিনেও তার ব্যতিক্রম হয়নি।

এক প্রান্তে দশটি সেল—সাম্‌নে অ্যান্টিসেল আছে, তারও সামনে আছে মস্ত বড় একটা দোতলা ব্যারাকের একটি সু-উচ্চ দেয়ালের জানালা দরজাহীন নীরেট দিক—আলো বাতাসের প্রতি একটি প্রচণ্ড 'প্রবেশ নিষেধ' বাণী।

সেল ইয়ার্ডে ঢুকেই যাঁকে দেখলাম, তিনি ছিলেন সেই দিন পর্যন্ত ঐ দশটি সেলের সারাদিন রাতের একমাত্র অধিবাসী। রাত্রে অবশ্য অন্য কয়েদিও এনে এখানে বন্ধ করা হয়, ভোরেই তারা চ'লে যায়।

এই বন্দীটির নাম স নে ডুন। বর্মার রাজাদের ভিতর বহু বিবাহ প্রচলিত ছিল। ১৮৮৫ সালে যখন রাজা থিবকে পরাজিত ক'রে ইংরেজ সমস্ত বর্মা অধিকার করে তখন বর্মার ঐসব রাণীর গর্ভজাত পুত্র বা তাঁদের পুত্র, প্রপৌত্র অনেকে বর্মার বিভিন্ন অঞ্চলে বেশ কিছু-কাল যাবত ইংরেজের বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধ চালান। ক্রমে পরাজিত হয়ে অনেকে বন্দী বা মৃত্যুমুখে পতিত হন। কেউ কেউ শান রাজ্যের পথে চীনে চ'লে যান। এম্‌নি এক রাজপুত্র স নে ডুনের পিতা।

বর্মার শানরাজ্যগুলির পূর্বদিকে চীনের ভিতরও কতকগুলি ছোট-বড়ো শানরাজ্য আছে। এরই কয়েক জন শান রাজা স নে ডুনের পিতাকে আশ্রয় দেন। স নে ডুনরা চার ভাই। তার ভিতর তিনি পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনো করেন এবং সেখানে সামরিক শিক্ষাও গ্রহণ করেন। পরে ইন্ কু টি নামে একজন ধনাঢ্য চীনা বন্ধু ও

কয়েকজন শানরাজার সাহায্যে স নে ডুন দশ হাজার রাইফেল সংগ্রহ করেন। চীন ও বর্মা উভয় দিকের শানদের মধ্যে অনেককে যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা দেন। একাজে বর্মার কোনো কোনো শানরাজাও তাঁকে গোপনে সাহায্য করেন। পরে ১৯২৩ সালে স নে ডুন বর্মা আক্রমণ ক'রে ভামোর একাংশ অধিকার করেন। ভামোর ইংরেজ সেনাধ্যক্ষ প্রথম আক্রমণে হ'টে গিয়ে সাদা নিশান উড়িয়ে দেয়। যুদ্ধবিরতির পর জিজ্ঞেস করে, আপনারা কেন আক্রমণ করেছেন? কি চান আপনারা? স নে ডুন বলেন, বর্মা আমাদের রাজ্য, আমরা তা ফিরিয়ে চাই।

ইংরেজ সেনাধ্যক্ষ বলে, আপনাদের রাজ্য আপনারা ফিরে চান, সে তো স্বাভাবিক, কিন্তু এতে তো আমার এখতিয়ার নেই, এমন কি বর্মার প্রাদেশিক সরকারেরও না, ভারত গবর্ণমেণ্টের অনুমতি প্রয়োজন। আশা করি, ভারত গবর্ণমেণ্ট আপনাদের সংগত দাবীতে আপত্তি করবে না। কিন্তু এর জন্য তো সময়ের প্রয়োজন।

কত সময়?

এক সপ্তাহ।

স নে ডুনের ছোট এক ভাই সংগে ছিলেন। তিনি ও ইন্ কু টি সময় দিতে নারাজ। তাঁরা বলেন, ইংরেজ জাত খল। ওদের বিশ্বাস কোরো না।

স নে ডুন বলেন, ইংরেজের ধর্ম ইংরেজের, আমাদের ধর্ম আমাদের। শান্তি ভিক্ষা ক'রে যদি সে শঠতা করে, আমি তা'তে ঠক্‌ব না।

স নে ডুন সময় দিলেন। তাঁর এই প্রাচ্য সততার খেসারত দিতে হ'ল। সাত দিনের ভিতর ইংরেজের প্রচুর সৈন্য এসে পড়লো। তবু

স নে ডুনের সৈন্যদলের প্রথম আক্রমণের ধাক্কা সামলাতে ইংরেজকে বেগ পেতে হয়েছিল। পরে তিনি পরাজিত হয়ে ইংরেজের হাতে বন্দী হন। প্রথম বিচারে ফাঁসির হুকুম হয়। হাইকোর্ট থেকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়। ইন্ কু টিরও সেই সাজাই হয়। ভাই পালিয়ে যান। কিন্তু পরে আবার শান রাজ্যে বিদ্রোহের আয়োজন করতে গিয়ে প্রচুর অর্থসহ ধরা পড়েন। রাজবন্দী হয়ে ইনি ছিলেন মিনজান জেলে এবং ইন কু টি তখন পর্যন্ত মান্দালে জেলে।

স নে ডুন সাধারণ কয়েদির অশনবসনের বেশি কিছু পান নাই। বেসিন জেলের সমস্ত সাধারণ কয়েদিই তাঁর দুঃখে চোখের জল ফেলতো। তখন পর্যন্ত কোনো রাজবংশীয়ের প্রতি এবং ফুঙির (ভিক্ষু) প্রতি বর্মার সাধারণ লোকের এই শ্রদ্ধা ভালবাসা ছিল।

কর্ণেল স্ন্যাপ তখন বর্মার ইন্‌স্পেক্টর জেনারেল অফ প্রিজন্‌স্। একবার বেসিন জেলে এলে স নে ডুন তাকে বলেন, গত বিশ্বযুদ্ধে কাইজার যদি তোমার দেশের রাজাকে বন্দী করতো, আর তার পর আমি যে ব্যবহার পাচ্ছি, তা-ই যদি তিনি পেতেন তোমার কেমন লাগতো শুনি?

স্ন্যাপ জিজ্ঞেস করে, কি আপনার অভাব অভিযোগ আছে?

স নে ডুন সেলবাস, আহার্য, বস্ত্র, বিছানা সব কিছুর কথা বলতে বলতে রাগের মাথায় নারকেল ছোবড়ার বালিশ নামক বস্তুটি স্ন্যাপের সামনে ছুঁড়ে ফেলে দেন।

ইংরেজ জাতের পরদুঃখকাতর আর কল্পনাপ্রবণ হৃদয় নিয়ে কর্ণেল স্ন্যাপ হুকুম দিয়ে গেল—এঁকে তুলোর বালিশ একটা দিও, কিন্তু কখনও অন্য কয়েদিদের সঙ্গে মিশতে দিও না।

স নে ডুনও সাধারণ অপরাধীদের সহিত একসঙ্গে থাকার কামনা

করতেন না। কাজেই ঐ সেলগুলিতেই ছিলেন—যা আমরা এখন গিয়ে ওঁর কাছ থেকে কেড়েই নিলাম বলতে হবে। আমরা পৌঁছাবার আগেই ওঁর জন্ম জেলের অন্য এক অংশে আর একটা সেল ঠিক ক'রে রেখেছিল। সেখানে উনি সেলেই থাকতেন, কিন্তু অন্য কয়েদিদের সংগে সারাদিন একত্রে।

তিন বৎসর বাদে আর একবার আমি বেসিন জেলে যাই। তখন স নে ডুনের আর সে চেহারা নেই। সাধারণ অপরাধীদের সঙ্গে থাকতে সে আপত্তিও আর নেই। তাঁর ঐ শিক্ষিত মনও যেন মরে গেছে—সাধারণ কয়েদীদের সংগে বাইরে থেকে গোপনে সংগ্রহ করা চুরুট তামাকও খান। জেলের আবহাওয়ায় নিজেকে বাঁচিয়ে রাখা অত্যন্ত শক্ত। এই দ্বিতীয়বারে স নে ডুনের সঙ্গে যখন তখন গল্প করার সুযোগ ক'রে নিয়েছিলাম। কথা বলতে গিয়ে কোথায় যেন খচ খচ ক'রে বিঁধতো। মনে হ'ত, ওঁর এই দশার জন্যে আমরাই যেন দায়ী।

বেসিন জেলের সেলের চেহারা দেখেই তো আমার মুখ শুকিয়ে গেল। এক নিদারুণ ব্যাধির সর্বনাশ তখন মনটা জুড়ে খা খা করছে। জীবনও ১৯১৬ সাল থেকে ১৯২০ সাল পর্যন্ত যখন জেলে ছিলেন, থাইসিস্ সন্দেহে তাঁর তখন চিকিৎসা হয়েছে।

নাইকার নামে একটি ডেপুটি জেলার ছিল, এ ছাড়া আর যে কয়টি অফিসারকে বেসিনে পেলাম—সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট প্রথম মাসখানেক কর্ণেল ফুলারগুড, পরে মেজর স্কট, চীফ জেলার ভগবান সিং, আমাদের চার্জে জেলার একটি ইউরো-এশিয়ান, ডি কাস্ট্রো, দুটি মাদ্রাজি ডাক্তার ডাঃ ড্রাভিয়াম ও ডাঃ পি. কে. কে. নায়ার—সব কয়জনই অত্যন্ত ভদ্র।

কর্ণেল ফুলার গুডকে জীবনের স্বাস্থ্যের ইতিহাস জানিয়ে বললাম,
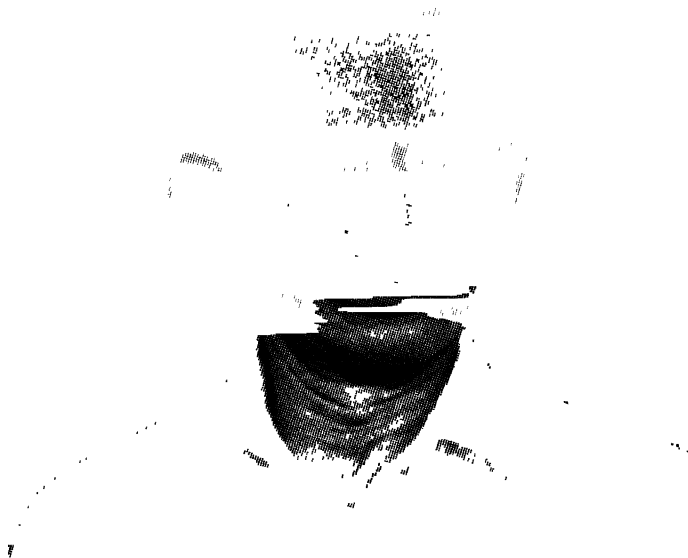
জীবন চাটার্জি

সেল-বাস পোষাবে না। বললেন, তাঁর হাত বাঁধা, ওঁর ও-জেলে অন্য কোনোরকম বাসস্থানও নেই। জীবনের স্বাস্থ্যও পরীক্ষা করলেন, আপাততঃ ভয়ের কিছু নেই। কিন্তু ও-ব্যাধির—ভয়ের কিছু যখন না থাকে তখনও আশংকা মেটে না। গবর্ণমেণ্টের সংগে লেখালিখি শুরু করলাম।

জুন মাস। বেসিনে দিবারাত্রি মুশলধারে বৃষ্টি। ঘরের বের হবার উপায় নেই। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বাঁশের ফ্রেমের উপর পুরোণো খবরের কাগজ চাপিয়ে প্রকাণ্ড এক ছাতা তৈরী করালেন, ছাতার উপর ক্রুড অয়েল মেখে দেওয়া হ'ল। সেলের সামনে সেল ইয়ার্ডে সেই ছাতা বসিয়ে দেওয়া হ'ল। আমরা দুজন তার তলায় দুখানা ডেক চেয়ারে ব'সে ব'সে দিন কাটাতাম। পড়বার বইয়ের ভিতর ডেপুটি কমিশনারের কাছে পেলাম Sir George Scottএর "Burma" আর দু'চার খানা Gagetteer, অধিকাংশ সময় গল্প ক'রে কাটতো। মাঝে মাঝে ডি কাস্ট্রো ও ডাক্তার দুটি আসতেন, তাঁদের সঙ্গে তাস খেলা হ'ত—জীবন তার সঙ্গে চা এবং এমন ভারি 'টা'য়ের ব্যবস্থা করতেন যে, অনেকদিনই সন্ধ্যাবেলায় বন্ধ হবার সময় দেখা যেত, নিজেদের খাবার মতো খুব কমই আছে। উৎকলী পাচক যোগিয়া শুষ্ক মুখে এসে জানাত, জীবন আমার মুখের দিকে চেয়ে হাসতেন, আমি জীবনের মুখের দিকে চেয়ে হাসতাম, তার পর মুখ হাত ধুয়ে বন্ধ হ'তে যেতাম।

সকাল বিকাল যেদিন বৃষ্টি একটু কম থাকতো ডি কাস্ট্রো আমাদের জেলের workshopএর এক প্রান্তে বেড়াতে নিয়ে যেতেন। টিপটাপ বৃষ্টি হয়তো পড়ছে, শুধু ঘরের বার হওয়াই হ'ত, বেড়ান আর হ'ত না, হয়তো একটা আতাগাছের তলায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প হ'ত। বর্মার

কয়েদিদের বুদ্ধির তারিফ করতেন। কি ক'রে কাক ধ'রে চড়ুই ধ'রে গোপনে কয়েদিরা রেঁধে খায়, তার কাহিনী সব শুনতাম। চড়ুই ধরবার ফাঁদ দেখলাম। জমির থেকে দু'তিন আঙুল উঁচু ক'রে পাশাপাশি দুটি খুঁটি পোতা রয়েছে—একখানা লম্বা বাখারি তার একটির সংগে বেঁধে অপর খুঁটিটার গায়ে লাগিয়ে বেঁকিয়ে ধনুকের মতো ক'রে নিয়ে সেই বাখারির অপর মাথায় একটা লম্বা রশি কোনো কিছুর সংগে আলগোছে বেঁধে রাখে। তার পর সেই ধনুকের সামনে ভাত ছড়িয়ে দেয়। যখন বিশ পঞ্চাশটা চড়ুই এসে ভাত খেতে বসে, দূর থেকে রশির প্রান্তের গিরো আস্তে খুলে দেয়, বাখারির ঘায়ে দশটা পনেরটা চড়ুই একসঙ্গে পড়ে যায়।

সেল-বাস ঘুচাবার উদ্দেশ্যে বর্মা সরকারের সঙ্গে লেখালিখির কথা আগে বলেছি। একটা জবাব এল, বেশ ভদ্রভাষায় আমাদের জানিয়ে দেওয়া হ'ল, বর্মার জেলে ঘরবাড়ী এমনভাবে তৈরী যে, আমরা যে রকম থাকবার জায়গা চাই, সে রকম জায়গা দেওয়া সম্ভব নয়।

এক বারেই কিছু হবে না, সে তো জানাকথা—সরকারের সাথে কারবারে অধ্যবসায় চাই। দু'চারদিন পর পরই দরখাস্ত যেতে রইলো। ফলে বেসিনে তিনমাসও পুরো থাকতে হয়নি। একদিন চীফ্ জেলার ভগবান সিং গোপনে এসে জানিয়ে গেলেন আমাদের মান্দালে জেলে বদলির হুকুম এসেছে। তিলক, লাজপৎ রায়, অজিত সিং এর সংগে মান্দালের নামটা জড়িত। মনে মনে গৌরব ও আনন্দ অনুভব করলাম অনেকখানি।

কিন্তু এর ভিতর আর এক নতুন ইতিহাস সুরু হ'ল—যার ভূত আমার কাঁধে চেপে রইলো বর্মা প্রবাসের সমস্ত তিনটি বছর ধ'রে।

বিলাতে প্রথম লেবার গবর্ণমেণ্ট হ'ল ১৯২৪ সালে। সমস্ত

ভারতবর্ষ বেশ চঞ্চল হয়ে উঠলো। মধ্যপন্থী রাজনৈতিকদের গ্রীবা আশায় ঊর্ধ্বদিকে উঠ্‌লো, শিঁকে বুঝি ছেঁড়ে। শিঁকে ছিঁড়ে মাছ পড়বে, সে আশা আমরা জেলে ব'সে করিনি। তবে এক আধখানা আঁশ খসে পড়লেও পড়তে পারে।

কি অবস্থায়, কি কারণে, কি উদ্দেশ্যে ১৯২৩ সালে আমাদের ধরে, সে কাহিনী আগে বলেছি। মিহির ঘোষকে দিয়ে ইংরেজের পুলিশ ভারতবর্ষে এক নতুন খেলা শুরু করলো—যা রুশিয়াতে জারের পুলিশ করেছিল আজেভকে দিয়ে। জারের পুলিশ ঐ খেলা শেষ পর্যন্ত খেলেছে। ইংরেজও কেন খেলবে না, তার কোনো হেতু নেই। খেলুক, কিন্তু—আমি একদিন জীবনকে বললাম—এস, আমরা এটা বিলাতের লেবার গভর্ণমেণ্টকে জানিয়ে দিই। ইংরেজ সরকারের ভদ্রতার মুখোসও খুলে দেওয়া দরকার, আমাদের দেশী ভদ্র লোকদেরও ইংরেজের অন্যায় আচরণের অক্ষমতায় আস্থা নষ্ট করা দরকার।

জীবনের উৎসাহ ধরে না। জীবনকে ব'লে আমি দু'একদিন ধ'রে ভাব্‌ছি, কি লিখব, কি ভাবে লিখব। ভাব্‌তে ভাব্‌তে আমার উৎসাহ ঢিমে হয়ে এসেছে। কিন্তু যা একবার ভাল কাজ ব'লে মনে হয়েছে, সে কাজের উৎসাহে ভাটা পড়তে দিলে জীবন চাটার্জি জীবন চাটার্জিই হ'তেন না। এমন তাগিদ শুরু ক'রে দিলেন যে, একদিন তো ঝগড়াই ক'রে ফেললাম।

তারপর লিখতে বসলাম। দিনের বেলায় লেখা চলে না—কে এসে দেখে ফেলে; মস্ত লেখা—রাত্রে রাত্রে লিখে শেষ করলাম।

কিন্তু লিখ্‌লে কি হবে? সরকারী কর্মচারীদের হাতে যা দেওয়া হবে, তা বিলেত তো দূরের কথা, দিল্লী সিমলা পর্যন্তই পৌঁছায় কিনা

কে জানে?—যদিও আইনে আছে ৩নং রেগুলেশনের বন্দীদের দরখাস্ত কেউ কোথাও আটক করতে পারবে না।

আসল কাজ যা, তা হ'ল, যা লিখে পাঠাব, তা কোনো গতিকে খবরের কাগজে বের ক'রে দিতে হবে। রোজ এত লুচিমাংস খাওয়ান হচ্ছে ডাক্তারদের। প্রথম আশা করা গিয়েছিল তাঁদের দিয়েই হয়তো কাজটা হয়ে যাবে। ডাঃ ড্রাভিয়ামকে নিয়ে পড়লাম আমি, ডাঃ নায়ারকে নিয়ে জীবন। ডাঃ ড্রাভিয়াম ক্রিশ্চিয়ান, কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দের প্রগাঢ় ভক্ত। এঁরা এক ধরণের নীতিকে অনুসরণ করেন—যার অর্থ দাঁড়ায় ভারতবর্ষের মাটির রস খাবার আগে এঁরা ইংরেজের নুন খেয়েছেন। তবে ইনি তার ভিতর চরিত্রের পরিচয় দিয়েছিলেন। সব সরকারী চাকরই চাকরীতে ঢুকবার দিন থেকে বলে, এ ভাল লাগে না, ছেড়ে দেব। এই কথা মুখে নিয়ে শেষ দিন পর্যন্তও কিন্তু চাকরীই করে। নিঃসন্তান ডাঃ ড্রাভিয়াম আমাদের বলেছিলেন, নিজের ডিসপেন্সারী করার মতো টাকা হাতে হ'লেই চাকরী ছেড়ে দেবেন। আমরা বর্মায় থাকতে থাকতেই ইনি চাকরী ছেড়ে হেনজাদা জেলায় জালুন ব'লে একটা জায়গায় প্রাক্‌টিস সুরু করেন। পরে ইনি বর্মার বিপ্লবীদের সাহায্য করেছিলেন ব'লে শুনেছি।

ডাঃ নায়ার বর্মার প্রায় সব অবিবাহিত ভারতীয়দের মতোই স্ফূর্তিতে জীবন কাটান। তিনি কোনো ঝামেলার ভিতর যেতে রাজী হ'লেন না।

আমরা হাল ছাড়ি নাই। চীফ্ জেলারকে ব'লে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের অনুমতি নিয়ে রোজ রাত্রে রাত্রে অফিসের টাইপ-রাইটার আনান হ'ত। জীবন একটা একটা ক'রে হরফ ধ'রে ধ'রে [illegible] পৃষ্ঠায় সমস্তটা

নকল করলেন কয়েক দিন ধ'রে। একটা নকল রেখে দেওয়া হয়েছিল যদি ডাক্তারদের দিয়ে পাঠান যায়।

তা যখন গেল না, তখন ভিজিটিং কার্ডের চেয়ে একটু বড়ো সাইজের টুক্‌রো কাগজে ইংরেজি ছাপার অক্ষরে সমস্তটা পেনসিলে নকল করে ফেললাম। শরৎবাবুর "বিরাজ বৌ"এর হিন্দি সংস্করণ একখানা আমাদের কাছে ছিল। বইখানার মাঝখান থেকে অনেকগুলো পাতা ঠিক ঐ সাইজেই কেটে ফেলে একটা পকেট সৃষ্টি করা হল, তার ভিতর ঐ টুক্‌রো কাগজগুলো পুরে দিয়ে সমস্তটাকে একটা বুকপ্যাকেট ক'রে বাঁধা হ'ল। একজন সিপাই রেঙ্গুন যাচ্ছিল, তাকে কিছু কাপড়-জামা বখ্‌শিষ দিয়ে প্যাকেটটা তাকে দিয়ে দেওয়া হ'ল হেনজাদায় ডাকবাক্সে ফেলবার জন্য। উপরে ঠিকানা দেওয়া রইল বিক্রমপুরের পল্লীগ্রামের কোনো বৃদ্ধ ভদ্রলোকের—জীবনের পরিচিত। তিনি ঐ লেখাটা লোক মারফত কলকাতায় দেশবন্ধুকে পাঠিয়ে দেবেন।

কয়েক মাস আর কোনো সাড়াশব্দ নেই। ইতিমধ্যে আমাদের ঐসব দরখাস্তের ফলে মান্দালে জেলে বদ্‌লি হয়েছি। সুপারিন্টেণ্ডেন্ট ক্যাপ্টেন স্মিথ, চীফ্‌ জেলার মিঃ রিচার্ডস্‌ শুধু ব্যবহারে নয়, আসলেই খুব ভদ্র। আমাদের চার্জে প্রথম ছিল লেটন ব'লে একটি অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান জেলার। দৈনিক খাবার খরচ দুজনের ৪৲ টাকার ভিতর ৩৲ টাকাই চুরি ক'রে আমাদের সে খাওয়াতো পোড়া ডাল আর ভাত। একদিন তো জীবন ডালের বাটি ছুঁড়ে মারলেন, মুখে আর কোটে ডালমাখা হয়ে লেটন বেরিয়ে গেল। তার জায়গায় এলেন একজন বর্মী জেলার মং বা শীন। বন্ধুত্ব যার সঙ্গে হয় বর্মীরা এককথায় তার জন্যে প্রাণ দিতে পারে। এই ভদ্রলোক খাঁটী বর্মী এবং আমাদের সঙ্গে বন্ধুত্বও হ'ল প্রগাঢ়। ভদ্রলোক দুর্ভাগ্য—কানে শুনতে পান অতি কষ্টে।

জেলখানার কর্মচারীদের, সিপাইদের খাইয়ে দাইয়ে আমরা অনেক সময় অনেক কাজ করিয়ে নিতাম বটে, কিন্তু খাওয়ানদাওয়ানটা ওখানে নিজেদের প্রাণের প্রয়োজনে। আর জীবন যখন ছিলেন, এদিকটায় কখনও ত্রুটি হ'ত না। পাশের ইয়ার্ড থেকে মান্দালে হাঙ্গামার একজন ফুঙি (ভিক্ষু) রাজনৈতিক বন্দীকে একদিন ডেকে খেতে বসিয়ে দিয়েছেন, হঠাৎ অসময়ে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এসে পড়েছেন। সিপাই দুজনার চোখমুখ শুকিয়ে গেছে। জীবন চট্ ক'রে ফুঙিকে নিয়ে বাথরুমে ঢুকে পড়লেন, আমি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে কথাবার্তা ব'লে বিদায় করলাম।

একদিন ভোরে আমাদের দেখতে এল রেঙ্গুন হাইকোর্টের জজ, রাটলেজ। প্রথম কথাই বলে "You are very happy here !"

আমি বলি, Will you step into my shoes ?"

ক্যাপ্টেন স্মিথ তো ওর পেছনে দাঁড়িয়ে হাসিতে প্রায় ভেঙে পড়েন।

বেশ দু'চার কথা শুনিয়ে দেওয়া গেল।

ওকে বিদায় ক'রেই ক্যাপ্টেন স্মিথ হাসতে হাসতে ফিরে এলেন। বলেন, ঠিকই বলেছেন। আমি তো এ অবস্থায় দু'দিনও থাকতে পারতাম না। আমি অনেক সময় ভাবি আপনারা বছরের পর বছর এভাবে কি ক'রে কাটান।

আইরিশ ঔপন্যাসিক জর্জ বার্মিংহাম ক্যাপ্টেন স্মিথের প্রতিবেশী ও বাল্যবন্ধু। তাঁর বই অনেকগুলোই এনে দিলেন। লেখার রসিকতাটা চমৎকার লাগতো।

মং বা শীনের তাস খেলার ঝোঁক বিষম, তেমনি পাঞ্জাবী ডাক্তার মুলরাজের। খেলা হ'ত, খাওয়াদাওয়াও চলতো। মং বা শীনকে

বলতে না বলতেই রাজী হয়ে গেলেন, চাঁদপুরের নগেন রায় মান্দালে সহরে বিখ্যাত ব্যবসায়ী, তাঁর কাছে আমাদের কথা ব'লে সপ্তাহে দুদিন তিনদিন Forward কাগজ নিয়ে আসতেন। তাতে দেশের সব রকম খবর পেতাম। Forward তখন নতুন বেরিয়েছে। তারপর যখন সুভাষচন্দ্র, সত্যেন মিত্র প্রভৃতি মান্দালে জেলে যান, খবর প্রকাশে এবং আরও নানাভাবে এই নগেনবাবু বিস্তর সাহায্য করেছিলেন।

একদিন হঠাৎ ক্যাপ্টেন স্মিথ হাসতে হাসতে এসে খবর বলেন, "আমি গবর্ণমেন্টের কাছ থেকে এক অদ্ভুত order পেয়েছি। আপনাদের সমস্ত বই কাগজ আলমারিতে ডবল তালা লাগিয়ে বন্ধ রাখতে হবে। একটার চাবি থাকবে আপনাদের কাছে, আর একটার আমার অফিসে। অফিসে খবর পাঠালে আমার কর্মচারীরা এসে যখন যে বই কাগজ প্রয়োজন, বের ক'রে দেবে, আবার আপনাদের কাজ হয়ে গেলে এসে বন্ধ ক'রে রাখবে। আমি জানি, এ order কাজে খাটানো চলে না। তবে আই. জি. আসছেন। তার আগে একটা আলমারী আপনাদের ঘরে এনে রেখে দেব। জিজ্ঞেস করলে বলবেন, বই কাগজ সব বন্ধ থাকে।"

জীবন আর আমি পরস্পরের মুখের দিকে তাকাই। বুঝলাম ব্যাপারটা কি দাঁড়িয়েছে। অত কারিগিরি কারসাজি কোনো কাজে লাগেনি—বিরাজ বৌ-এর শাড়ির আড়াল থেকে সেক্রেটারি অফ ষ্টেটের কাছে মেমোরিয়াল ধরা প'ড়ে গেছে।

ইতিমধ্যে ১৯২৪ সালের ২৫শে অক্টোবর এসে গেছে। প্রথম বেঙ্গল অর্ডিন্যান্স জারী হয়েছে। সুভাষ বোস, সত্যেন মিত্র, অনিলবরণ রায়, সুরেন ঘোষ, অমর ঘোষ, হরিকুমার চক্রবর্তী প্রমুখ

৭২ জন একদিনে ধরা পড়েছেন। দেশবন্ধু অসুস্থ হয়ে তখন মারীতে। তিনি অর্ডিন্যান্সে যাঁরা ধরা পড়েছেন, তাঁদের নাম দেখেই বুঝেছেন, বিপ্লবান্দোলন দমনের জন্য এ অর্ডিন্যান্স নয়, এ অর্ডিন্যান্সের উদ্দেশ্য স্বরাজ্য পার্টির অংকুরে বিনাশ। আমাদের মেমোরিয়ালেরও অন্যতর প্রতিপাদ্য তা-ই।

দেশবন্ধু অসুস্থ শরীরে মারী থেকে কলকাতা চ'লে এলেন। তিনি তখন কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট। নিজের বাড়ীতে এ. আই. সি. সি.র সভা ডেকে এলেন। ঘোষণা করলেন, আমি প্রমাণ করব এ অর্ডিন্যান্সের উদ্দেশ্য কি।

আমাদেরও ব্যস্ত হয়ে উঠবার কারণ ঘট্‌লো। এ. আই. সি. সি.র সভার আগে আমাদের মেমোরিয়াল দেশবন্ধুর হাতে পৌছান চাই।

এক খাতা জুড়ে আবার সবটা নকল করা হ'ল। মংবা শীনের মারফত নগেনবাবুর শরণাপন্ন হ'লাম। নগেনবাবু বিপদ ঝুঁকি এবং অর্থব্যয় সবই হাসিমুখে কাঁধে তুলে নিলেন। খাতাখানি নিয়ে কলকাতা রওনা হ'লেন।

কিন্তু উদ্যোগ আয়োজন ক'রে রওনা হ'তে যে সময় গেল তাতে আমাদের আশংকা হ'ল, মিটিং শেষ হবার আগে যদি খাতা আদৌ পৌছায় তো পৌছাবে অব্যবহিত আগে। প্রাসঙ্গিক কথাগুলো তাই লাল কালিতে দাগ দিয়ে দিলাম।

গান্ধীজি মানেন নাই যে, অর্ডিন্যান্স স্বরাজ্য দলের প্রতি আক্রমণ। তিনি উঠে যাবেন, তখনই হাওড়ায় গিয়ে ট্রেণ ধরবেন।

এমন সময় এ. আই. সি. সি. সভার রুদ্ধদ্বারের সাম্‌নে নগেনবাবু। ভলান্টিয়ার ঢুকতে দেবে না।

"দেশবন্ধুকে বলুন, আমি মান্দালে জেল থেকে জরুরী কাগজ নিয়ে আসছি।"

দেশবন্ধু ডেকে পাঠালেন। খাতাটায় একবার চোখ বুলিয়ে গান্ধীজির হাতে দিলেন। গান্ধীজি বললেন, "আমি ষ্টেশনে যাবার পথে গাড়ীতে পড়ব।"

ষ্টেশন থেকে গান্ধীজি প্রেসকে ব'লে গেলেন, আমি বিশ্বাস করি (convinced) যে, স্বরাজ্য দলের প্রতি আঘাত হানবার উদ্দেশ্যেই এ অর্ডিনান্স হয়েছে।

আমাদের ও নগেনবাবুর শ্রম সার্থক হ'ল।

ভারতবর্ষের রাজনীতিক্ষেত্রে এজেন্ট প্রভোকেটরের কথা এই প্রথম জানাজানি হ'ল।

এর পর কিছু দিনের মধ্যে স্বরাজ্য দলের কাছে গান্ধীজি আত্মসমর্পণ করেন।

খাতাখানার শেষের দিকে দেশবন্ধুর নামে একখানা চিঠি ছিল। চিঠিতে মিহির ঘোষের কীর্তিকলাপ ও ১৯১৯-২০ সালে খালাসের আগে ও পরে যারা পুলিশকে সাহায্য করেছে এবং এদেশ থেকে মুক্ত অন্তরীণের ছাপ নিয়ে যারা বিদেশে গেছে ভারতীয় বিপ্লবীদের সংগে থেকে গোয়েন্দাগিরি করবার মতলবে, তাদেরও কারও কারও কাহিনী ছিল। দেশবন্ধু এই চিঠিখানাকেও ঐ মেমোরিয়ালের অন্তর্ভুক্ত ক'রে দিয়ে সারাভারত ও বর্মার খবরের কাগজে বের করে দেন। এই আকারেই ঐ মেমোরিয়াল পরে শরৎ বোস মশায় "Lawless Laws" ব'লে এক বইয়ের ভিতর প্রকাশ করেন।

মেমোরিয়ালের শ্রাদ্ধ আর একটু গড়াল। বর্মায় পাঠাবার সংগে সংগেই তো গবর্ণমেন্ট স্থির করেছিল সতীশদার সংগে আমায় রাখবে

না, এখন আবার নতুন হুকুম হ'ল জীবনের সঙ্গে আমায় রাখা হবে না।

জীবনে যারা নিজেকে একান্তভাবে মুছে ফেলেছে, তাদের বন্ধুত্ব এমন একটি পরম আরামের আবাস যেমনটি নিজের বাপমা স্ত্রীপুত্রের সংগের ভিতরও অনেক সময় খুঁজেও পাওয়া যায় না। অল্পদিন আগেই কুন্তলকে, চারুকে হারিয়েছি, এইবারে জীবনকে ছেড়ে যেতে হবে। মনটা মুষ্‌ড়ে পড়লো।

জীবনের নতুন সঙ্গী হবার জন্যে এলেন মৌলমীন থেকে বিপিন গাঙ্গুলী। সতীশদাও থেইটমিও থেকে মৌলমীন চ'লে গেলেন। আমায় থেইটমিও নেবার জন্য রেঙ্গুন থেকে গবর্ণমেণ্টের লঞ্চ এসে পৌছাতে দেরি হ'তে লাগলো। কয়েকদিন তিনজনেই একসঙ্গে রইলাম।

ষ্টেট প্রিজনার হিসাবে কোথায় কেমন কাটিয়েছি, অনেকে অনেক সময় প্রশ্ন করেন। ওর একমাত্র জবাব—যেখানে যেমনটি ক'রে নেওয়া গেছে। আর ক'রে নেবার ভিতর মনের দিকে যেটি প্রধানতঃ প্রয়োজন সেটি হচ্ছে, "যা হবার হবে।"

বর্মায় যাবার পর থেকে খাবার খরচ বাবদ বরাদ্দ দৈনিক দুই টাকা। অন্যান্য জিনিষ সম্পর্কে আমরা মান্দালে যাবার পর সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এক চিঠি পেলেন—তার মর্ম এই, ষ্টেট প্রিজনারের প্রয়োজন মতো কাপড় জামা, বিছানা, তেল, সাবান ইত্যাদি দেবে, তবে দেখবে বিভিন্ন জেলের খরচের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য থাকে।

এই সার্কুলার পেয়ে ক্যাপ্টেন স্মিথ একটু ফাঁফরে পড়লেন। মৌলমীন ও থেইটমিও জেলে চিঠি লিখে পেলেন, ওখানে প্রতিমাসে জনপ্রতি গড়ে এই সব বাবদ খরচ যথাক্রমে ১১৲ ও ১৩৲। আর

মান্দালে জেলে ৪৫৲। অবশ্য মান্দালের খরচের একটা রকমফের ছিল—বাজার দূরে, আসা যাওয়ার গাড়ী ভাড়া জিনিষের দামের সংগে লেখা পড়তো—সুভাষচন্দ্ররা ওখানে যাবার পর শুনেছি, একখানা জিভ্ছোলার দাম লেখা হয়েছিল ৩৲ টাকার উপর।

হোক, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট তো আমাদের এসে বললেন, শতকরা না হয় বিশ টাকা আমি বেশী খরচ করতে পারি, কিন্তু আপনাদের বন্ধুদের চেয়ে আপনারা এত বেশী খরচ করবেন কেন?

আমরা বলি, আমাদের বন্ধুরা যদি সন্ন্যাসী হয়ে গিয়ে থাকেন, তার আমরা করব কি?

ক্যাপ্টেন স্মিথ হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেলেন। খরচ যেমন চলছিল, তেমনিই চললো।

ইতিমধ্যে দৈন্যজীর্ণ কাপড় বিছানা নিয়ে বিপিন বাবু মৌলমীন থেকে এলেন। ততোধিক দৈন্যজীর্ণ, সংগে দেখলাম, বর্মা সরকারের কাছে দরখাস্তের নকল—সেকালের রাজনৈতিকদের গৎ: সার হারকোর্ট বাট্লার, তোমার মত গবর্ণর থাকতে আমাদের প্রতি এই এই রকম ব্যবহার!

মৌলমীন জেলে বিপিন বাবুর মশারিটি রেখে দিয়েছে, ক্যাপ্টেন স্মিথ বলেন, মশারি আমি তা হ'লে দেব না, মিঃ দত্তেরটা ওঁকে দিতে হবে।

আমি বলি, আমি দেব না। বিপিন বাবুর জন্য নতুন মশারি এল।

এত মাস পরে মান্দালতে এসে বিপিনবাবু যেন হেসে বাঁচলেন। তিনজনেই দিন রাত তাস পেটা হ'ত। মাঝে মাঝে ডাক্তার মূলরাজ এসে সঙ্গী হ'তেন। ইতিমধ্যে রিচার্ডস্ চ'লে গেছেন, নতুন চীফ্ জেলার এসেছে রহিম—খাঁটি জেলার প্রকৃতির জীব, সত্য সততার ধার

খাবে না। কিছুদিনের মধ্যেই মং বা শীনের নামে কতকগুলো বাজে চার্জ এনে তাঁকে সাসপেণ্ড করালো।

নতুন আই. জি. এসেছেন মেজর তারাপোর। যেদিন মান্দালে থেকে রওনা হ'লাম, সেদিন আই. জি. সেখানে। লঞ্চে রাত কাটালাম। সন্ধ্যাবেলায় মং বা শীন লঞ্চে এসে শেষ বিদায় নিয়ে গেলেন। জেলার ছিলেন, তাঁকে দিয়ে কাজ করিয়ে নিতাম। কিন্তু একটা সত্যিকারের দরদবোধ ছিল। পরে নগেনবাবু এঁকে তাঁর নিজের ব্যবসায়ে নিয়ে নিয়েছিলেন।

লঞ্চে এসে দেখি, মেজর তারাপোর ও ক্যাপ্টেন স্মিথের ব্যবস্থায় প্রচুর চাল, ডাল, ঘি, ময়দা, মুরগী, কপি এবং রোজ ১৷৷০ টাকা মাইনের এক বাবুর্চি। সাত দিনের মতো লঞ্চে কাটাতে হবে। সঙ্গে যে ইউরোপিয়ান ইন্‌স্পেক্টরটি ছিল, সে সন্ধ্যায় খাবার জন্য কাফি ও পাঁউরুটি বের করছিল। আমি বলি, ওসব তুমি রেখে দাও, এত জিনিষ আছে—এ কয়দিন আমার সঙ্গেই খাবে। সিপাইদেরও ফল, তরকারি, ঘি, আটা, কিছু কিছু দিলাম।

প্রচুর ঘিয়ে তৈরী খাস্তা পরেটা ও মুরগির মাংস খেয়ে ইন্‌স্পেক্টারের তো শেষরাত্রি থেকেই চোঁয়া ঢেকুর উঠতে সুরু হ'ল। ছোটখাটো সহর দেখলেই বলে, আসুন, লঞ্চ থামিয়ে কিছু ঔষধ খেয়ে আসি। আমারও সুবিধা হ'ল—পথে পথে পাগান, সালে ইত্যাদি বর্মার নামকরা সব প্রাচীন সহর দেখতে দেখতে আসি। জ্যোৎস্নারাতে পাগানের অগণিত হিন্দু মন্দিরের এক অপরূপ দৃশ্য।

কিন্তু সহরের চেয়েও দেখবার মতো সৌন্দর্য বর্মার ইরাবতী নদীর। এর আগে যখন বেসিন থেকে মান্দালে যাই, তখনও বর্মার স্থলপথের সৌন্দর্য দেখেছি। তখন বর্ষায় রেলের লাইন ভেঙ্গে গিয়েছিল, রেঙ্গুন

থেকে মান্দালে পৌঁছাতে দিন তিনেক লেগেছিল। আমরা তো ভেবেছিলাম, হয়তো রেঙ্গুনে ফিরে যেতে হবে। তখন মান্দালেতে একটা রাজনৈতিক দাঙ্গা হয়ে গেছে। পুলিশের আই. জি. ও সি. আই. ডি-র ডি. আই. জি. বহু পুলিশ নিয়ে ঐ গাড়ীতেই ছিল। আই. জি. টাউঙ্গু থেকে ফিরে গেল। কিন্তু ডি. আই. জি. ভানবার আমাদের বলে, আপনাদের আর আমাকে রেলওয়ে কোম্পানি পিঠে ক'রে হ'লেও পৌঁছে দেবে। প্রায় পিঠে ক'রেই পৌঁছে দিয়েছিল। জায়গায় জায়গায় বহু লোক লাগিয়ে রেল লাইনের নীচে কাঠ আর বাঁশের ঠ্যাকা দিয়ে জিনিষ পত্র সহ আমাদের সব ধীরে ধীরে ট্রলি করে পার করলো। দক্ষিণ বর্মায় সেই দেখলাম সুজলা সুফলা বাংলার প্রতিচ্ছায়া! আর, উত্তর দিকে পার্বত্য অঞ্চলে পাহাড়ের গায়ে গায়ে পিনকুশনে যেমন পিন ফোঁড়া থাকে তেমনি অগণিত সব ছোট বড় প্যাগোডা বা বৌদ্ধ-মন্দির।

এখন ইরাবতীর তীরেও দেখলাম, নদীর এমন একটি সুন্দর বাঁক নেই যেখানে বর্মাবাসীরা একটি মঠ বা ফুঙিচাঁও (আশ্রম ও বাল ব্রহ্মচারীদের বিদ্যামন্দির) না তৈরি করেছে। গেড়ুয়াপরা স্নাতক ও বালকরা দলে দলে ভিক্ষায় বেরিয়েছে, গৃহস্থ নারীপুরুষ ভিক্ষার্থী পৌঁছাবার আগেই চাউল তরকারি নিয়ে বাড়ীর দরজায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। তখনও বর্মার নিজস্ব এই শিক্ষা ব্যবস্থা ইংরেজ রাষ্ট্রের কল্যাণে অবলুপ্ত হয়নি। এ আমি বলছি ১৯২৪-২৫ সালের কথা, থেইটমিও জেলায় তখন শিক্ষিতের হার শতকরা ৬১ জন।

এছাড়া, দেখলাম, নদীর দুই প্রান্তে বিস্তীর্ণ সমতল শস্য ক্ষেত্রে বর্মার কৃষকরা, অধিকাংশই নারী, অক্লান্ত পরিশ্রম করছে। ক্ষেতে কৃষক বা নদীতে মাঝি সবারই মুখে সর্বক্ষণ রয়েছে অসাধারণ মোটা

এক একটি চুরুট। নদীর জলে, পূর্ববঙ্গে যেমন দেখা যায় বিক্রি করবার জন্য বাঁশের চালি বেঁধে নিয়ে যায়, এখানে তেমনি নদীর দুই ধারে এক এক জায়গায় দেখা যায় পাশাপাশি চার পাঁচটা চালি একসংগে বাঁধা রয়েছে। বর্মীদের সৌন্দর্যজ্ঞান অসাধারণ। জোৎস্না-রাতে ঐ সব চালির উপর কাঠ ফেলে নাচের আসর তৈরী হয়। মেয়েরা ফুলসাজে সেজে সেখানে পোয়ে নাচ নাচে। ছেলেরাও নাচে। গ্রামবাসী মেয়ে পুরুষ সবাই মিলে অনেক রাত্রি পর্যন্ত ব'সে এই নাচ দেখে, উৎসাহ আনন্দের অবধি নেই। সালে সহরে ও ইরাবতী নদীর উপর এই নাচ আমিও দেখে নিলাম।

আর দেখলাম ইয়েনেঞ্জাও আর ইয়েজির তেলের খনি। এক জায়গায় দেখলাম, মাটি ফেটে প্রায় বিশ হাত উঁচু হয়ে প্রচুর তেল ফোয়ারার মতো উঠে নদীতে গড়িয়ে পড়ছে।

এমনি দেখতে দেখতে আট দিনে এসে থেইটমিও পৌঁছালাম। জেলে গিয়ে দেখি, জ্যোতিষ বাবু একলা রয়েছেন। এই ছয় মাসে আর প্রায় তাঁকে চেনা যায় না। লম্বা লম্বা চুল দাড়ি নখ, পরণে সেই মেদিনীপুরের দেওয়া খদ্দরের কাপড়, জায়গায় জায়গায় গিরো দেওয়া। জিজ্ঞেস করি, এ কি মাষ্টার মশাই?

বলেন, এখানে এই রকমই রেখেছে। ফষ্টার ব'লে চীফ্ জেলার ছিল, ব্যাটা বেজায় পাজি।"

বলতে বলতেই একটি হিন্দুস্থানী কয়েদি একথালা ভাত তরকারি নিয়ে এল।

আমি জিজ্ঞেস করি, "রান্নাঘর কোথায়? এ ভাত কোথা থেকে এল?"

"সাধারণ কয়েদিদের রান্নাঘর থেকে।"

"খান কেন ?"

"না খেয়ে লাভ নেই। সন্ধ্যার খাবার বেলা ৪টার মধ্যে খেয়ে বন্ধ হ'তে হয়। প্রথম একদিন বলেছিলাম অত সকালে খাব না, ভাত সেলে ঢেকে রেখে দাও। কিন্তু চীফ্ জেলার এসে ভাত নিয়ে চ'লে গেল।"

আমি বললাম, "কিন্তু আমার তো খাবার সামনে রান্না না ক'রে দিলে আমি খাব না।

মাষ্টার মশাই একটু চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর ব'সে প'ড়ে খেতে স্বরু করলেন।

কয়েদিটি আমায় বলে, "আপনারও খাবার তৈরী হয়ে আছে। নিয়ে আসব ?"

আমি বলি, "এখানে রান্না কর।"

সিপাই জেলারকে খবর দিল। ফষ্টার বদ্‌লি হয়ে গেছে। নতুন চীফ্ জেলার এসেছেন মিঃ মজিদ—বেশ ভদ্রলোক।

সব শুনে বললেন, "আমি তো কিছু করতে পারিনে, স্বপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে বলি।

মেজর মার্টিন এসে বলে, "রান্নাঘর তৈরী হ'তেও দু'তিন দিন সময় লাগবে।"

আমি বলি, হাসপাতাল থেকে ষ্টোভ নিয়ে এসে আমায় আলুসিদ্ধ ভাত ক'রে দিক। তখন সেই ধরণের ব্যবস্থাই হ'ল। ৩।৪ দিনের ভিতর ইয়ার্ডের মধ্যে রান্নাঘর তৈরী হয়ে গেল। আমাদের দু'জনের জন্য দেওয়া হয়েছে চারটি সেল, সামনের দিকে একটিই দেয়ালে ঘেরা—ওগুলো ফাঁসির কয়েদি রাখবার জন্য তৈরী। সামনে একটু ফুল-বাগানের পর আর কতকগুলো সেল। সেখানে অন্য কয়েদিদের মধ্যে

থাকেন প্রোমের দু'জন রাজনৈতিক বন্দী, ভিক্ষু। জ্যোতিষ বাবু প্রায় ঘরে ব'সেই কাটাতেন। তাই সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট চ'লে গেলে এঁদের সঙ্গে গল্প করতাম। ওঁরা সাধারণ কয়েদির মতোই খাবার ইত্যাদি পেতেন। আমাদের খাবার থেকে যা পারতাম দিতাম, বা ওঁদের প্রয়োজনমত জিনিষ বাজার থেকে আনিয়ে দিতাম।

এঁদের মধ্যে একজনের নাম উপীন নীয়া জ্যটা, অল্প বয়স, বেশ বুদ্ধিমান। বর্মায় একটা বিপ্লবের ক্ষেত্র কি ক'রে তৈরী করা যায়, তিনি আমায় প্রশ্ন করতেন। আমার টুটিফুটি বর্মি আর ওঁর টুটিফুটি হিন্দিতে আমাদের আলাপ চলতো। একাজে আমায় সাহায্য করতো আমাদের আলমোড়াবাসী পাচক তারাদৎ। এই পাচকটি ছিল বর্মার জেলের এক দুর্দান্ত কয়েদি। ১২ বৎসর পলাতক অবস্থায় শান রাজ্যগুলির ভিতর ডাকাতি ক'রে ফিরতো। ধরা প'ড়ে সাত বছরের জেল হয়েছে। যেমন বুদ্ধিমান তেমনি কর্মদক্ষ।

সতীশদা আর জ্যোতিষ বাবু যতদিন ছিলেন ফষ্টার ওঁদের নাম ক'রে অনেক জিনিষ কিনেছে, কিনে মেরে দিয়েছে, অথবা অনেক জিনিষ কেনেই নাই। সে কাহিনী পরে বলব। আপাততঃ দেখলাম, এক সেট অ্যালুমিনিয়ামের ডেক্‌চি কিনেছে। পাচককে দিয়েছে মাত্র একটি। তাতে তাকে দুধ গরম করতে হবে, ভাত রাঁধতে হবে। কোন পাচক এ পারে না। তারাদতের গলার ফোকরে ৪।৫টি গিনি ও অনেক টাকা ও রেজগী থাকতো। সে তাই দিয়ে কয়েদির থালাতে আংটা লাগিয়ে কারখানা থেকে দুতিনটে কড়াই তৈরী করিয়েছে। দুইজন ষ্টেটপ্রিজনারের খাবার জন্য ফষ্টার তরকারি দিত কোনো দিন দুটো মুলো, কোনো দিন একটা ওলকপি। তারাদৎ জেলের সর্বত্র বিচরণ করতো, যেমন খুসি তরকারি তুলে নিয়ে এসে

তার বাবুদের খাওয়াত। এসব ব্যবস্থা এখন বদ্‌লে যাওয়াতে তারাদৎ ভারি খুসি। সে আমার অনেক কাজে সাহায্য করে।

ভিক্ষু জ্যাটার প্রশ্নের জবাবে বলি, বাংলাদেশে আমরা যে পদ্ধতিতে বিপ্লবের ক্ষেত্র তৈরী করতে চেষ্টা করছি, বর্মাতে সে-পদ্ধতি ঠিক চলবে না, বা তাঁর প্রয়োজনও হবে না। এখানে যদি কোনো ভিক্ষু অথবা রাজবংশীয় কেউ নেতৃত্ব নেন, সাধারণ লোক সহজে এগিয়ে আসবে। কৃষকদের নিয়ে বিপ্লব করা বাংলাদেশের চেয়ে এখানে সহজ।

এই উ পীন নীয়া জ্যটাই পরে সায়া সানকে বিপ্লবের দীক্ষায় দীক্ষিত করেন। থারাওয়াদি থেকে ১৯৩১ সালে বর্মার যে বিদ্রোহ সুরু হয়, সেই বিদ্রোহের নেতা হিসাবে সায়া সানের ফাঁসি হয়।

আর একটি লোকের সঙ্গে থেইট্‌মিও জেলে আমার পরিচয় হয়। তাঁর নাম তিলা মহম্মদ খান। ১৯১৪-১৮ সালের ভারত-জার্মান ষড়যন্ত্র উপলক্ষ্যে যাদুদার দাদা ক্ষীরোদগোপাল মুখার্জি রেঙ্গুনে যান। তিনি সেখানে মাসিদি খান ব'লে এক আফগানের সঙ্গে পরিচিত হন। এই আফগান সেখানে আফিং, কোকেন ইত্যাদি গোপনে সংগ্রহ ও বিক্রী করতো। ক্ষীরোদ গোপাল তার সাহায্যে গোপনে অস্ত্র সংগ্রহ করতে সুরু করেন। পরে দুজনাই ধরা প'ড়ে অন্তরীণাবদ্ধ হন। মুক্তি পেয়ে ক্ষীরোদ গোপাল সন্যাসী হ'ন, আজও তিনি নিরুদ্দেশ, এতদিনে হয়তো দেহত্যাগ করেছেন।

মাসিদি খানের গোপন ব্যবসায় পরে এমন জেঁকে ওঠে যে, বহুলোক তার দলে নাম লেখায়। পুলিশের লোকও তার ভিতর ছিল। ফলে, মাসিদি খান রেঙ্গুন পুলিশের এক ত্রাসের কারণ হয়ে ওঠে। প্রতিষ্ঠাও কম হয়নি—রেঙ্গুনের তার বাড়ী যেখানে সেখানকার রাস্তার নামকরণ হয় মাসিদি খান রোড্‌। পুলিশ সে রাস্তায় ঢুকতেও ভয়

পেত। অনেক দৌরাত্ম্য সহ্য করবার পর, যে সময়ের কথা বলছি, সেই সময়ে প্রচুর দলবল নিয়ে পুলিশ মাসিদি খানকে ও তার লোকজন জনকতককে ধরে। তার ভিতর তার দুই ছেলে ছিল। ছোট ছেলেটি তিলা মহম্মদ খান। কিন্তু সাক্ষীসাবুদের অভাবে কাউকে বিশেষ কিছু সাজা দেওয়া সম্ভব হয়নি। মাসিদি খানের ৩ মাস জেল হয়, তিলা মহম্মদের ৬ মাস। মাসিদি খানের সঙ্গে আমার ও জীবনের দেখা হয় মান্দালে জেলে, তিলা মহম্মদের সঙ্গে আমার থেইট্‌মিও জেলে। পরে ইনি বর্মা লেজিস্লেটিভ কাউন্সিলের সভ্য হন।

তারাদৎ তিলা মহম্মদকে ডেকে নিয়ে আসতো, আমার ওখানে মাঝে মাঝে খেয়ে যেতেন। আফগানিস্থানের সঙ্গে এদের গোপন ব্যবসা চলতো, এবং প্রয়োজনমতো লোকও পার করতো। আমাদের লোকও দরকার হ'লে রুশিয়ার দিকে পার ক'রে দেবার ব্যবস্থা করবেন ব'লে কথা দেন। এই ভিক্ষু উ পীন্ নীয়া জ্যটা ও তিলা মহম্মদের কথা পরে আবার বলতে হবে।

ইতিমধ্যে, সেক্রেটারী অফ ষ্টেটের কাছে আমি ও জীবন মিহির ঘোষের ও বাংলার আই. বি. পুলিশের কীর্তিকলাপ নিয়ে যেসব কথা লিখেছিলাম, সেই সব সংক্রান্ত আরও বিস্তারিত খবর দিয়ে আর একখানা মেমোরিয়াল লেখা হয় তখনকার দিনের ভারতীয় লেজিস্লেটিভ অ্যাসেমব্লির প্রেসিডেন্ট বিঠলভাই প্যাটেলের কাছে। আমাদের নামে চার্জ দিয়েছে যে আমরা হিংসাত্মক কাজকর্মে লিপ্ত ছিলাম, কিন্তু ১৯২১ থেকে ২৩ সালের ভিতর যে হিংসাত্মক কোনো কাজের ভিতর আমরা ছিলাম না; কংগ্রেসের বা স্বরাজ্য পার্টির কাজ আমরা করি, তা সরকার বা আই. বি. চায় না—এই সব কথাই এই মেমোরিয়ালে ছিল। মেমোরিয়ালটা লেখা হয় আমি মান্দালেতে থাকতে। ইতিমধ্যে

বিপিন বাবু সেখানে এসে পড়েন। তাঁকেও আমরা এটা স্বাক্ষর করতে বলি। তিনি বলেন, গবর্ণমেণ্ট তো জানে, এবারে হিংসাত্মক যা কিছু হয়েছে, তার সঙ্গে আমি জড়িত, কাজেই ওটাতে আমি সই দেব না।

তিন জন আছি, তার ভিতর দু'জন সই করবে, আর একজন করবে না, এটা ভাল হয় না। তাই এটা আর তখন দেওয়া হয় নাই। কিন্তু জীবনের কাছে ওর একটা নকল রেখে আসি। ইতিমধ্যে সুভাষ, সত্যেনদা প্রভৃতি ধরা পড়ার খবর কাগজে পড়েই আমরা আন্দাজ করি, ওঁরা জনকতক বর্মায় যাবেন। তাঁদের মতামত কি, তাঁরা কেউ ওটায় সই করেন কিনা, কথা রইলো, জীবন আমায় জানাবেন।

খবরের কাগজে দেখলাম, সুভাষ, সত্যেনদা (মিত্র), মধুদা (সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ) অমর (ঘোষ), হরিদা (হরিকুমার চক্রবর্ত্তী) এবং অনুশীলনের ত্রৈলোক্য চক্রবর্ত্তী ও মদন ভৌমিক জানুয়ারী মাসে মান্দালে গেলেন। মার্চ মাস হয়ে গেল। আর অপেক্ষা না ক'রে আমি ওটা পাঠিয়ে দিলাম। ইতিমধ্যে কাগজে দেখলাম কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে পণ্ডিত মতিলাল নেহরু আমাদের প্রথম মেমোরিয়াল থেকে অনেক কথা উদ্ধৃত ক'রে বাংলার প্রথম অর্ডিনান্স সম্পর্কে বক্তৃতা করেছেন এবং বলেছেন, আমাদের নামে যে সব চার্জ আনা হয়েছে, তাঁর নামে আনলেও তিনি তার জবাব দিতে পারতেন না।

মান্দালে থেকে কোনো খবর না পাবার কারণ পরে শুনলাম, সুভাষ দ্বিতীয় মেমোরিয়ালের নকল জীবনের কাছে পেয়ে সবাইকে প'ড়ে শুনিয়েছেন। কেউ কেউ কোনো মতামত দেন নাই। কেউ কেউ বলেছেন, বেশ তো হয়েছে, পাঠিয়ে দেওয়াই উচিত।

সুভাষ সব শুনে খুব রেগে যান। বলেন, সে বেচারী একা একা

থেকে কষ্ট পাবে, আর লড়াই ক'রে যাবে, আর আমরা সবাই হৈ চৈ ক'রে আনন্দে কাটাব ?

এর পর থেকে যতো সরকারী কর্মচারীর সঙ্গে মান্দালেতে সুভাষের দেখা হয়েছে, প্রত্যেককে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়েছেন আমাকে যেন মান্দালেতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সে অনুরোধ গবর্ণমেণ্ট রাখে নাই। সুভাষ কিন্তু যখনই সুযোগ পেয়েছেন, গোপনে চিঠিপত্র লিখেছেন, চিঠিতে পড়াশুনো সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এই আলোচনা থেকে মনে আছে হার্জেনের Memoirs খানা তাঁর খুব প্রিয় বই ছিল। এর আগে বিলেত থেকে আসবার বেলায় কাষ্টম্‌স্‌কে লুকিয়ে আমার জন্য এনেছিলেন ক্রপট্‌কিনের Memoirs of a Revolutionist.

মার্চ মাসে অর্ডার এল, আমার বদ্‌লি ইন্‌সিনে, জ্যোতিষ বাবুর মান্দালেতে।

বদ্‌লির ঠিক আগে আই. জি. মেজর তারাপোর দেখা করলেন। জিজ্ঞাসা করলাম, আলাদা জায়গায় কেন ?

বললেন, আমরা কি করব ? আমরা চেয়েছিলাম সব এক জায়গায় রাখা হয়, তা'তে আমাদের পক্ষেও সুবিধা। কিন্তু ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্ট থেকে অর্ডার দিয়েছে, সব এক জায়গায় রাখতে পার, কিন্তু দত্তকে ভিন্ন জায়গায় রাখবে। আমরা আপত্তি করি, এভাবে একজনকে আলাদা ক'রে রাখা অত্যন্ত নিষ্ঠুর হবে। ভারত গবর্ণমেণ্ট তারপর এতটা পর্যন্ত রাজী হয়েছে যে আপনি ইন্‌সিনে থাকবেন আর মান্দালে থেকে কয়েক মাস পর পর এক একজন এসে আপনাকে সঙ্গ দেবেন।

তিলা মহম্মদকে দ্বিতীয় মেমোরিয়ালের একখানা নকল দিলাম। আই. জি.র আরদালী মাসিদি খানের লোক। তার মারফত আই. জি.র
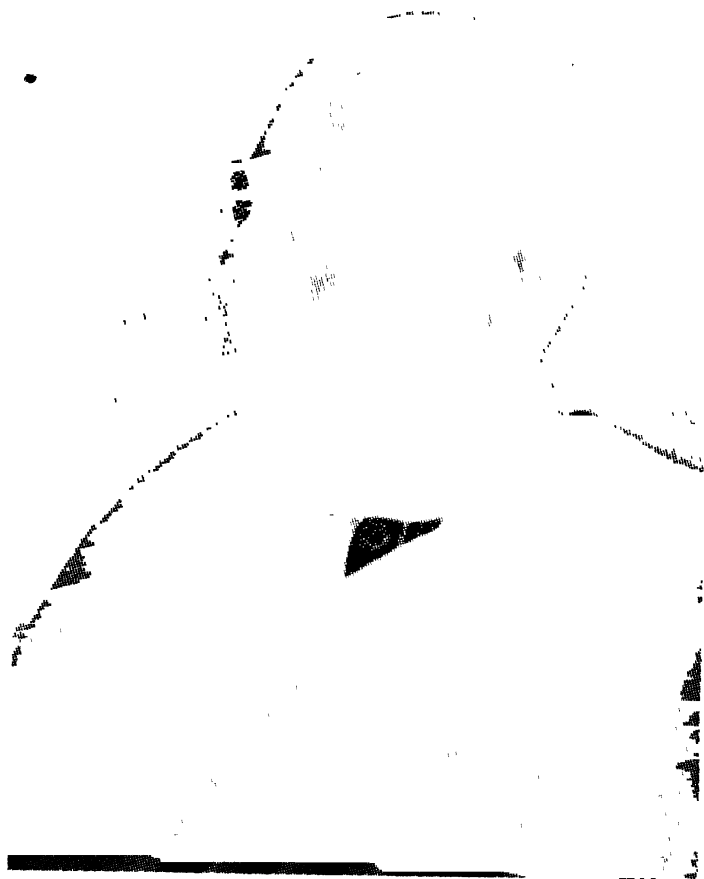
সুভাষচন্দ্র

কাগজ পত্রের ভিতর তিলা মহম্মদ ওটা রেঙ্গুনে পাঠিয়ে দেন। কয়েক-দিনের মধ্যে তিনিও খালাস হন। এবং ওটা নৃপেন ব্যানার্জিকে দিয়ে দেন। নৃপেন বাবু তখনও "রেঙ্গুন মেলের" সম্পাদক। তিনি ওটা সর্বভারতে প্রচার করেন। সুযোগ সুবিধা পেলেই নৃপেনবাবু বর্মার [illegible] সাহায্য করতে বিপদ আপদের কথা কখনও ভাবেন নাই।

(২)

ইনসিনে যে সেল ব্লকটায় আমার থাকার ব্যবস্থা করেছে, গোটাকতো আমকাঁঠালের ছায়ায় সেটা ঢাকা—অনির্দিষ্ট জেল জীবনের নৈরাশ্যের মেঘলা ছায়ারই মতো। একাধিকবার যে সব কয়েদির সাজা হয়েছে, শুধু তেমন কয়েদিই ইন্‌সিন জেলে রাখা হ'ত। মস্ত বড়ো জেল—৩৩০০ কয়েদি থাকে, ২২ জন জেলার। আমায় যে সেল ব্লকে পুরলো তার সামনে ও পেছনে আরও অনেকগুলো সেল ব্লক। আমাদের ঠিক পেছনেই একটা বড়োগোছের করিডর (corridor) সেল ব্লক (দুই দিকে মুখোমুখি কতকগুলি সেল, মাঝখানে একটিই মাত্র ঢাকা বারান্দা, অর্থাৎ সেলের ভিতর দিনরাত সমানই আঁধার)। এই সেল ব্লকে দশ থেকে পনের বিশজন পর্যন্ত ফাঁসির কয়েদি প্রায় সর্বদাই থাকে—সকাল সন্ধ্যায় তাদের গান বা স্তোত্র-পাঠের করুণস্বর মনের বিষাদের ছায়াকে আরও ম্লান, আরও গভীর ক'রে তোলে।

ইংরেজি crude কথাটাকে "অমার্জিত" বা "স্থূল" বললে সবটা বলা হয় না। বর্বরতার ভাবটা অনেকখানি তার সঙ্গে মাখিয়ে দেওয়া দরকার হয়। আমাদের দেশের জেলে সেল তৈরীর ব্যবস্থা যারা করেছে অম্‌নি crude মনোভাবের পরিচয় তারা তো যতোখানি

পেরেছে দিয়েছে। তার উপর ইন্‌সিনে তখন চীফ জেলার হয়ে এসেছে থেইট্রমিওর সেই ফস্টার, আর ডেপুটি সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সাদার্ল্যাণ্ড —জেলার থাকতে বর্মী কয়েদিরা এর নাম দিয়েছিল "ক্ষোয়ে ঠামু" "কুত্তা জেলার।" বর্মী কয়েদিরা প্রায় সব জেলারেরই এক একটা নামকরণ করে। আমাদের সেল ইয়ার্ডের দুই পাশে যে দিক দিয়ে সেলের কয়েদিরা যাতায়াত করতো, এরা দুজন মিলে আমি ওখানে পৌছাবার আগে, সেই দিকে কেবল দুখানা বাঁশের বাখারির বেড়া দিয়ে ক্ষান্ত হয় নাই, ফস্টার কাঁঠাল গাছের গায়ে রশি বেঁধে দিয়েছে, যেন কয়েদিরা কেউ ঐ বেড়ার কাছাকাছি এসে আমাদের সাথে কথা না বলতে পারে।

দু'দিন একলা কাটাবার পর আমায় সঙ্গ দেবার জন্য ম্যাণ্ডালে থেকে এলেন ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী (মহারাজ)। ঐদিনই লেগে গেল ফস্টারের সঙ্গে। এ দু'দিন তল্লাসী করতে আসে নাই। এই দিন সন্ধ্যায় বন্ধ হবার বেলায় এল।

জেলখানায় যে জিনিষগুলি বিরক্তি ও অপমানজনক লাগতো, তার মধ্যে সব চেয়ে সেরা এই তল্লাসী। অথচ সেকালের নিয়মের মধ্যে ছিল, রোজ সকাল বিকাল ষ্টেট প্রিজনারদের বাসগৃহ, জিনিষপত্র ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পুংখানুপুংখরূপে তল্লাসী করতে হবে ("shall be thoroughly searched")। একটু ভদ্রগোছের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট জেলার যে সব জায়গায় থাকতো, সে সব জায়গায় লিখিত নিয়মকানুন সত্ত্বেও আমাদের মর্যাদাবোধটাকে আঘাত করতে চাইতো না। ইন্‌সিনে সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মেজর ফিণ্ড্‌লে অত্যন্ত ভদ্র, দার্শনিক প্রকৃতির লোক। কিন্তু নিজে বিশেষ কিছু দেখাশুনো করতেন না, কাজেই রাজত্ব ছিল সাদার্ল্যাণ্ডের আর ফস্টারের। আর দায়িত্ব এদের,

কাজেই মেজর ফিণ্ড্‌লে ইচ্ছা সত্ত্বেও এদের কাজে বিশেষ কোনো বাধা দিতেও পারতেন না।

প্রথমেই ত্রৈলোক্য বাবুর সেল। ফস্টার দলবল সহ সেখানে ঢুক্‌লো। আমি বলি, কি তল্লাসী করবে তুমি? উনি যখন জেলে ঢোকেন, তখন সব দেখেশুনে দিয়েছ, তার পর যদি তার ভিতর কিছু ঢুকে থাকে, তা ঢুকতে পারে কেবল তোমার কর্মচারীদের মারফত। তাদের দোষের জন্য তুমি আমাদের অপমান করবে?

ও বলে, আমার আইনে আছে, আইনমাফিক আমায় কাজ করতে হবে।

আমি বলি, তোমার আইনজ্ঞান আমি ভাল ক'রে জানি। আমি হাটে হাঁড়ি ভাঙ্‌ব।

কথাটার একটু অর্থ আছে। পরে বল্‌ছি। ত্রৈলোক্য বাবুর একটি গুণ ছিল, ঝগড়া বা কোনো কিছু লেগে গেলে তিনি সমান তালেই চলতে চেষ্টা করতেন। তিনি আমার সঙ্গে সমানে চেঁচামিচি ক'রে গেলেন। ফলে তল্লাসী বিশেষ কিছু হ'ল না।

এল আমার ঘরে। আগে বলেছি, জেলখানার ঝগড়ায় ঠ্যাটামি খানিকটা করতে হয়, বিশেষতঃ আইন যখন আমাদের বিরুদ্ধে। আমাদের চেঁচামিচির চোটে টলতে টলতে ঘরে ঢুকে—সামনে ছিল টেবিলটা, আর সেই টেবিলে ছিল আমার রাতের খাবার সুদ্ধ টিফিন কেরিয়ার—ও সেই টেবিলে ভর দিয়ে একটু টাল সামলে নিচ্ছে, আমি হঠাৎ ভীষণ হিন্দু বনে গেলাম—টিফিন কেরিয়ারটা ছুঁড়ে বাইরে ফেলে হিন্দিতে—কারণ সঙ্গের জমাদার সিপাই সব গোঁড়া হিন্দুস্থানীর দল—চিৎকার সুরু করলাম, "তুমি খৃষ্টান, মদ খেয়ে দাঁড়াতে পারছনা, আমার খাবার ছুঁয়েছ। মনে করেছ, সেই খাবার আমি খাব?"

জমাদার সিপাই আর কেউ আমার ঘরে ঢুকল না। ফস্টার ভয়ে তো-তো ক'রে বলতে লাগলো, আমি মদ খাইনি, আমি মদ ছুঁইনে, বল্‌তে বল্‌তে বেরিয়ে গেল, জমাদারকে বললো ঘর বন্ধ করতে।

আমি জমাদারকে বললাম, দাঁড়াও, চিঠি নিয়ে যাও। এই চিঠি এখনই বড়সাহেবকে দেবে। লিখলাম, তোমার জেলার অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় এসে তল্লাসীর নামে আমার রাতের খাবার নষ্ট করেছে।

কয়েক মিনিটের মধ্যে মেঃ ফিণ্ড্‌লের জবাব এল: আমি আই. জি.কে ফোন করেছি, কাল খুব ভোরে তিনি এসে যা হয় ব্যবস্থা করবেন।

ফস্টার সম্পর্কে আগে বলেছি, জ্যোতিষ বাবু ও সতীশদার সঙ্গে থেইট্‌মিও জেলে খুব দুর্ব্যবহার করে। তাছাড়া ওর আরও সব কীর্তি ছিল।

কনওয়ে ব'লে একটি অ্যাংলোবার্মিজ জেলার ছিল থেইট্‌মিওতে— আমাদের কাজকর্ম, হিসাবপত্র সব দেখাশুনো করতো। সে আমায় বলে, মিঃ দত্ত, আমি তো হিসাবপত্র কিছু বুঝিনে, অথচ হিসাব-নিকাশের সময় এসেছে, আপনি যদি এগুলোকে একটু দাঁড়া ক'রে দেন তো আমার বড় উপকার হয়।

আটদশ মাসের হিসাব ওর সব টুক্‌রো টুক্‌রো কাগজেই ছিল। সেগুলো নিয়ে দেখি, ফস্টারের সই করা কণ্ট্রাক্টরের সব রসিদ—তাতে আছে, জ্যোতিষ বাবু, সতীশদা ও আমার জন্য তিনটি মশারির দাম ৫১৲। অথচ ওঁরা মেদিনীপুরের মশারিই ব্যবহার করছেন, আমি ম্যাণ্ডালে থেকে এনেছি। ধুতি প্রতি মাসেই ওঁদের জন্য এক আধ জোড়া লেখা আছে, অথচ ওঁরা সেই মেদিনীপুরের খদ্দরের ধুতিই গিরো দিয়ে চালাচ্ছেন,—এই রকম বহু জিনিষই আছে।

ইতিমধ্যে ফস্টার ইন্‌সিনে এসেও কিছু কিছু কীর্তি করেছে। জেল চালাবার পদ্ধতি ছিল তার সেই পুরোনো কালের জেলারদের পদ্ধতি। জেলারদের তখন কয়েদির মধ্যে একদল গুপ্তচর ও গুণ্ডা থাকতো। এরা সত্যমিথ্যা সর্ব উপায়ে সাধারণ কয়েদির জীবন অতিষ্ঠ ক'রে তুলতো; নিজেদের লাভের জন্য, ঈর্ষাবিদ্বেষের জন্য জেলারকে ব'লে কয়েদিদের অকারণ মারপিট করতো, শাস্তি দেওয়াত এবং জেলারদের জানাশুনোর মধ্যেই নিজেরা অবাধে অস্বাভাবিক যৌন অপরাধ পর্যন্ত ক'রে যেত।

ইন্‌সিন ছিল বেপরোয়া কয়েদির জায়গা। যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আসামী একজন এরই এক গুণ্ডাকে মারবার জন্য জেল ফ্যাক্টরী থেকে একখানা ছোরা তৈরী করিয়ে আনে। সেটা ধরা প'ড়ে যায়। এই মামলার অনুসন্ধানের জন্য জেলার অফিসের কাছে মাঠে টেবিলের সাম্‌নে বসেছে, একপাশে দাঁড়িয়ে আসামী, অপর পাশে গুণ্ডার দল, সিপাই জমাদাররা সাম্‌নে। ছোরাখানা টেবিলের উপর ধরা রয়েছে। এক সুযোগে ফস্ ক'রে ছোরাখানা তুলে নিয়েই লাফিয়ে প'ড়ে আসামী যে-গুণ্ডাকে মারতে চেয়েছিল, তারই গলায় বসিয়ে দিয়েছে। সে তো সেখানেই শেষ।

যথারীতি পাগলা ঘণ্টি পড়লো। সিপাই জমাদার ভিড় জমালো, কিন্তু ও ছোরা ঘুরাতে ঘুরাতে এমন ঘুরতে সুরু করলো যে ডেপুটি সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট, জেলার, সিপাই কেউ কাছে ঘেঁষতে সাহস পেল না। ও বলতে লাগলো, বড়সাহেব ছাড়া আর যেন কেউ আমার কাছে না আসে, যে আসবে তাকেই আমি খুন করবো। মেজর ফিণ্ড্‌লে এলে বললো, তোমার কাছে আমি আত্মসমর্পণ করব, কিন্তু কেউ যেন আমার গায়ে হাত না তোলে। মেঃ ফিণ্ড্‌লে অভয় দিলেন,

আমি নিজে সাথে গিয়ে তোমায় সেলে বন্ধ করব, কেউ তোমায় মারবে না।

ও তখন মেঃ ফিণ্ড্‌লের পায়ের কাছে ছোরা ফেলে সাষ্টাঙ্গে শুয়ে পড়লো। ওর গায়ে কেউ হাত দেয় নাই।

কিন্তু ফস্টারের অসৎ পদ্ধতি ও নির্বুদ্ধিতার জন্য জেলে একটা খুন হয়ে গেল। এই মামলা যখন আই. জি.র অনুসন্ধানসাপেক্ষ তখনই আমরা ইন্‌সিনে গেছি।

আমার খাওয়া নষ্ট করা থেকে স্থরু ক'রে মশারির দামের হিসাব পর্যন্ত যখন মেজর তারাপোরের কানে তুললাম, তিনি একটু হেসে বল্‌লেন, "So the prejudice started from Thayetmyo।"

আমি বলি, "There is no question of any prejudice. You just hold an enquiry into the accounts at Thayetmyo Jail which you are bound to do."

আই. জি. বলেন, "That I'll do. But about the search, I can't ask the Superintendent to ignore or violate the rules."

আমাদের কাছে একটি অঙ্গীকার চাইলেন, জেল থেকে কোনো কাগজপত্র বাইরে যাবে না, তাহ'লে উনি ভেবে দেখবেন স্থপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে কি অনুরোধ করতে পারেন।

আমি বলি, যা আমরা করেছি ব'লে কোনো প্রমাণ নেই, তা আমরা করব না—এমন অঙ্গীকার তিনি আমাদের কাছে চান কোন্‌ হিসাবে?

আই. জি. হেসে বলেন, যা-ই হোক আমি আশা করি, স্থপারি-

স্টেণ্ডেণ্টের সঙ্গে আপনাদের বন্ধুত্বের সম্পর্কই হবে এবং আইন যতো কম obnoxiously পালন করা যায়, তাই তিনি করবেন।

এই দিন থেকেই ফস্টারের অর্থাৎ চীফ জেলারের আমাদের ইয়ার্ডে ঢোকা নিষিদ্ধ হয়ে গেল। থেইট্নমিওর হিসাবের জন্য পরে ২০৲ টাকা জরিমানা হ'ল। কয়েদি খুনের মামলায় রেঙ্গুন জেলে বদ্লি হ'ল, কিন্তু ফার্ষ্ট গ্রেডের জেলার হয়েও সেখানে চীফ জেলার হ'তে পারলো না, একজন সেকেণ্ড গ্রেডের জেলারের নীচে রইলো এবং গুণ্ডা ও গুপ্তচর দিয়ে শাসন চালাবার অপরাধে পরে সময়ের পুর্বেই তাকে পেন্সন নিতে হ'ল।

তল্লাসীর উৎপাত ইন্সিনে আর আমাদের ভুগতে হয় নাই। ডেসমণ্ড ব'লে একজন ইউরো-এশিয়ান জেলার আমাদের চার্জে ছিলেন, খুব ভদ্র প্রকৃতির। তাঁরই আমাদের তল্লাসী নেবার কথা। তিনি সেল খুলবার ও বন্ধ করবার সময় উপস্থিত থাকতেন, কিন্তু খাতায় তাঁকে লিখতে হ'ত thoroughly search করেছেন।

এ উৎপাত যখন গেল, তখন আই. জি.কে বল্লাম, এ-সেলে থাকব না। আসল কথা, ম্যাণ্ডালেতে ঝাঁকের কই ঝাঁকের ভিতর যেতে চাই। মেঃ তারাপোর পুনরুক্তি ক'রে বললেন, সে আর সম্ভব নয়। ওখানে ঐ সেলই ভেঙ্গেচুরে নতুন রকম ক'রে দেবেন। প্ল্যান তখনই হয়ে গেল, চারটে সেলের সাম্নের অ্যান্টিসেল ভেঙ্গে বড় বারান্দা করা হবে, দুপাশে দুটো সেলে বাথ রুম আর খাবার ঘর হবে, সবগুলো সেলের পেছনে বড় বড় জানালা ক'রে দেওয়া হবে। আপাততঃ রাত্রে থাকবার ব্যবস্থা হ'ল একটু দূরে হাজতের ওয়ার্ডের দোতলার এক অংশে। ১৯০৮-৯ সালে বরিশালের মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা সেখানে ছিলেন। থেইট্নমিও ও বেসিনে যে-দুটো নিভৃত

প্রান্তের ঘরে শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী ও সতীশ চাটার্জি ছিলেন, সেই ঘর দুটো এর আগে দেখে এসেছি। রাজা সুবোধ মল্লিক ছিলেন মৌলমীনে।

কয়েক মাসের ভিতর সেলের চেহারা নতুন হ'ল। কিন্তু রাত্রি এবং মাঝে মাঝে দিনে বাসের জন্যও হাজতের ও-ঘরও ছাড়লাম না। আমি দু'বছর ছিলাম, আমি চ'লে আসার পরও, অরুণদা, সুভাষচন্দ্র, সতীশদা, প্রতুলবাবু প্রভৃতি একসঙ্গে বা পর-পর ঐ ব্যবস্থাতেই ওখানে কাটিয়ে এসেছেন।

কিন্তু ইন্‌সিনের নিরানন্দের দিন কাটতে সময় লাগলো। ফস্টার আমাদের ইয়ার্ডে ঢুকতে পেত না, তবু সে চীফ জেলার, তারই সব দায়িত্ব। সে যখন তখন ইয়ার্ডের আশে পাশে ঘুরে দেখে যেত কাঁঠাল গাছে বাঁধা তার রশির মর্যাদা ঠিক আছে কিনা। তেমনি ঘুরতো ডেপুটি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাদার্ল্যাণ্ড। ইন্‌সিন জেলে পাঁচটি ডাক্তার। এঁদের সাথে ভাব করা যায় কিনা—যখন তখন ডেকে পাঠাতাম। কিন্তু গুরুগম্ভীর সব চেয়ে সিনিয়র মাদ্রাজী ডাক্তারটি ছাড়া আর কারও আমাদের ওখানে আসার হুকুম ছিল না। চট্টগ্রামবাসী বাঙালী কম্পাউণ্ডারটি ঔষধ খাওয়াবার নাম ক'রে দুপুরে, যখন কেউ থাকতো না, তখন দু'দিন এলেন। সাবধান ক'রে দিলাম, আর না আসেন। কিন্তু উনি লোভ সামলাতে পারেন নাই। তৃতীয় আর একদিন এসেছেন, পাঁচ মিনিটও কাটে নাই, সাদার্ল্যাণ্ড এসে উপস্থিত। অর্থাৎ, কোনো গুপ্তচর খবরটি দিয়েছে। সাদার্ল্যাণ্ড ভাল মানুষটির মতো—যেন আমাদের সাথেই গল্প করতে এসেছে—এসে ওঁকে জিজ্ঞেস করে, কিছু কাজ আছে?

উনি বলেন, ঔষধ খাওয়াতে এসেছি।

হয়ে গিয়ে থাকলে এখন যাও।

হুকুম হয়ে গেল কম্পাউণ্ডারের মৌলমীনে বদ্‌লির, ঐ দিনই সন্ধ্যাবেলায় রওনা হ'তে হবে।

নিরপরাধ বেচারির কথা ভেবে মনে হ'তে লাগলো, আমাদের সংস্পর্শও এত বড় পাপের!

ইতিমধ্যে খবর পেলাম আমাদের সেই মেমোরিয়ালের জন্য বেসিনের চীফ্ জেলার ভগবান সিং সাসপেণ্ড হয়েছেন। বর্মার জেলারদের তখন আটটি গ্রেড ছিল। তার ভিতর ফস্টার ও রিচার্ড্‌স্ ফার্স্ট গ্রেডে। সেকেণ্ড গ্রেডের কয়েকজনের ভিতর ভগবান সিং এক-জন। ডেপুটি জেলার নাইকার তাঁর বিরুদ্ধে মালমশলা যতো পেরেছে সংগ্রহ ক'রে দিয়েছে। সাসপেণ্ড হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বেচারীর brain paralysis হয়ে গেছে। এখন সরকারের অনুমতি নিয়ে ইন্‌সিনে বাড়ী ভাড়া ক'রে আছেন, চিকিৎসা চলছে। একটু সুস্থ হয়ে উঠছেন।

একদিন ভোর বেলা আফিসে ডাক পড়লো। গিয়ে দেখি আই. জি. বসে আছেন। বললেন, আমাদের সেই মোমোরিয়াল সম্পর্কে আমায় দু'চারটে কথা জিজ্ঞেস করতে চান।

প্রথম প্রবৃত্তি জাগলো, কোনো কিছু বলব না; সেই ভাবেই সুরু করলাম। তখন দেখি, মেঃ তারাপোর ভগবান সিংকে ডেকে পাঠালেন। তখনই ঠিক করলাম, একে বাঁচাবার মতো যা কিছু বলবার বলব, যা কিছু দায়িত্ব আমার আর জীবনের ঘাড়েই নেব।

সব প্রশ্নের মধ্যে বড়ো হয়ে দাঁড়ালো কাগজের প্রশ্ন। আমি বলি, কতো কাগজ নিয়েছি, তা আমার সঠিক মনে নেই, তবে ৮০।৯০০ খানার কম নয়, কারণ জীবনের টাইপ করা কখনও অভ্যাস ছিল না,

তিনি অনেক কাগজ নষ্ট করেছেন। তাছাড়া নকলও আমরা একটা রেখেছি।

ভগবান সিং বলেন, তিনি ২৪ খানার বেশী কাগজ দেন নাই। আমি বার বার ক'রে নানা কথা তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিই, যাতে তাঁর দায়িত্ব কমে যায়। কিন্তু বেচারী কেমন হতভম্ব হয়ে গেছেন, কোন কথাই যেন বুঝতে পারেন না।

মেঃ তারাপোর তখন যা বললেন, তার মর্ম এই : সমস্ত ভারতবর্ষের কাগজে মেমোরিয়ালটির নকল বেরিয়েছে। মেমোরিয়ালে কি আছে না আছে, গবর্ণমেণ্টের পক্ষে তা কতোখানি ক্ষতিজনক, তা নিয়ে আমার কোন মাথাব্যথা নেই। কিন্তু ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্ট চায়, এ নিয়ে এমন একটা দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করতে যেন এই রকম ভাবে আর কোনো কাগজ জেল থেকে না বের হ'তে পারে। এই পাঁচখানা ফাইল আমি সঙ্গে ক'রে এনেছি। এত বড় বড় আরও ডজন দু'য়েক ফাইল জমেছে আমার আফিসে এই মেমোরিয়াল সম্পর্কে। আপনি যা বলেছেন, মিঃ চাটার্জিও অন্য এক জেলে (জীবন তখন X-ray করাবার জন্য রেঙ্গুন জেলে এসেছেন) আমার কাছে ঐ একই ধরণের সব কথা বলেছেন। আপনাদের দুজনের কথা মিলে যাচ্ছে। বেসিন জেলের রেকর্ডেও পাচ্ছি ৮০ খানা কাগজ আপনারা নিয়েছেন। অথচ ইনি (ভগবান সিং) বারবারই বলছেন, উনি ২৪ খানার বেশী কাগজ দেন নাই।

আমি ভগবান সিংকে বলি, মনে ক'রে দেখুন, আমাদের দরখাস্তখানাই তো ছিল ২৪ পৃষ্ঠার।

মেঃ তারাপোরের কথার ভাবে স্পষ্ট বুঝলাম, খুব সহানুভূতির সাথেই তিনি ভগবান সিং-এর বিরুদ্ধে অনুসন্ধান করছেন। আমি বললাম, কোনো কারণে ওঁর স্মৃতিভ্রম হচ্ছে।

অল্পদিনের ভিতরই মেঃ তারাপোর ওঁর সাসপেণ্ড অর্ডারটা কাটিয়ে দিলেন। ভগবান সিং ইন্‌সিনেই যোগ দিলেন। অল্প দিন ছিলেন। একদিন কি দু'দিন দেখা হয়েছিল। ওঁকে দেখলে কষ্ট হ'ত।

এর মধ্যে এক দিন দেখা মিঃ মজিদের সঙ্গে—থেইট্‌মিও জেলের চীফ জেলার। দ্বিতীয় মেমোরিয়াল সম্পর্কে অনুসন্ধানের জন্য তাঁকে ওখানে বদলি ক'রে এনেছে। বিষণ্ণ ভাবে বললেন, চাকরী থাকবে না। সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করলাম, কি কি বলতে হবে ব'লে দিলাম—আমার ঘাড়ে যেন সব কিছু চাপিয়ে দেন, আমি সব স্বীকার ক'রে নেব।

এঁকেও ভুগতে হ'ল। তবে মেঃ তারাপোরের চেষ্টায় চাকরিটি বজায় রইলো। ইনিও সেকেণ্ড গ্রেড জেলার।

মনের উপর বিষণ্ণতার চাপের এই একটি দিক। পড়াশুনোর সুযোগ কম। রেঙ্গুন পাবলিক লাইব্রেরী থেকে কিছু কিছু বই পাই—রেঙ্গুন সি. আই. ডি.র যেসব বই দিতে আপত্তি না থাকে। উপন্যাসের সঙ্গে আর যা পাই বেশীর ভাগ ভ্রমণবৃত্তান্ত। সোয়েন হেডিনের বই গুলোতে এক এক সময় মেতে থাকি। এছাড়া, অপরাধতত্ত্ব ও অপরাধীদের মনোবিজ্ঞান সম্পর্কে কিছু কিছু বই পাঠান মেঃ তারাপোর।

সঙ্গী ত্রৈলোক্যবাবু। তাঁর সঙ্গ পাইনে। পড়াশুনো তিনি যা করেন, তার বিষয়বস্তু, আদর্শ, উদ্দেশ্য ভিন্ন। রাজনীতির দিকে, দলগড়ার রাজনীতির বাইরে আর কোন কিছুর সন্ধান পাইনে। মানুষ হিসাবে, আমিও যখন ১৯১১-১২ সালে অনুশীলনের ভিতর ছিলাম, বয়োজ্যেষ্ঠরা বঙ্কিমের ভবানী ঠাকুরের "দোকানদারী চাই" কথাটার উপর বেজায় বেশী জোর দিতেন। এমন কি, সেবাশুশ্রূষাটাও

দোকানদারীর অঙ্গ। অথচ আর একজনকে স্বস্তি তৃপ্তি দেবার চেষ্টা ক'রে ক'রে যৌবনে নিজেকে অতিক্রম ক'রে যাবার জন্যে সেবার চেয়ে সহজ পথ আর তো খুঁজে পাইনে! দোকানদারীর শিক্ষাতে অনেক মানুষের অনিষ্ট হয়েছে ব'লে আজও আমার ধারণা।

ইমার্সনের লেখায় পড়েছি "Every man's nature is a sufficient advertisement to him of the character of his fellows." এই বিজ্ঞাপনটিই হ'তে প্রস্তুত নই। শ্রীঅরবিন্দের লেখায় পড়েছি, তাঁর সঙ্গে আলাপে বুঝেছি—রবীন্দ্রনাথে তার সমর্থন মিলেছে—রক্তমাংসের মানুষ পশু, কিন্তু রক্তমাংস ছাড়া সে আর যেটুকু, সেটুকুতে সে দেবত্বে প্রতিষ্ঠিত হ'তে চায়, মানুষের সমাজকে পশুর সমাজের স্তর থেকে দেবসমাজের স্তরে তুলতে চায়।

যতীনদার স্বাধীনতার সাধনা ছিল এই সাধনারই অঙ্গ। ইদানীংকার বয়োজ্যেষ্ঠদের মধ্যে স্বামী প্রজ্ঞানানন্দের সঙ্গে খুবই সামান্য সময়ের আলাপ—তাতে যা বুঝলাম, তাঁরও সাধনা এথেকে পৃথক নয়। গান্ধীজির সঙ্গে নাগপুরে তিন দিন ধ'রে হিংসা অহিংসার যে আলোচনা, তারও ভিতর পেলাম, তাঁর অহিংস সমাজ আর অরবিন্দের দেবসমাজ লক্ষ্যে, আদর্শে এক, উপায়েই মাত্র পৃথক।

কিন্তু এই যে দেবত্বে প্রতিষ্ঠা, এ তো দোকানদারীর ব্যাপার নয়—এ যে ভিতর থেকে মানুষের আমূল পরিবর্তন—মানুষের প্রতিটি কণাকে ধুয়ে মুছে শোধন ক'রে নেওয়া। রক্তমাংস মানুষকে পশুত্বে ধ'রে রাখতে চায়, আবার এই রক্তমাংসই—অনুভূতিতে বুঝি, পুরাণে উপন্যাসে পড়ি—মানুষকে পশুত্বের উর্ধ্বে নিয়ে যেতে চায়, নিয়ে যেতে পারে। কিন্তু সে যে প্রতিমুহূর্তের সজাগ সাধনা। আর এখানে

যদি "দোকানদারী"র কাঁথা মুড়ি দেবার অবসর থাকে, তা হ'লে তো এই সাধনার কঠোরতা থেকে অক্লেশ অব্যাহতি।

আদর্শের সংঘর্ষ অন্যদিকেও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অরবিন্দের লেখায় সাধনার উপায় হিসাবে, গীতা উপনিষদের শিক্ষার ধ্যানে, বিবেকানন্দের ব্যাখ্যাতেও পেয়েছি—আত্মসমর্পণ। জীবনের ঐ চৌদ্দপনের বছর ভিতরে ভিতরে নিজেকে মুছে ফেলবার কল্পনাই, যতো অক্ষম সংকল্পেই হোক্, মনের ভিতর স্থান পেয়েছে। কিন্তু আজ দেখি, এই আত্মসমর্পণের সঙ্গে শক্তির সাধনার সামঞ্জস্য এক হয়তো যতীন্দ্রনাথের মতো বিরাট ব্যক্তিত্বের পক্ষেই সম্ভব।

সততার সঙ্গে যাঁরা সাধনা করেছেন, আমাদের সেদিনের এমন অনেকে হয়তো এই কারণেই পরবর্তী জীবনের রাজনীতির ক্ষেত্রে নিজেদের তেমন ক'রে খাপ খাওয়াতে পারেন নাই। অথচ যে-যুগে আমরা সবাই জানতাম, ঝাঁকে ঝাঁকে আমাদের মরতে হবে, তিলে তিলে জীবন বিসর্জন দিয়ে যেতে হবে শুধু দেশকে জাগাবার লক্ষ্যেই, সে-যুগের পক্ষে বোধ হয় শ্রেষ্ঠতর পথই ছিল ঐ আত্মসমর্পণের পথ, নীরবে লোকচক্ষুর অন্তরালে চলার পথ।

পাড়াগাঁ থেকে একদিন গরীবের ছেলে সহরে এসেছিলাম লেখাপড়া শিখতে। নিজেকে কোনো কিছুতে সাম্‌নে দাঁড় করাতে সংকোচে বাধতো। পনের বছর বয়সে রাজনীতির ক্ষেত্রে হাতে খড়ি হয়েও নানা শিক্ষার ভিতর যেটি নিজে দীক্ষার জন্যে বেছে নিলাম, সেটি ঐ আত্মসমর্পণের মন্ত্র। এর সঙ্গে খাপ খেয়ে গেল শশীদার শিক্ষা—নিজেকে মুছে ফেলার শিক্ষা। এর ভিতরও শক্তির পরিচয় ফুটতে পারে, কিন্তু সে অন্য ধরণের শক্তি।

যতীনদা নেই। আজ যাঁদের পিছে, যাঁদের নীচে স্থান নিতে চাই,

সে যোগ্যতা তাঁদের নেই, ইচ্ছার সংকল্পের দৃঢ়তাও নেই। অথচ পনের বছর আপ্রাণ নিজেকে একটা ধারায় ধ'রে রেখে আজ আবার নতুন ক'রে আত্মপ্রতিষ্ঠার কল্পনা নিজেই বুঝি, প্রায় একটা স্বপ্নের মতো। ভাবি, সবাই মিলে চলবো, সবার বুদ্ধিতে, শক্তিতে যে গতিবেগ সৃষ্টি হবে, আমি তারই পেছনের বাহিনীতে স্থান ক'রে নেব। তবু যেন একটা ভবিষ্যতের ব্যর্থতার ছায়া মনে নেমে আসে। তার সঙ্গে সঙ্গে যতোবার একটা আত্মপ্রতিষ্ঠার ইচ্ছা জাগে, যেন নিজেকে চেপে দেবার জন্যে সমস্ত প্রাণের আকুলতাকে কুড়িয়ে এনে গান ধরি—কে শুন্‌লো, শুনে কে হাস্‌লো, কে কি ভাবলো, সেসব ভাবিনে—

"আর আমারে বাইরে তোমার
কোথাও যেন না যায় দেখা।
তোমার রাতে মিলাক আমার
জীবন সাঁঝের রশ্মিরেখা।
আমায় ঘিরি' আমায় চুমি'
কেবল তুমি, কেবল তুমি।
আমার ব'লে যা আছে, মা,
তোমার ক'রে সকল হরো।"

বিষাদের আরও কারণ ছিল বাইরের অবস্থার ভিতর। এটা জানা কথা, সুযোগ সুবিধা মিললেই ওরা আমাদের দলবল, সংঘশক্তি, অনুষ্ঠান, প্রতিষ্ঠান সবই ভেঙ্গে দেবে। কিন্তু তাতেও কিছু সান্ত্বনা মেলে না।

১৯২৩ সালের সেপ্টেম্বর থেকে সুরু ক'রে ১৯২৪ সালের অক্টোবরের ভিতর তিন ঝাঁকে আমরা সবাই ধরা পড়ি। তার ভিতর শেষ ঝাঁকে সুভাষ, সত্যেনদা, মধুদা, হরিদা, অমর প্রভৃতি যখন ধরা পড়েন, তখন

আমাদের দিক থেকে কংগ্রেস দেখবার লোক একমাত্র অবশিষ্ট রইলেন স্থরেশ দাস। দেশবন্ধু অবশ্য যখন দেখলেন, যুগান্তরের কর্মীদের ধ'রে পুলিশ তাঁর স্বরাজ্য দলের উত্থান রোধ করতে চায়। তখন তিনি সে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলেন এবং যুগান্তরের লোক নিয়েই বাংলার প্রাদেশিক কংগ্রেস* গঠন করলেন। কিন্তু এঁদের অনেকেই তখন কর্মজীবন থেকে অবসর নিচ্ছেন। কাজেই দলের প্রাধান্য থাকলেও প্রাণের স্পন্দন দেখা দিল না—সেটা পরে খানিকটা দিয়েছিল স্থরেশবাবু যখন "কর্মীসংঘ" গড়ে তোলেন।

কিন্তু কংগ্রেস বা স্বরাজ্যদলের সাধারণ প্রচার কাজ ছাড়াও মঠ, আশ্রম ও বিদ্যাপীঠ জাতীয় আমাদের কতকগুলি স্থায়ী কেন্দ্র ছিল। সেগুলির কথা আগে বলেছি। ধরপাকড়, খানাতল্লাসী ক'রে, আশপাশের লোককে ভয় দেখিয়ে পুলিশ এগুলিকে উৎখাত করবার চেষ্টা করতে লাগলো। অমরদা (চাটার্জি) ধরা পড়াতে উত্তরপাড়া বিদ্যাপীঠ উঠে গেল। কুন্তল ও চারুর মৃত্যুতে এবং কিরণদা (মুখার্জি) ধরা পড়াতে দৌলতপুর সত্যাশ্রম নির্জীব হয়ে পড়লো। দু'একজন কর্মী যাঁরা থাকেন, তাঁদের সম্পর্কে কলেজে ছাত্র ও অধ্যাপকদের ভিতর, পাশের গ্রামের লোকদের ভিতর যার কাছে যেমন স্থবিধা, প্রচার চলে। ডায়মণ্ড হারবার (আবদালপুর) সত্যাশ্রম সম্পর্কে কারও কাছে বা বলে, ওটা বিদেশ থেকে আমদানী অস্ত্র তুলবার ঘাঁটি, কারও কাছে বা বলে, ওখানকার কর্মী রসিকলাল দাস প্রেত-সাধক।

বন্ধুবান্ধব সবাই ধরা প'ড়ে যাবার পর দলের দিক থেকে বিভিন্ন জায়গায় আমাদের যে কয়টি দায়িত্বশীল কর্মী অবশিষ্ট ছিলেন, তার ভিতর রসিকের উপর অনেকখানি নির্ভর করতাম। আবদালপুরে

আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হবার সময় জানা গিয়েছিল, কর্মকেন্দ্র হিসাবে ওটা একটা বিশিষ্ট স্থান পাবে। প্রতিষ্ঠিত হবার কয়েক মাস পর ওখানে গিয়ে দেখি, তার কোনো সম্ভাবনাই নেই। চমৎকার জায়গাটি, গঙ্গার ঠিক উপরেই—গঙ্গা ওখানে প্রায় মাইল তিনেক চওড়া। আশ্রমটি গঙ্গার বাঁধের বাইরে—বর্মার পথে জাহাজ থেকে জীবনকে, সতীশদাকে দেখালাম।

কিন্তু আশ্রম থেকে অন্ততঃ বিশ মিনিটের পথের ভিতর কোনো দিকে লোকালয় ব'লে কিছু নেই। আশ্রমের ভিতরেও অন্য কোনো লোক রাখবার সুযোগ নেই। আশ্রম এখানে যিনি প্রতিষ্ঠিত করিয়েছিলেন, তাঁর বাবাও ও-প্রতিষ্ঠানের বিরোধী। দুপুরে এবং রাত্রে বাবা ঘুমিয়ে পড়লে দিন ১টা ১॥টায় এবং রাত ১১টা ১১॥টায় মায়ের কাছ থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে কোনো বেলায় দুটো চুনোমাছের ঝোল আর ভাত, কোনো বেলায় স্রেফ খেসড়ির ডাল আর ভাত ভদ্রলোক দিয়ে যেতেন। এর ভিতর সকাল বিকাল দুটো মুড়িও যদি দৈবাৎ মাসে দু'তিন দিন জুটে যেত তো ভাল। তার উপর কোনো লোকজনের গতায়াত নেই বললে চলে। কোনো কাজ নেই, কর্ম নেই, দিনের পর দিন, মাসের পর মাস এই জীবন কাটাচ্ছেন রসিক।

আমি আপত্তি তুললাম। একটি যুবক, কর্মের উদ্যমে লেখাপড়া ছেড়ে বেরিয়েছেন কাজের সুযোগ খুঁজে। তাঁর জীবনকে এইভাবে নষ্ট করবার অধিকার আমাদের নেই। একজন বন্ধু এর ভিতর আমার সংকীর্ণ অভিসন্ধি খুঁজে পেলেন। তা সত্ত্বেও আমি রসিককে ওখান থেকে সরাতে কৃতসংকল্প হয়ে উঠি। কিন্তু ইতিমধ্যে ধরা প'ড়ে যাই। আরও দু'এক জনকে রসিকের সঙ্গে রাখবার চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু

কেউ টি`কতে পারে নাই। ছয়টি বৎসর ঐভাবে রসিক ওখানে শুধু ক্যাসাবায়ানকার প্রকৃতির পরীক্ষা দেন। নিজের পরিবার বলতে যা ছিল তাকে নিঃস্ব ক'রে তোলেন। পরে তো তা একেবারে মুছেই যায়। জীবনও ওঁর নষ্ট হয় বলতে হবে। ওখানে আশ্রম করার চেষ্টা সফল হবার কোনো সম্ভাবনাই ছিল না। কিন্তু আমরা সবাই ধরা প'ড়ে যাবার পর রসিক অন্যদিকে নিজের কর্মশক্তিকে নিয়োজিত করেন—যার অভিব্যক্তি পরবর্তীকালে অনুজা সেন আর দীনেশ মজুমদারের আত্মনিবেদনে।

আশা ক'রে থাকি, রসিক যতোদিন বাইরে আছেন, আমরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাব না। কিন্তু কোনো খবর পাইনে। ইন্‌সিনে ব'সে আশ্রম মঠগুলোর উপর উৎপাতের খবরই কেবল পাই।

বাংলা দেশের জেলের খবর ত্রৈলোক্য বাবুর মারফত যা পেলাম, তা-ও আশাপ্রদ নয়। ১৯২৪ সালের অক্টোবরের ধরপাকড়ের পর দুই দলের নেতারা অনেকে মেদিনীপুর জেলে জোটেন। তাঁরা নাকি দুই দলের এক হয়ে যাবার কথা পাকা ক'রে ফেলেছেন। কি ভাবের মিলমিশ হবে যখন জানতে চাইলাম, ত্রৈলোক্য বাবু বললেন, আপনারা public কাজ নিয়ে থাকবেন, আমরা secret কাজ করব।

চমৎকার মিলমিশের ব্যবস্থা তো!—আমি বলি।

অনেকবারের অভিজ্ঞতার পর অনুশীলনের সঙ্গে আমাদের মিলমিশের আলোচনার নাম দিয়েছিলাম শেয়ালের যুক্তি। এই যে পাকা কথা হয়েছে ব'লে আমায় মেদিনীপুর থেকে বার্তা পাঠানো হয়েছে, এর ভিতরও মনে হ'ল, হয় অনেকখানি ফাঁকি আছে, নয়তো বার্তাবাহক আপন মনের মাধুরী মিশিয়েছেন।

সব দিকের আঁধারের ভিতর দিয়ে ভবিষ্যৎ আকাশের গায়ে আলোর সন্ধান খুঁজি। চারিদিকের কপাট বন্ধ। এরই ভিতর কাছের জানালা একটি খুল্‌লো অত্যন্ত অপ্রত্যাশিতভাবে।

সেলের নতুন খোলা জানালার পেছন থেকে একদিন এক সেপাই এসে আত্ম-পরিচয় দিল। তার নাম জীবট উপাধ্যায়। রেঙ্গুনে একটি আড্ডায় পাঁচ সাতটি, দশ বারটি বাঙালী যুবক একত্র হন। ইন্‌সিনেও তাঁদের আড্ডা আছে। তাঁদের ভিতর একজন চিঠি লিখেছেন। একটি বিশেষ সময়ে জীবট আমায় চিঠি দিয়ে যাবে।

চিঠিতে যাঁর নাম পেলাম, তিনি জিতেন ঘোষ, ঢাকায় বাড়ী। তিনি আমার নাম জানেন, জীবনকে ও পূর্ণদাকে চেনেন। রেঙ্গুনে দল করতে সুরু করেছেন।

চিঠিপত্রের আদান প্রদান চলতে লাগলো। কয়েক দিনেই বুঝলাম, জিতেন অত্যন্ত উৎসাহী কর্মী। এর ভিতরেই সারা বর্মায় ভারতীয় ছাত্রদের একটি সংঘ গ'ড়ে তুলেছেন।

আমাদের বাজার করতো একটি মুসলমান সিপাই, গফুর। কর্তৃপক্ষের একান্ত বিশ্বাসী। ইতিমধ্যে তাকে দিয়ে আমি রেঙ্গুন থেকে **Forward** আনাতে সুরু করেছি। জীবটের আমার সঙ্গে কদাচিৎ কখনও দেখা করার সুযোগ মিলতো। কিন্তু গফুর তো দুবেলাই আসতো। হঠাৎ একদিন দেখি, জিতেন গফুরের সঙ্গেও ভাব ক'রে নিয়েছেন। তার মারফত চিঠি পাঠিয়েছেন। এখন থেকে চিঠি চলে নিয়মিত। ফস্টারের রশি তখনও কাঁঠালগাছে শক্ত করে বাঁধা রয়েছে।

চিঠিতে এবং কাজে জিতেনের পরিচয় পেয়ে ক্রমে তিলা মহম্মদের কাছে ও উ পীন নীয়া জ্যাটার কাছে ওঁকে পরিচয় পত্র দিই। তিলা

মহম্মদ সানন্দে জিতেনদের কিছু কিছু অর্থসাহায্য করতে থাকেন। ভিক্ষু জ্যাটার সঙ্গে প্রোমে গিয়ে জিতেন পরিচয় করেন আরও পরে। আমিও বলি, জিতেনও বোঝেন, বর্মায় বর্মীদের সাথে না মিশতে পারলে বিপ্লব চেষ্টার কোন অর্থ হয় না। এদিকে এই ভিক্ষু অনেকখানি সহায় হন।

ইতিমধ্যে যে-সিপাই আমাদের দুধ আনতো, তার ট্যাঁক থেকে একদিন একখানা চিঠি আমার হাতে পৌছাল, সে-চিঠি দেখি চট্টগ্রামের নির্মল সেনের।

এর চেয়ে আনন্দের আর কিছু আমি আশা করতে পারিনি। আমি ও চারু ১৯২২ সালে চট্টগ্রামে "সাম্যাশ্রমে" সূর্য সেনের সঙ্গে যখন ছিলাম, তখন সেখানে যাঁদের সংগে পরিচয় হয়েছিল তার ভিতর অন্তরঙ্গ ছিলেন সূর্য বাবুর পরেই নির্মল। নির্মল সত্য সত্যই নির্মল। এবং সূর্যবাবুর সঙ্গে আমাদের যতোগুলি কর্মী তখন জুটেছিলেন, তার অধিকাংশকে বোধ হয় নির্মলই টানেন। ক্রমে নির্মলের সঙ্গে চিঠিপত্রে জানতে পাই, চট্টগ্রাম এ. বি. রেলওয়ের টাকা লুঠের পর ওঁরা অনেকে বর্মায় গেছেন। এঁদের ভিতর লোকনাথ বল, মণি দে, উপেন ভট্টাচার্য (অবনী), রাখাল দে, গোবিন্দ বিশ্বাস এবং আরও অনেকের সঙ্গে আমার চট্টগ্রামে পরিচয়, কেউ কেউ দৌলৎপুর সত্যাশ্রমের কর্মী হিসাবেও আমাদের সঙ্গে ছিলেন। মাঝে মাঝে এঁরা বাইরের রাস্তায় দাঁড়িয়ে ইসারায় ইঙ্গিতে কথাবার্তা ব'লে যেতেন, আমি আমাদের দোতলায় শোবার ঘরের দরজায় দাঁড়াতাম। এই ভাবে সুযোগ মতো দেয়ালের উপর দিয়ে কখনও কখনও জিতেনদের সঙ্গেও চিঠিপত্রের আদান প্রদান চলতো।

নির্মলদের সঙ্গে জিতেন ইতিমধ্যেই পরিচয় ক'রে নিয়েছেন

এবং এক যোগে কাজ করছেন। প্রকাণ্ড একটা শক্তি গ'ড়ে উঠ্‌ছে।

জিতেনই আমায় খবর পাঠিয়েছেন, অনুশীলনেরও জনকতক কর্মী আছেন রেঙ্গুনে। তাঁদের একজনের একটা বইয়ের দোকান আছে, সেইটিই তাঁদের কেন্দ্র। তাঁরাও আলাদাভাবে বাঙালী ছেলেদের ভিতর দল গড়ছেন। জিতেন লিখলেন, এর ভিতরই রেষারেষি লেগে গেছে। এর তো কোনো প্রয়োজন নেই। আপনারা দু'জনায় জেল থেকে লিখে পাঠালে আমরা এক সঙ্গে কাজ করতে পারি।

জিতেন ও নির্মলদের সব খবরই এ পর্যন্ত ত্রৈলোক্যবাবুকে বলেছি। তিনিই খবর নিয়ে এসেছেন, বাংলার জেলে আমাদের দুই দলের মিলমিশ হয়ে গেছে। এখন খেয়ে দেখতে চাইলাম পিঠে কেমন লাগে। ত্রৈলোক্য বাবু জ্ব'লে উঠ্‌লেন; বললেন, আপনি ওদের কাছে লোকজন পাঠিয়ে ওদের সন্দেহভাজন ক'রে তুলবেন না।

আমি হেসে বল্‌লাম, আচ্ছা। কিন্তু বর্মায় ব'সে তিনটে বাঙালী ছেলেয় দলাদলি পাকিয়ে কোন্ বিপ্লব করবে, মহারাজ?

জিতেনকে লিখলাম, তোমরা এবং নির্মলরাই একযোগে কাজ ক'রে যাও। ওঁদের বাদ দেও। বর্মীদের সঙ্গে মিশতেই বিশেষ ক'রে চেষ্টা কর।

সেটা লেখা বাহুল্য। নির্মল এবং জিতেন সে-চেষ্টা আগে থেকেই করছিলেন।

(৩)

ক্রমে বাংলার সঙ্গে লোক মারফৎ চিঠিপত্রের যোগাযোগ হ'ল। দু'একজন ক'রে কর্মীও বর্মায় যেতে লাগলেন এবং এখানে ওখানে

কাজ করতে সুরু করলেন। পরে '৩১ সালের বর্মাবিদ্রোহের সময় যখন জিতেন ও তাঁর সহকর্মীরা অন্তরীণাবদ্ধ হন, এঁদের ভিতর সেনহাটির (খুলনা) রবি রায় দশ বৎসরের জন্য দ্বীপান্তরিত হন।

রসিকের কাছ থেকে চিঠির জবাব পেলাম: অবস্থা নৈরাশ্যজনক। আমি যাঁদের কথা লিখেছি, তাঁদের অনেকে ভয় পেয়েছেন, অনেকে কাজের উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছেন। তারই ভিতর দু'টি জায়গা থেকে আশাতীত সাড়া পেয়েছেন। প্রথম, শৈলেশ্বর বোস। ১৯১৫ সালে বালেশ্বরে যতীনদার আশ্রয়সৃষ্টির ও অস্ত্র আমদানির কাজে শৈলেশ্বর বাবুই প্রথম ওখানে "ইউনিভার্সাল এম্পোরিয়াম" ব'লে দোকান খোলেন। পুলিশ যখন যতীনদার সন্ধান পায় তখন শৈলেশ্বর বাবু ধরা প'ড়ে জেলে যান এবং কিছুদিন পরে ক্ষয় রোগে আক্রান্ত হন। পর পর আরও দুটি ভাই, শ্যাম ও কানাই-ও ধরা পড়েন এবং ঐ রোগেই তাঁদের মৃত্যু হয়। এখন মৃত্যু শয্যায় শুয়ে শৈলেশ্বর বাবু দীপ জ্বালিয়ে রাখছেন। অম্বুজা ও রসিকের সাহায্যে বিভিন্ন জেলায় গ্রামে গ্রামে দল গড়ছেন।

দ্বিতীয়, টগর (ডাঃ অমিয় বোস) ও জিম (ডাঃ বীরেশ গুহ)। এঁরা ছেলে বয়স থেকে আমাদের পরিচিত। কিন্তু কাজে যে এতটা উৎসাহ দেখাবেন, আগে তা কেউ মনে করে নাই। এখন এঁরা কয়েকটি বন্ধুতে মিলে কলকাতায় একটি ভাল দল গ'ড়ে তুলেছেন। মফঃস্বলেরও অনেক জেলার কর্মী এঁদের সঙ্গে জুটেছেন। এই চক্রের সঙ্গে যোগাযোগেই শরত বাবু "পথের দাবী" লেখেন। এঁদের বন্ধু উমাপ্রসাদ মুখার্জি তখন "বঙ্গবাণী" ব'লে মাসিক পত্রিকাখানি দেখাশুনা করেন। সেই পত্রিকাতেই "পথের দাবী" প্রথম বের হয়। রাসবিহারী বাবু ও যাদুদার কাহিনীর টুক্‌রো টাক্‌রা সব্যসাচি চরিত্রের উপাদান।

বাইরের সঙ্গে পত্রালাপের ও কাজকর্মের সঙ্গে একটু সম্পর্ক রাখবার এই সুযোগ পেয়ে ইনসিনে সর্বব্যাপী বিষাদের চাপ থেকে একটু মুক্তি পাই। জেল এবং পুলিশ কর্তৃপক্ষ কিন্তু আমাদের ভুলে যায় নাই। আমাদের সেই মেমোরিয়াল সম্পর্কে জেলের তরফ থেকে তদন্তের কথা আগে বলেছি। পুলিশের আনাগোনাও চলছিল।

মেমোরিয়াল প্রকাশ নিয়ে বর্মার জেল কর্তৃপক্ষ ভারত গবর্ণমেণ্টের বিরাগভাজন হয়েছে। কয়েকজন উচ্চপদস্থ জেল কর্মচারী বিপন্ন হয়েছেন। তথাপি মেজর তারাপোর এবং মেজর ফিণ্ড্লে আমাদের সুখসুবিধার জন্য সাধ্যমতো চেষ্টা করেন। নালিশ আমাদের নানামুখী —মনের কথা, ম্যাণ্ডালে যেতে চাই। ইন্‌সিনে আমাদের বাঙালীর পক্ষে তেমন কিছু গরম নয়। তবু গরমের জন্যে নালিশ করতে ছাড়িনে। মেজর ফিণ্ড্লে আমতলায় এক টালির ঘর তৈরী করিয়ে দিলেন—দিনের বেলায় সেখানে ব'সে পড়াশুনো করব। টালির উপর খড়ের ছাউনি। আমগাছে টীনের কানিস্তারা বেঁধে দেওয়া হ'ল, তা' থেকে জল প'ড়ে খড় ভিজিয়ে ঘর ঠাণ্ডা রাখবে।

ওখানে বসি শুধু যেন জেল ও পুলিশ অফিসাররা ঘরে না ঢোকে, ওখানে ব'সেই কথাবার্তা ব'লে চ'লে যায়। আই. বি.র ডেপুটী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট যোগেন ভট্টাচার্য মাঝে মাঝে আসে। আমাদের মেমোরিয়াল ছাপার অক্ষরে প্রথম ওর কাজেই দেখি।

হঠাৎ একদিন বলে, এখানে আর রেঙ্গুনে একদল বাঙলী ছেলে জুটেছে। তাদের গতিবিধি ভাল মনে হচ্ছে না। বলে, আর আমার মুখের দিকে তাকায়। জিতেন ও নির্মলকে সাবধান ক'রে দিই— তোমাদের উপর নজর পড়েছে।

তা সত্ত্বেও ওঁরা পরে বর্মা থেকে কিছু অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ ক'রে বাংলায় পাঠাতে পেরেছিলেন।

ম্যাণ্ডালের সঙ্গে যোগাযোগ তখনও খুব ছিল না। তবু, মনের যোগ তো ছিলই। প্রথমটা ত্রৈলোক্য বাবু যখন আসেন, সুভাষ ব'লে দিয়েছিলেন, দু'টাকা ক'রে দৈনিক খাবার খরচ যেন মেনে না নিই। সুভাষকে এক সংকোচে ফেলেই এই ব্যাপারে ঝগড়ায় উন্মুখ ক'রে তুলেছিল। যখন আর সবার দৈনিক ভাতা দুই টাকা, সুভাষের জন্য বরাদ্দ করেছিল ছয় টাকা দশ আনা।

তিনি এটা নিতে অস্বীকার করতে চান। বন্ধুরা বলেন, কেন অস্বীকার করবেন? খাওয়া তো আপনার জন্য আলাদা কিছু হচ্ছে না। বরং আসুন, আমাদেরও ভাতা বাড়াতে চেষ্টা করি। ওঁরা দৈনিক সাড়ে তিন টাকা চার টাকার মতো জন প্রতি খরচ করতে সুরু করলেন।

ত্রৈলোক্য বাবু এসে বলাতে আমরাও খরচ বাড়িয়ে দিলাম। ম্যাণ্ডালেতে সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সেই ক্যাপ্টেন স্মিথ। তিনি বেশী মাথা ঘামাবার জায়গাতেই বেশী ক'রে হাসতেন। আর, এখানে জেলার ফস্টার এবং ডেপুটী সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সাদার্ল্যাণ্ড। তারা কয়েক দিনের ভিতরই চাপাচাপি সুরু করলো। ত্রৈলোক্য বাবু বলেন, আসুন হাঙ্গার ষ্ট্রাইক করি। আমি বলি, ওটা ইদানীং বেজায় শস্তা হয়ে গেছে, দু'টাকার উপর ভাতা পাবার জন্যে হাঙ্গার ষ্ট্রাইক করছি, দেশের লোকের কানে সেটা ভাল শুনাবে না, আপাততঃ অন্যপথ ধরতে হবে।

মেজর ফিণ্ড্‌লেকে জানিয়ে দিলাম, যা চাই তা যদি না দিতে পার তো কয়েদির খানা পাঠিয়ো।

পর দিন খাদ্য যেমন আসবার এল। তা থেকে চাল, ডাল, তরকারী রেখে মাছ, দুধ, চা, চিনি সব ফেরত দিয়ে দিলাম। চা তখনও প্রয়োজনের অন্তর্গত হয়ে ওঠেনি।

দেড় দিন এইভাবে চললো। আই. জি. সুপারিন্টেণ্ডেণ্টকে ব'লে পাঠালেন, বর্মা সরকার দৈনিক তিন টাকা ভাতা করবার জন্য ভারত গবর্ণমেণ্টকে লিখেছে। মঞ্জুর হয়ে না আসা পর্যন্ত দুই টাকাই চলবে। আপাততঃ তুমি কয়লা, কাঠ জেলের গুদাম থেকে এবং তরকারী জেলের বাগান থেকে দাও, দাম কেটো না, আর অন্য প্রয়োজনের যতোটা medical ground-এ দিতে পার দাও। সর্ববিধ ফল, ডিম, মুরগী, কই মাগুর মাছ, মাখন, সোডালেমনেড, বিস্কুট, এমন কি, জ্যাম জেলী পর্যন্ত medical ground-এ আসতে লাগ্‌লো।

কিছুদিনের ভিতর দৈনিক তিন টাকা ভাতা হয়ে গেল। কিন্তু সরকারী প্রথানুযায়ী "আপাততঃ"-গুলোও রয়ে গেল, ঘরের বেলাতেও যেমন সেল ও দোতলার হল দুই-ই ভোগ করছিলাম।"

আর এক দিক দিয়ে ঝগড়া পাকিয়ে উঠলো। আগেকার দিনে আমাদের দেশের যে প্রকৃতির লোক নিয়ে ইংরেজের সব কারবার চালাতে হ'ত, ওদের ঔদ্ধত্যই বোধ হয় এদের বশ মানাতো বেশী ক'রে। এবং এরাই বোধ হয় নতুন ইংরেজ এদেশে এলে তাদের অভদ্রতা শেখাত।

ইংরেজের "মিঃ" এবং আমাদের "শ্রীযুতে"র মতো নামের আগে বর্মায় তিন রকমের শব্দ ব্যবহার হয়। সাধারণ ভাবের শব্দটা "মং", শ্রদ্ধেয় ব্যক্তির নামের আগে লিখতে হয় "উ", আর যার প্রতি নিতান্তই একটা তাচ্ছিল্যের ভাব প্রকাশ করতে হবে—যেমন চাকর বাকর

শ্রেণীর লোক—তাদের নামের আগে "এঙ্গা"। Sir George Scottএর "Burma"ই কি, আর বর্মার Gagetteer গুলোই কি, পড়তে গিয়ে দেখি, বর্মার রাজবংশীয় বা নেতৃস্থানীয় যাঁরা দেশের স্বাধীনতার জন্য ইংরেজের সঙ্গে লড়েছেন, তাঁদের প্রত্যেকের নামের আগে "এঙ্গা" শব্দটা ব্যবহার করেছে।

সত্য কথা বলতে কি, বর্মার জেলে থেকে কয়েদী শ্রেণীর এবং দু'একজন জেলার বর্মীকে দেখেও আমি এই স্বভাব-উদার জাতটাকে ভালোবেসে ফেলেছিলাম। এবং এদের এই নেতৃস্থানীয় লোকদের সম্পর্কে এই ধরণের উল্লেখ আমার মনে জ্বালা ধরিয়ে দিত।

এই থেকেই প্রথম লক্ষ্য করলাম, আই. বি. আমাদের এক একখানা চিঠি আটক ক'রে সুপারিন্টেণ্ডেন্টের মারফত খবর দিয়ে যে চিঠি লিখতো, তা'তে না আমাদের নামের আগে, না আমাদের আত্মীয় স্বজনের নামের আগে "মিঃ" বা "বাবু" বা "শ্রীযুত" জাতীয় কোনো শব্দ ব্যবহার করতো। এ নিয়ে প্রতিবাদ ক'রে বার বার লিখলাম, কোনো জবাব পেলাম না। তখন চিঠিতে গালাগাল সুরু করলাম।

চাঁদপুরের নগেন রায়ের কথা আগে বলেছি। ম্যাণ্ডালেতে তিনি আমাদের সাহায্য করতেন। তাঁকে পেয়ে সুভাষচন্দ্রের সুযোগ জুটে গিয়েছিল। এক একখানা চিঠি আটক করলেও তিনি সে খবর কাগজে বের ক'রে দিতেন। আমরা গোপনে Forward আনাতাম, তা'তে সে সব পড়তাম। একবার দেখি বেরিয়েছে D. I. G. I. B.র Personal Assistant. C. Weale-এর চিঠি। অভ্যাসানুযায়ী লিখেছে :

A letter dated ·····from State prisoner, Subhas C. Bose to N. C. Kelkar has been withheld.

The prisoner may be informed accordingly.

স্বভাবই যেন তোদের জেলে পড়েছেন যদিও বিনা বিচারে। কিন্তু শ্রীযুত কেলকার তখনকার দিনের একজন সর্বমান্য নেতা। তাঁর বেলাতেও একটুখানি ভদ্রতারক্ষার প্রয়োজন বোধ নেই।

এর পরই বাবার নামে লেখা আমার একখানা চিঠি আটক ক'রে ঐ রকম অভদ্রভাবেই সে খবর আমায় জানালো। আমি D. I. G.কে লিখলাম:

Your Personal Assistant, C. Weale informs me that a letter from me to my father has been withheld. But neither before my father's name nor mine does he use any courtesy prefix·········Weale is a public servant and ought to know manners.

The servant may be informed accordingly.

ইতিমধ্যে ফস্টার রেঙ্গুন চ'লে গেছে। তার জায়গায় জেলার হয়ে এসেছেন ম্যাণ্ডালের সেই রিচার্ডস। তিনি একদিন হাসতে হাসতে এসে বলেন, **What does your friend, Weale say ?** হাতে একখানা কাগজ। তাতে লেখা আছে, বারম্বার **offensive** ভাষা ব্যবহার করার দরুণ নিম্নলিখিত দুই ব্যক্তিকে সাজা দেওয়া হ'ল:

১। ইনসিন জেলের—ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত

২। ঢাকা জেলের—অরুণচন্দ্র গুহ

এরা তিন মাস চিঠি পাবে না এবং চিঠি লিখতে পারবে না।

বুঝলাম, ঢাকা থেকে অরুণ দা'ও এই যুদ্ধ চালিয়েছেন।

সাজা আমাদের হয়ে গেল। কিন্তু সাথে সাথে ফর্ম ছাপা হয়ে গেল, তাতে "মিঃ" সুদ্ধ ছাপা হয়ে রইলো, নামের ঘরটা ফাঁকা রইলো। এরপর থেকে ব্রিটিশ রাজত্বের শেষ পর্যন্ত বিনা বিচারের বন্দীদের জন্য এই প্রথাই কায়েম ছিল।

ইনসিনে পরিবর্তন সুরু হল। ত্রৈলোক্যবাবু আমায় সঙ্গ দিতেই এসেছিলেন, আট মাস বাদে তিনি ম্যাণ্ডালে ফিরে গেলেন। তাঁর জায়গায় এলেন হরিদা—১৯১৪-১৫ সালের "হ্যারি এণ্ড সন্সে"র হরিকুমার চক্রবর্তী।

জ্যোতিষবাবুও ম্যাণ্ডালেতে অনেক লোকের ভিতর অশোয়াস্তি বোধ করতে লাগলেন। গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে লেখালিখি ক'রে তিনিও ইন্‌সিনে বদলি হলেন।

কিন্তু হরিদা এলেন হৃদরোগ নিয়ে। আর জ্যোতিষবাবু তো বরাবরই অসুস্থ, অথর্ব—প্রায় সব সময় শুয়েই কাটান। খেলাধূলোর সঙ্গী এঁরা হলেন না।

কথায় কথায় বকাবকি, পান থেকে চুণ খসলে সাদার্ল্যাণ্ডকে ডেকে এনে ধমকধামক, সে প্রায় দূরে দূরেই থাকে। ফলে, জেলখানার কড়াকড়ি এখন অনেকটা কমেছে। তারই সুযোগ নিয়ে অল্প বয়স্ক তিনটি জেলার, মং নীও, স্যাণ্ডহার্ষ্ট এবং নোয়াখালির কাজি আবদার রহমান প্রায়ই এসে জুটতেন। এক সঙ্গে ব্যাড্‌মিণ্টন খেলতাম। এঁরা কেউ কোনো দিন না আসতে পারলে হরিদা র‍্যাকেট নিয়ে দাঁড়াতেন।

কিন্তু তাঁর কাজ ছিল এঁদের খাওয়ান। যেমন রাঁধতে পারতেন, তেমনি লোককে খাইয়ে সুখ পেতেন। খেলা-ধূলোর পর এঁরা পরোটা, মুরগীর মাংস, কোনো দিন বা হরিদা অন্য যা কিছু তৈরী করতেন, তা-ই খেয়ে যেতেন। আর ঐ পরিশ্রমে হরিদার ব্যাধির আক্রমণটা সন্ধ্যার

পর মাঝে মাঝে এমন হ'ত যে তাঁকে ইজিচেয়ারে শুইয়ে কয়েদি দিয়ে বয়ে নিয়ে যেতে হ'ত শোবার ঘরে। বারণ ক'রেও হরিদাকে রান্নাঘরে যাওয়া থেকে নিরস্ত করা যেত না। নিজের উপর দুঃখ টেনে এনেও জেলের জীবনে মানুষকে বৈচিত্র্যের খোঁজ করতে হয়।

এই ছেলেমানুষ জেলার তিনটির সাথে এমন বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছিল যে, বিপদ জেনেও এঁরা যখন তখন না এসে থাকতে পারতেন না। একদিন সকাল বেলায় সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আসার সময় স্যাণ্ডহার্স্ট এসে উপস্থিত। আমি তাঁকে চ'লে যেতে বারবার বললাম, কিন্তু মরিয়া হয়েই যেন ব'সে রইলেন। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট দেখে গেলেন। সেই থেকে ওঁদের আসা বন্ধ হয়ে গেল এবং স্যাণ্ডহার্স্টকে চাকরী ছাড়তে হ'ল।

মং নীও ছিলেন অত্যন্ত ছেলেমানুষ, অত্যন্ত খেয়ালী, কিন্তু খুবই ভদ্র, উদার প্রকৃতির। এঁর বাবাও ছিলেন জেলার, তারাপোরের খুব প্রিয়, কিন্তু সাদার্ল্যাণ্ডের প্রতিদ্বন্দ্বী। এঁর অল্প বয়সে বাবা মারা যাবার পর মেঃ তারাপোরই এঁকে ডেকে চাকরী দিয়েছেন। তিনি জানতেন, এক মাসীর এবং এক বোনের পরিবার নিয়ে চৌদ্দটি লোক মং নীওর মুখাপেক্ষী।

অপর দিকে সাদার্ল্যাণ্ড এইবারে সুযোগ পেয়ে বাপের উপর যে রাগ, তারই ঝাল ঝাড়ছে এঁর উপর, প্রায়ই খিটিমিটি করে। আমি ওঁকে সাবধানে চলতে বলি, কিন্তু বুদ্ধিমান হয়েও আপন খেয়ালেই চলেন। এক সুযোগ পেয়ে মেঃ ফিণ্ড্‌লেকে দিয়ে সাদার্ল্যাণ্ড ওঁকে সাসপেণ্ড্ করালো।

স্যাণ্ড্‌হার্স্ট ধরা পড়ার পর মং নীও আমাদের ওখানে না এলেও মাঝে মাঝে গোপনে চিঠি লিখে খবর নিতেন, এটা ওটা চেয়েও পাঠাতেন। এখন সে সব বন্ধ, জেলের ভিতর ঢোকা নিষেধ।

ওঁর খবর নেবার জন্য মনটা ছট্‌ফট্‌ করতো। একদিন একটা ছুতো ক'রে গফুরকে ওঁর কাছে পাঠালাম। গফুর ফিরে এসে আর যেন কথা বলতে পারে না। কথা বলবার আগে ওর দাড়ি বেয়ে চোখের জল পড়তে লাগলো: বাবু, ওখানে আর আমায় পাঠাবেন না। সে চোখে দেখা যায় না।

না খেয়ে খেয়ে ছেলেপিলে মেয়ে পুরুষ সবগুলো অস্থিচর্মসার হয়েছে। ঘরে একখানি জিনিষ নেই। মেয়েদের পরবার লুঙ্গিগুলো পর্যন্ত হয় বিক্রী করেছেন, না হয় বন্ধক দিয়েছেন। চাটাইয়ের উপর চারপাঁচটি মেয়ে পাশাপাশি শুয়ে একখানা বিছানার চাদরে লজ্জা ঢাকছেন।

মনে পড়লো, এমনি দৃশ্য দেখেছিলাম্ ১৯১৫ সালে ব্রাহ্মণবেড়ের বন্যাপীড়িতদের সেবায় গিয়ে। এক মুসলমানের বাড়ীতে সাহায্য দিতে গেছি—বাইরে থেকে ডেকে সাড়া পাইনে, আর যেমন ঘরে ঢুকতে গেছি, বাড়ীর কর্তা ধম্‌কে উঠেছেন।…

"গফুর, তুমি একটা কাজ করতে পারবে?"

"যা বলেন করব।"

"এক বস্তা চাল, কয়েক সের ডাল, আলু, ঘি ওঁদের দিয়ে দেবে। মাঝে মাঝে খবর নেবে, যখন যা প্রয়োজন দেবে।"

"দেব।"

বাজারের জিনিষের ফর্দ এবং খরচ আমিই লিখতাম। Forward আনবার জন্য এবং ঐ ধরণের অন্য কাজের জন্য গফুরকে মাসে বিশত্রিশ টাকার মতো দিতাম। যে মাসদুই মং নীওকে খাবার ইত্যাদি দিতে হ'ল, সে সময়ের মধ্যে গফুর আর আমার কাছ থেকে কিছু নিতে চাইত না। আমি তবু দু'পাঁচ টাকা দিতাম। এদিকে ম্যাণ্ডালে

থেকে সুভাষ ওঁদের পরামর্শে medical ground ইত্যাদি বাবদ নানা জিনিষ পেয়েও খরচের সীমা না মেনেই চলছিলাম। তবু নিজেদের খাওয়া মামুলির উপরে যায় না।

মেঃ তারাপোর মং নীওর case নিয়ে অনুসন্ধান ক'রে সব বুঝলেন। মং নীওকে থারাওয়াডির নতুন সেন্ট্রাল জেলে বদ্‌লি করলেন। আর কিছুর জন্য না হোক, উ পীন নিয়া জ্যাটা আর মং নীওকে দেখবার জন্যও মুক্তি পেয়ে একবার বর্মায় যাবার ইচ্ছা ছিল। তা আর হয়ে ওঠে নাই।

প্রথম প্রথম হরিদার শরীর যতদিন একটু ভাল ছিল, ইন্‌সিনের বিশাল জেলের ভিতর দেয়ালের পাশ দিয়ে জেল ঘিরে যে বাগান, সকাল বিকাল সেখানে তাঁর সঙ্গে বেড়াতাম। ম্যাণ্ডলেতে হরিদা, মধুদা (সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ) ও অমর (অমরকৃষ্ণ ঘোষ) ছিলেন সুভাষের পড়াশুনার সঙ্গী। এর ভিতর মধুদার বিশেষ অনুরাগ ছিল বাংলার কৃষ্টিসভ্যতা নিয়ে পড়াশুনোর দিকে। আর হরিদার ঝোঁক ছিল মনস্তত্ত্বের দিকে, বিশেষতঃ ফ্রয়েডের গবেষণার দিকে। এখন হরিদাকে কাছে পেয়ে আমার পক্ষে পড়াশুনোর এই একটা নতুন দিক খুলে গেল।

এ পড়া বিদ্যার প্রয়োজনে নয়, জীবনের প্রয়োজনে—যে প্রয়োজনে ছেলে বয়সে পড়তাম গীতা, উপনিষদ।

পরিবারের কাছ থেকে, মায়ের কাছ থেকে আপন মনে চোখের জলে বিদায় নিয়েছি দশ বছর আগে। সে পরিবার আমার ভিতর বাসা বাঁধবার জন্য ফিরে ফিরে দেখা দেয়নি, তা নয়। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়েছে আমারই সহকর্মী সুরেন কুশারী, কুন্তল, চারু, আরও কারও কারও কথা—পরিবারের প্রতি, মা বাবা, ভাইবোনের প্রতি আসক্তি

এঁদেরও তো কম ছিল না। তাঁরা যখন সে আনন্দে জীবনে বঞ্চিত থেকেই বিদায় নিয়েছেন, আমার কি অধিকার আছে সেই আনন্দ ভোগ করবার, বা সেই কামনা পোষণ করবার?

জীবনে অবিবাহিত থাকবার সংকল্পে মনে কোনো দীনতা কখনও দেখিনি। কিন্তু বন্ধুদের কারও কারও কাছে শুনেছি, কখন কি ভাবে কার বিয়ে করবার ইচ্ছা জেগেছে। শুনে সাবধান হ'তে চেষ্টা করেছি। এই চেষ্টায় নিজের মনে জেনেছি, ও চেষ্টার পথ শুষ্কতার পথ নয়, স্নিগ্ধতার পথ।

ছেলে বয়সে ব্রহ্মচর্যের কোনো বইতে পড়েছিলাম, পরনারীর মুখের দিকে তাকাবে না, হঠাৎ চোখে পড়ে গেলে সূর্যের পানে তাকাবে। বাল্যবন্ধু সলিল বলেছিলেন, মায়ের মুখ কল্পনায় আনবে। একটু বেশী বয়সে মনে মনে বুঝেছিলাম, এই সূর্যের পানে তাকাবার বুদ্ধি শুষ্কতার সাধনা। মায়ের মুখ মনে করা মানে চঞ্চলতার জায়গায় একটা স্নিগ্ধতায় মনটাকে ভ'রে ফেলা।

কয়েক বছর আগে ব্রহ্মচর্যের বইয়ের নামকরা এক লেখকের সাথে পরিচয় হয়েছিল। মুখখানা দেখে দু'চারটে কথা শুনে মনে হয়েছিল, বিশ্বের যাবতীয় মানুষের প্রতি যেন ইনি নিরন্তর ক্রুদ্ধ হয়েই রয়েছেন। ১৯২২ সালে বরিশাল শংকরমঠে অশ্বিনীকুমার দত্তের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। সদাপ্রফুল্ল এঁর মুখখানা দেখে মনে হয়েছিল, ব্রহ্মচর্য এঁর পক্ষে প্রেমের সাধনা। আজ ফ্রয়েড প'ড়ে বুঝলাম, একজন ধরেছেন নিজেকে চেপে বিকৃত করার পথ, suppression-এর পথ, আর একজন ধরেছেন নিজেকে বিস্তৃত করবার পথ, sublimation-এর পথ।

ইংরেজি, বাংলা সাময়িক পত্রে ফ্রয়েডের নিন্দা অনেক পড়ি। কিন্তু বৃহদারণ্যকেও তো পড়েছি, "সর্বেষামানন্দানাম উপস্থ একায়নম"—

সর্ববিধ আনন্দের একায়ণ বা মূল উৎস উপস্থ, সমস্ত স্পর্শের যেমন ত্বক্, সমস্ত দর্শনের যেমন চক্ষু, সমস্ত বেদের যেমন বাক্…ইত্যাদি। এটুকু মেনে নেবার পর, ফ্রয়েড সম্পর্কে আপত্তি যা যা, তার মূলে সংস্কারে বাঁধা মন। হয়তো উপনিষদকার আর ফ্রয়েড একই সত্যে পৌঁছেছেন দুই বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে। তা'তে কিছু যায় আসে না। •

ইন্‌সিনে একটা বানরী পুষেছিলাম। সঙ্গমের প্রয়োজন এর যে-ঋতুতে উপস্থিত হ'ত, দেখতাম কি কষ্ট এর—মুখ, পুচ্ছদেশ—সব রক্তবর্ণ হয়ে উঠতো, মেজাজ অত্যন্ত বিগড়ে যেত, যাকে তাকে কামড়াতো। তখন অনেক সময় আমাকেই মারতে হ'ত ওকে। কিন্তু যে-ই মারুক ও আমারই বুকের মধ্যে এসে লুকোত। দেখতাম, ওর বুকটা কেমন ধড়ফড় করছে। ওর দুঃখ আমার নয়। কিন্তু দুঃখ তো দুঃখই। বুঝলাম, কি অবস্থায় অত শতাব্দী আগে কবি লিখেছিলেন—

মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ
যৎক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্।

ফ্রয়েড পড়ছি, আর বুঝছি, বন্ধুদের মধ্যে যাঁরা বিয়ে না ক'রে থাকার সংকল্প করেছিলেন, তাঁরা অনেকে বেশী বয়সে কেন বিয়ে করতে বাধ্য হন, অনেকে কেন বা নানাভাবে অত্যন্ত বিকৃত হয়ে ওঠেন। দু'য়েরই মূলে, মনে হয়, ঐ suppression-এর রাস্তা, শুষ্কতার সাধনা।

সাংসারিক বা পারিবারিক জীবনে যারা সুখস্বাচ্ছন্দ্যে শান্তিতে কাটায়, অথবা জীবনে যারা স্নিগ্ধতার সাধনায় সার্থক, শুষ্কতার সাধকরা আপন মনের অজ্ঞাতেও তাদের হিংসা করে। এই হিংসা তাদের চাপা লোভের রূপান্তর। এবং হিংসার কদর্যতাকে আবার সমাজের

কাছে চেপে চলতে গিয়ে ওকে প্রতিটি রক্তের কণায় ব্যাধির বীজের মতো চারিয়ে দেওয়া হয়, মানুষ অস্বাভাবিক হয়ে ওঠে।

আমাদের যুগে যাঁরা ব্রহ্মচর্যের বই প'ড়ে গ'ড়ে উঠেছিলেন, তাঁরাও অনেকে এমনি অস্বাভাবিক হয়ে ওঠেন। এই অস্বাভাবিকতা নানা-ভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে, এমন কি রাজনীতির ক্ষেত্রেও। পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্ক অনেক ক্ষেত্রে ভালবাসার না হয়ে. বিদ্বেষের হয়ে উঠেছে। এর আর একটি দিক আছে। নিজের বোনকে কাছে নিয়ে ব'সে গল্প করতে দেখলে অনেকের মন সন্দিগ্ধ, মেজাজ তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে। এই যে বিকৃত মন, সে 'বিকৃত' শব্দের ইংরেজি **perverted** নয়, **depraved.** জীবনে যার ভিতর সংযম বা আদর্শের কোনো বালাই নেই, সে যদি নারীর ভিতর মা, বোন, কন্যা, বান্ধবী না দেখে, শুধু রমণী দেখে বা খোঁজে, তার মন, আর এই মন মূলতঃ একই।

পরাশরের সঙ্গে ধীবর কন্যার যে সম্পর্ক হ'ল, তাতে পরাশরেরও এমন কিছু সর্বনাশ হয়ে গেল না, আর, সমাজের যে লাভ হ'ল তার তুলনা কোথায়?

কিন্তু পরাশর মেয়েটিকে আপন কন্যার মতো বা বোনের মতোও তো দেখতে পারতেন। এর ভিতরও, যদি খুঁজবার সুযোগ পাওয়া যেত, তা' হলে হয়তো ধরা পড়তো ঐ নিজেকে চেপে চলবার ইতিহাস।

ভাবাবেগ বা সেন্টিমেণ্টালিটির নিন্দা গায় একটু স্থূল প্রকৃতির লোকে—সন্তানোৎপাদন বা অর্থোপার্জন ক'রেই যারা সংসারের কর্তব্য সমাধা করে। ভাবাবেগকে সংযত, সংহত করা মানে তাকে নিত্য পুষ্ট করা, ক্রমান্বয়ে প্রসারিত করা।

মানুষের কৃষ্টি এখানে বাল্মিকী-যুগ থেকে নিম্নতম স্তরে নামছে— হয়তো বিবর্তনের অমোঘ বিধানে। "জগৎ প্লাবিয়া বেড়াব গাহিয়া" আর এক নবজীবন-নির্ঝরের প্রথম কুলু কুলু গান কিনা কে জানে? কবে কেমন ক'রে এ "পাষাণ-কায়া" ভাঙ্‌বে জানিনা। তবে ভাঙ্‌বেই একদিন।

ইন্‌সিনের বাগানে অনেক সকাল সন্ধ্যায় একলাই বেড়াই, আর এই স্বপ্ন দেখি।

অনুশীলনের ভিতর প্রথম জীবনে গ'ড়ে উঠেছি। সেখানে মানুষ গড়বার যে পন্থা দেখেছি, তাতে পরে মনে হয়েছে, জীবনে একটা আদর্শ ধরবার বয়স যখন আসে তখন ব্রহ্মচর্যের বই পড়িয়ে একটি নেতিমূলক নীতি ধরিয়ে শত্রুভাবের সাধনায় মানুষকে জর্জর ক'রে তোলার পথ দেখান হয়েছে।

নিজের মনেই ভেবে ভেবে মনে হয়েছিল, কোনো শিক্ষিত মনের কাছে নিজের স্ত্রীর সঙ্গেও যৌন সম্পর্কটা অনিবার্য যতোই হোক অনেক ক্ষেত্রে আকস্মিক এবং লজ্জার। হরিদাকে জিজ্ঞেস ক'রেও আমার এই মতের সমর্থন পেলাম।

আর একটা জিনিষও বুঝলাম, জীবনের সব সাধনার মতোই স্নিগ্ধতার সাধনাও একটা জীবনব্যাপী নিরবচ্ছিন্ন জিনিষ। কোনো এক জায়গায় বা এক বয়সে ওটাকে থেমে যেতে দেওয়া মানেই শুষ্কতার জন্যে জানালা খুলে দেওয়া, বিকৃতিকে ডেকে আনা।

বিবাহিত জীবনের জন্যেও একটা সাধনার প্রয়োজন আছে। অবিবাহিত জীবনের জন্যেও সেটা কোনো একটা বয়সের বা মুহূর্তের কল্পনা বা সংকল্প মাত্রই নয়। তার জন্যও নিরন্তর সাধনার প্রয়োজন আছে। সেটাও যোগের সাধনা, বিয়োগের নয়।

এই সাধনায় সুখ বা আনন্দ পাবার আশা-আকাংক্ষার স্থান নেই। সুখ চাওয়া ও পাওয়ার কোন সংগতি নেই। চাওয়া যত বাড়ে, পাওয়া ততো কমে। সুখ বা আনন্দ দেবার চেষ্টা ক'রে আনন্দ পাওয়া এ সাধনার গোড়ার কথা।

অপর পক্ষে, জীবনের এই দিকে, চাওয়াই পাওয়ার প্রাণ—তার অতিরিক্তও অনেকখানি।

সব সাধনাই উজানমুখী নৌকা, দাঁড় টানা বন্ধ হয়েছে তো পিছিয়ে চললো।

এই হিসাবে দেখলাম, শত আঘাত ব্যথা স্বত্বেও বন্ধুত্বের দিক দিয়ে আমি ভাগ্যবান। সংসারে মা, ভাই, বোন—যতো রকম সম্পর্কের আনন্দ পওয়া যায়, বন্ধুর কাছ থেকেও তা পাওয়া অসম্ভব নয়। নববিবাহিত দম্পতীর জীবনের আবেগ, চঞ্চলতা আর অধীরতা নিজেকে নিঃশেষে মুছে ফেলার সুখ—কোনটারই সেখানে অভাব না হ'তে পারে। রাজনৈতিক জীবনের প্রায় প্রথম দিক থেকেই—বিশেষতঃ দৌলৎপুরের জীবনে, পলাতক জীবনে—নিজেদের সংঘের ভিতরই যেন একটা পারিবারিক জীবন খুঁজে পেয়েছিলাম। তার সার্থকতায় আজ মনে একটা তৃপ্তি বয়ে নিয়ে এল।

কিছুদিন আগে কুন্তলকে আর চারুকে হারিয়েছি। জীবনকে ছেড়ে রেখে আসতে হ'ল ম্যাণ্ডালেতে। ইন্‌সিনের প্রথম নিঃসঙ্গ জীবনে রবীন্দ্রনাথের কথাটা মনে জাগতো—"এখন থেকে জীবন আমার ডাঙ্গার পথ বেয়ে।"

নিজেকে একান্তভাবে ছেড়ে দেবার, ডুবিয়ে দেবার কামনা বয়ে চলি। এবং কামনারও সার্থকতা, ক্রম বিস্তৃতির উন্মুখতা অন্তরের প্রান্ত থেকে প্রান্ত পর্বন্ত যেন অকূল সমুদ্রের মতো উথলে ওঠে।

এই জোয়ারের জলে সাহিত্য কবিতা গান আমার পক্ষে যেন পূর্ণিমার চাঁদ।

ক্রয়েড পড়বার সঙ্গে সঙ্গে পড়ি লথ্রপ স্টডার্ড, পুটনাম উইল, কাউন্ট গবিনো—পরবর্তী যুগে হিটলার যে নর্ডিক জাতির শ্রেষ্ঠত্বের তত্ত্ব নিয়ে এত কাণ্ড করলো, তার পরিচয় পাই। হরিদার সঙ্গে বেড়াতে বেঁড়াতে এ নিয়েও আলোচনা চলে।

কিন্তু হরিদার বেড়ানো আর বেশী দিন চললো না। তাঁর রোগ ক্রমে বেড়ে উঠলো। ওদিকে বাড়ীতে তাঁর স্ত্রীও তখন অন্তিম শয্যায়। আই. বি.র কৃপায় কদাচিৎ কখনও এক একখানা চিঠি পান: ধীরে ধীরে নিভে যাচ্ছেন। তিনি স্বামীকে একবার শেষ দেখা দেখবার জন্য দরখাস্ত দেন। জবাবের নকল হরিদার কাছে যায়: তাঁর স্বাস্থ্যের উন্নতি হচ্ছে।

হরিদার প্রশান্ত হাসিটি কিন্তু ম্লান হয় না। নিস্তব্ধ নিশীথে ধীর শান্ত গানের শব্দে ঘুম ভেঙে যায়—ব্যথার গভীরতা ভাষা পায় শুধু সেই গানের করুণ সুরে।

যুবক বাঙালী জেলার কাজি আবদার রহমানের কথা আগে বলেছি। ইনি মাঝে মাঝে আমার কিছু কাজ ক'রে দিতেন। জিতেনেরা তখনও বাংলার সঙ্গে লোক পাঠিয়ে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারেন নাই। এমন সময় জিতেন একদিন আমায় একটি খবর পাঠালেন:

এম. এন. রায় ১৯২২ সালে বার্লিন থেকে যাঁকে প্রথম বাংলায় পাঠিয়ে তাঁর পুরোণো দলের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে চেষ্টা করেন, ধরুন তার নাম রমণী। রমণী কলকাতায় এসে প্রথম ডাঃ মেঘনাদ সাহার, পরে ডাঃ টি. এন. রায়ের আশ্রয়ে থাকে। যাদুদা,

অতুলদা প্রভৃতি যাঁরা তাকে জানতেন, তাঁরা তার সঙ্গে দেখা করেন নাই। সাতুদার (সাতকড়ি ব্যানার্জি) কথায় পরে আমি দেখা করি যাদুদার অনুমোদন নিয়ে। ভালো লাগে নাই। লোকটি বোম্বেতে ডাঙ্গে, যোগলেকর প্রভৃতির সঙ্গে এবং কলকাতায় মজফর আহমেদ, কাজি নজরুল ইসলাম প্রভৃতির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন ক'রে সেবারের মতো ফিরে যায়। এই উপলক্ষ্যে এঁদের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। রমণী ফিরে যাবার পর থেকে ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় এম. এন. রায়ের কাগজ "ভ্যানগার্ড", পরে "অ্যাডভান্সগার্ড" এবং নানাবিধ পুস্তিকা আসতে থাকে। পরে রমণী আর একবার এসে ধরা পড়ে। ছাড়া পেয়ে বর্মায় গিয়ে জিতেনদের কাছে বোমা তৈরীতে নিজেকে বিশেষজ্ঞ ব'লে পরিচয় দিয়ে দল করতে সুরু করে। আমার কথা জিজ্ঞেস করায় আমার সহকর্মী ব'লে পরিচয় দেয়। জিতেন আমায় জিজ্ঞেস ক'রে পাঠান, আমি তাঁদের সাবধান ক'রে দিই। আরও খবর পেলাম, রমণী দৌলৎপুর "সত্যাশ্রমে"র সঙ্গেও পরিচিত হয়েছে। আমি যখনকার কথা বলছি, তখন আমার ধারণা ছিল, দৌলৎপুর সত্যাশ্রমে থাকতেন বরিশালের অনন্ত চক্রবর্তী। তাঁকে সাবধান করার জন্য আমি অস্থির হয়ে উঠি। কারণ, এই রমণী শ্রেণীর লোক দিয়ে বাংলার আই. বি. তখন সর্বত্র জাল ফেলছে। এর ভিতর, টুনু সেন ও মিহিরের কথা আগে বলেছি। রমণী তৃতীয় ব্যক্তি।

গান্ধীজির দক্ষিণ আফ্রিকার সহকর্মী ডাঃ পি. জে. মেটা তখন রেঙ্গুনে থাকতেন, আমি জানতাম। কাজি আবদার রহমানকে তাঁর কাছে চিঠি দিয়ে পাঠিয়ে পরিচয় করাই এবং সমস্ত বৃত্তান্ত জানাই। আমি চিঠি লিখে দিলে তিনি পাঠিয়ে দেবেন বলেন। সে চিঠি তিনি তখন পাঠাবার সুযোগ করতে পারেন নাই। পরে যখন মৌলানা

শওকৎ আলি ম্যাণ্ডালেতে সুভাষ প্রভৃতি বন্ধুর সঙ্গে এবং ইনসিনে আমাদের সঙ্গে দেখা ক'রে যান, সে চিঠি তিনি তাঁকে দিয়ে দেন। মৌলানা সাহেব সেটা মাদ্রাজ থেকে ডাকে ছাড়বার ব্যবস্থা করেন। চিঠি ধরা প'ড়ে যায়। এবং তার ফটো নিয়ে আবার জেল ও আই. বি. কর্তৃপক্ষ আমায় জ্বালাতন সুরু করে। অনন্ত প্রভৃতির সঙ্গে রমণী ইতিমধ্যেই যোগাযোগ যা করবার ক'রে ফেলে। কিন্তু সূর্যবাবু পলাতক অবস্থায় চাটগাঁ থেকে আসাম হয়ে কলকাতায় এসে দলের ভার নেন। রমণী প্রভৃতির খেলা ফুরিয়ে যায়। অনন্ত ও অন্যান্য বন্ধুরা দক্ষিণেশ্বরের মামলায় ধরা পড়েন। সে কাহিনী পরে আসবে।

ইতিমধ্যে একদিন রাত্রে রাউণ্ডে এসে কাজি আবদার রহমান আমার সঙ্গে গোপনে দেখা ক'রে বলেন একখানা চিঠি পেয়েছি, চিঠিতে টাউঞ্জুর সীল, কি লেখা ঠিক বুঝলাম না। প'ড়ে মনে হ'ল আপনার চিঠি।

চিঠি দেখে বুঝলাম সুভাষের। লিখেছেন, আগের বছর তাঁরা ম্যাণ্ডালেতে দুর্গা পূজা করেছেন। গবর্ণমেণ্ট থেকে টাকা দিতে অস্বীকার করেছে। তাই তাঁরা হাঙ্গার ষ্ট্রাইক করছেন। আমরাও যেন করি।

কাজি আবদার রহমানের নাম ওঁরা পেয়েছেন ত্রৈলোক্যবাবুর কাছে। হরিদা ও জ্যোতিষবাবুর সঙ্গে পরামর্শ করি। হাঙ্গার ষ্ট্রাইক আমরা করব সহানুভূতি জানাবার জন্য। কিন্তু খবর আমরা কি ক'রে পেলাম?

পরের দিন Forward-এ এবং তার পর দিন রেঙ্গুনের কাগজে খবর পেলাম, ওঁরা হাঙ্গার ষ্ট্রাইক সুরু করেছেন, আমরাও ষ্ট্রাইক ঘোষণা করলাম। হরিদা ও জ্যোতিষ বাবুর স্বাস্থ্যের কথা আগেই বলেছি।

তিনটে দিন কোনোমতে গেল। চতুর্থ দিনে মেঃ ফিগুলে জ্যোতিষ বাবুর স্বাস্থ্য পরীক্ষা ক'রে খাবার জন্ত ওঁকে অনুরোধ করলেন। ভেবে দেখবার সময় দিয়ে ব'লে গেলেন, বিকেলে আবার আসবেন, খেতে রাজী না হ'লে নাকে নল চালিয়ে খাওয়াবেন।

জ্যোতিষ বাবু আমায় বলেন, যে-তুধটা ওরা জোর ক'রে খাওয়াবে, তা-ই অমনি ঢক্ ঢক্ ক'রে খেয়ে নিই? আমি বলি, সে কি রকম হবে? তিনটী মাত্র লোক আমরা এখানে হাঙ্গার ষ্ট্রাইক করছি, তার ভিতর একজন ছেড়ে দিলে যে ম্যাণ্ডালের ওঁদের পর্যন্ত তুর্বল ক'রে দেওয়া হবে—সরকার ধ'রে নেবে, সবাই ধীরে ধীরে ছেড়ে দেবে। এ হাঙ্গার ষ্ট্রাইক গবর্ণমেণ্ট বেশী দিন চলতে দিতে পারে না, তু'একদিন একটু সয়ে থাকুন।

হরিদা ইজি চেয়ারে ব'সে থাকেন, মাঝে মাঝে বারান্দায় পায়চারিও করেন। জ্যোতিষবাবুর শরীর মন ক্রমেই অবসন্ন হয়ে আসছে। হরিদার সঙ্গে আলোচনা করি, এখন মানে মানে ছাড়তে পারলে বাঁচি। শুধু একটা অছিলা খুঁজছি। তা নইলে সহানুভূতির ষ্ট্রাইক, যাদের প্রতি সহানুভূতি, তাদের ষ্ট্রাইক ছেড়ে দেবার খবর না পাওয়া পর্যন্ত ছাড়া চলে না।

আমাদের হাঙ্গার ষ্ট্রাইকের খবরও কাগজে বেরিয়ে গেল। দিল্লীর অ্যাসেমব্লিতে খুব হৈ চৈ হ'ল। শরত বোস ম্যাণ্ডালের হাঙ্গার ষ্ট্রাইক নিয়ে ওলটপালট খুব করলেন।

লালা লাজপত রায় ও তুলসী গোঁসাইয়ের টেলিগ্রাম এল, গবর্ণমেণ্ট টাকা দেবে, আপনারা খেতে সুরু করুন।

এই আমাদের সুবর্ণ সুযোগ। সাত দিনেই আমরা ষ্ট্রাইক শেষ করলাম। ম্যাণ্ডালেতে ওঁরা পুজোর টাকা সম্পর্কে গবর্ণমেণ্টের অর্ডার

এলে খেতে সুরু করলেন। ওঁরা আরম্ভও করেছিলেন আমাদের আগে। ওঁদের মোট পনের দিনের মতো না খেয়ে থাকতে হয়েছিল।

ধর্মকর্মের জন্য সরকারী খরচ বরাদ্দ হ'ল জনপ্রতি বার্ষিক ত্রিশ টাকা।

এই হাঙ্গার ষ্ট্রাইকে হরিদার শরীর আর একটা চোট খেল। মনের কথা আর বলবার কি আছে? তবে হাহুতাশ ক'রে নিজের অনুভূতিকে কখনও অপমান করতেন না। বন্ধুদের মধ্যে একটা শিক্ষিত মনের শ্রেষ্ঠ পরিচয় ছিল সেদিন হরিদার ভিতর।

এইবারে ইন্‌সিনের সরকারী বেসরকারী কয়েকজন পরিদর্শকের কথা ব'লে নিই। ওখানে ডেপুটি কমিশনার ছিল ভারতীয় সৈনিক বিভাগের কর্ণেল ব্রাউন। নানা ছুতানাতার ভিতর প্রধান বক্তব্য তো আমাদের ছিল ইন্‌সিন্ ছেড়ে ম্যাণ্ডালে যাওয়া। ও বলে, ও সব আমি লিখতে পারব না। আমি বলি, লিখতে পারবে না তো আস কেন? জ্যোতিষ বাবুরও এখন ম্যাণ্ডালে ফিরে যাবার মত হয়েছে। ওঁর অসুখ শরীরের কথাও আমাদের ম্যাণ্ডালে যাবার দাবীর একটা হেতু। একদিন তো ব্রাউন প্রকারান্তরে ব'লে বস্‌লো, জ্যোতিষ বাবুর ওটা অসুস্থতার ভাণ। খুব একটা চেঁচামেচি হয়ে গেল, যতোখানি পারি বকলুম। এর পর দু'এক মাস লক্ষ্য করেছি, ও আসে, আমাদের ইয়ার্ডে ঢোকে না, ফস্টারের বাখারির বেড়ার বাইরে কাঁঠালতলায় দাঁড়িয়ে আমাদের দেখে চ'লে যায়। তারপর আর কখনও দেখিনি। অথচ কানুন বলে, ডেপুটী কমিশনারকে মাসে একবার আসতে হবেই।

বেসরকারী পরিদর্শক একজন ছিলেন পাঞ্জাবী ব্যারিষ্টার, মিঃ মহম্মদ অজাম। "Rangoon Daily News" ব'লে কাগজখানার ইনি স্বত্বাধিকারী। পরে ইনি রেঙ্গুন কর্পোরেশনের মেয়রও

হয়েছিলেন। বেশ ভদ্রলোক, কিন্তু মতামত উদ্ভট। এই সব পরিদর্শককে ব'লে কখনও কিছু বড় হ'ত না। আসতেন, গল্প করতেন, চ'লে যেতেন। এঁর একটা মতের এখানে উল্লেখ করব।

আমরা যখন বর্মার জেলে যাই, অনেক লোক তখন বর্মায় বেঁচে ছিল, যারা স্বাধীন বর্মায় জন্মেছিল, ইংরেজের হাতে দেশের স্বাধীনতা যেতে তারা দেখেছে। কাজেই, কি কয়েদি, কি কর্মচারী, কি বাইরের লোক এমন বর্মী আমরা কম দেখেছি যারা ইংরেজকে না প্রাণপণ ঘৃণা করতো। কিন্তু মনের কথা মনে চেপে থাকতো।

তেমনি দু'একজন ভারতীয়ের সঙ্গেও আলাপ হয়েছে, যারা বলতো, তারা যখন প্রথম বর্মায় যায়, তখন দেখেছে, ফায়ার (বুদ্ধের) দেশের কালাকে (বিদেশীকে) তারা কি শ্রদ্ধার চোখে দেখতো! গ্রাম্য বর্মীরা কোনো ভারতীয়কে রাস্তায় দেখলে দূর থেকে শিকো (সাষ্টাঙ্গে প্রণাম) করতে করতে এগুতো। ভারতীয়রাই বলেছে, এই শ্রদ্ধা তারা হারিয়েছে নিজেদের দোষে। "ঙাপ্পিখানেওয়ালা কচড়া জাত" (মাছ পচিয়ে চাটনি জাতীয় একটা জিনিষ বর্মীরা করে, তাকে বলে "ঙাপ্পি", এটা প্রায় সবাই ভাতের সঙ্গে খায়) তো বলবেই, তারপর, ওদের স্ত্রী স্বাধীনতার সুযোগ নেবার যে কাহিনী শরৎ বাবু বলেছেন, সেটা বহুক্ষেত্রে সত্য। সুযোগ সুবিধা পেলে অপর জাতকে অবজ্ঞা করা, হেলা তুচ্ছ করা যেন আমাদের রক্তমজ্জার ধর্ম। আমরা বর্মায় থাকতে লক্ষ্য করেছি, ওদের জাতীয় জাগরণ আসছে এবং এই ব্যবহারে ওদের মাঝে মাঝে ক্ষেপিয়ে তুলছে।

মিঃ মহম্মদ অজাম অমন একটি শিক্ষিত লোক! তিনি একদিন কথায় কথায় বললেন, **We came with the conquerors, we must have special rights in Burma.**

আমি বললাম, দেখুন, একথা আপনাদের মুখে শোভা পায় না। জাতটা জেগে উঠছে, এর পর যদি এই মনোভাব নিয়ে চলেন, **you will be kicked out of Burma.**

কথাটা মিথ্যা হয় নি। তার আগেই এই মনোভাবের সুযোগ নিয়ে ইংরেজ বর্মাকে আলাদা ক'রে ফেলে। আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু ভিক্ষু উত্তম কিন্তু প্রাণপণ করেছিলেন ভারতকে ও বর্মাকে একই সংযুক্ত-রাষ্ট্রে রাখতে। সে কাহিনী অন্যত্র বলব।

আর একজন আমাদের বে-সরকারী পরিদর্শক ছিলেন কবি নবীনচন্দ্রের পুত্র ব্যারিষ্টার নির্মল সেন। অত্যন্ত সহৃদয় লোক। হরিদার তখন রোজ সন্ধ্যার পর এমন অবস্থা হ'ত যে কখন কি হয় ভেবে আমরা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠি। তাঁর স্বাস্থ্যের অবস্থা দেখে এবং তাঁর স্ত্রীর কথা শুনে মিঃ সেন স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে রেঙ্গুন সেক্রেটারিয়েটে ছুটোছুটি করতে লাগলেন যাতে হরিদাকে কলকাতার জেলে বদ্‌লি করাতে পারেন—হরিদারও চিকিৎসার ব্যবস্থা হবে, স্ত্রীর সঙ্গেও যদি শেষকালে একবার দেখা হয়।

ঐ এক জবাবই বাংলার আই. বি.-র কাছ থেকে বর্মা সরকার পাচ্ছে, হরিদার স্ত্রী ভাল আছেন, তাঁর অবস্থার উন্নতি হচ্ছে।

ইতিমধ্যে একদিন সন্ধ্যার পর গফুর দু'তিনখানা **Forward** এনে দিল। তাড়াতাড়ি একটু দেখে নিচ্ছি, হঠাৎ চোখে প'ড়ে গেল, হরিদার স্ত্রীর মৃত্যু হয়েছে।

তাড়াতাড়ি জ্যোতিষবাবুর কাছে ছুটে যাই, কি করব মাষ্টার মশাই? হরিদাকে বলব?

না, বলা হবে না। কি জানি, যদি হার্ট ফেল করে।

হরিদার কাছে কাছেই থাকি। দু'দিন বাদে মিঃ মহম্মদ অজাম এসেছেন। হরিদা আর আমি ব'সে গল্প করছি। মেজর ফিগুলে আর মিঃ রিচার্ড্‌স্‌ এলেন, একখানা টেলিগ্রাম আর বর্মা গভর্ণমেন্টের একখানা চিঠি হরিদার হাতে দিলেন। তখন আমি মিঃ অজামকে বিদায় করতে ব্যস্ত, আস্তে আস্তে হরিদার মাথাটা ইজি চেয়ারের পাশে ঝুঁকে পড়্‌লো, চোখ দিয়ে দু'ফোঁটা জল গড়ালো।

(৪)

ম্যাণ্ডালের ভিড়ে গিয়ে জমে যাবার জন্য বর্মার জেল কর্তৃপক্ষকে এমনই উত্যক্ত ক'রে তুলেছিলাম যে মেঃ তারাপোর একদিন এসে বললেন, বাংলা গভর্ণমেণ্ট আরও তিনজন রাজবন্দী বর্মায় পাঠাতে চায়, আমরা এইবারে তাদের বলেছি, এঁদের ম্যাণ্ডালেতে না পাঠিয়ে ইন্‌সিনে পাঠাও।

সাদার্ল্যাণ্ড চ'লে গেছে, সিকলোনা ব'লে আর একজন ডেপুটি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এসেছে, সাড়ে ছয় ফুট লম্বা চেহারা, মানুষটি ধুরন্ধর, কিন্তু ধরনটি মাই ডিয়ারী—বিশেষ ক'রে আমাদের কাছে। কারণ ফস্টার ও সাদারর্ল্যাণ্ডের অবস্থা জানে। তাছাড়া, নিজে যেচে নেমন্তন্ন নিয়ে দন্তবিহীন মাড়ি দিয়েই প্লেটতিনেক মাংস আর সেই পরিমাণ পোলাও ও আনুষঙ্গিক মাসে দু'চারবার মেরে যায়।

একদিন এসে গোপন খবর জানালো, কাল আপনাদের দুই বন্ধু আসছেন। আমি বলি, দু'জন কেন? ও বলে, তা তো জানিনে। পকেট থেকে কাগজ বের ক'রে দেখায়, যে তিনজন আসছেন, তাঁদের নাম—অরুণচন্দ্র গুহ, কালিপ্রসাদ ব্যানার্জি আর নরেন্দ্রমোহন সেন।

বাংলার জেলের খবর উড়ো উড়ো যা জানি, তা থেকে ধারণা

হয়েছিল, অরুণদা আর কালিপ্রসাদ ছিলেন ঢাকা জেলে, আর নরেন বাবু ছিলেন আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে। পরে জানতে পেলাম, তিনজনেরই একসঙ্গে আসবার কথা ছিল, কিন্তু যেদিন রওনা হবার কথা, তার আগের দিন সন্ধ্যায় আলিপুর জেলে পুলিশের স্পেশাল সুপারিণ্টেন্ডেণ্ট ভূপেন চাটার্জির হত্যা হয়। অনুসন্ধান সাপেক্ষে নরেনবাবুকে আসতে দেওয়া হয় নাই। অরুণদা আর কালিপ্রসাদ ইন্‌সিন পৌঁছাবার কয়েকদিন পরেই অবশ্য নরেন বাবু আসেন।

অরুণদাকে আগে অরুণদা বলতাম না। কিছু বলবারই প্রয়োজন কম হ'ত—যদিও ওঁর সঙ্গে প্রথম দেখা হয় ১৯১৬ সালে সায়েন্স কলেজে শৈলেন ঘোষের আড্ডায়। শৈলেন ঘোষ তখনও আমেরিকা রওনা হন নাই, আর অরুণদা তখন পলাতক। তারপর থেকে আমরা সবাই প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার পর একে একে খালাস হয়ে এসেছি। ১৯২১ সাল থেকে '২৩ সাল পর্যন্ত অরুণদার সঙ্গে সরস্বতী লাইব্রেরীতে অথবা ডিক্‌সন লেনের এবং পরে বেনেটোলার ওঁদের মেসে মাঝে মাঝে দেখা হ'ত। কুন্তল আর জীবনকে দু'একবার আলোচনা করতে শুনেছি, একটা সত্যিকারের রাজনৈতিক বুদ্ধি এই লোকটির আছে—যা কাজে না লাগিয়ে এঁকে দিয়ে দোকানদারী করান হচ্ছে!

সরস্বতী লাইব্রেরী তখন ঠিক একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ছিল না, ছিল কতকটা একটা রাজনৈতিক কেন্দ্র—বিশেষ ক'রে অসহযোগ সম্পর্কে বাংলা ইংরেজি বহু বই ওখান থেকে প্রকাশ করা হ'ত; বিভিন্ন জেলার আমাদের কর্মীরা ওখানে এসে মেলামেশার সুযোগ পেতেন; ১৯২৩ সালে "সারথি" ব'লে কাগজখানাও ওখান থেকেই বের হয়। এগুলো সব দেখাশুনো করতেন অরুণদা।

শ্রীঅরুণ গুপ্ত

বাইরের কর্মব্যস্ত রাজনৈতিক জীবনে খাঁটি-মেকী সব সময় ধরা পড়ে না—যেমন পড়ে জেলখানার প্রতিদিনকার ছোটখাটো কাজকর্ম কথাবার্তার ভিতর দিয়ে। অরুণদার সঙ্গে ইন্‌সিনে পরিচয়ের পর থেকে আজ এই ২৫ বছর একসঙ্গেই আছি, একসঙ্গেই চলেছি। মতামতের পার্থক্যও তার ভিতর অনেকবার অনেকরকম হয়েছে। তা'তে ক'রে রাজনীতিতেও গোঁজামিল দেবার প্রয়োজন হয়নি, মানুষহিসাবে শ্রদ্ধা বেড়েছে বই কমেনি। আমার কলমে এঁর সম্পর্কে আর কিছু লেখা শোভন বা সমীচিন হবে না।

অরুণদার সঙ্গে এক সুযোগ পেলাম পড়াশুনোর গণ্ডীর বিস্তারের দিকে। সাধারণ ভাবে সাহিত্য, দর্শন, সমাজবিজ্ঞান ইত্যাদি ছাড়া আমাদের পড়ার একটা বিশেষ দিক ছিল বিপ্লবের সমস্যাটা বুঝা। অরুণদার একটা ঝোঁক ছিল বিপ্লবোত্তর যুগের বা স্বাধীন ভারতের নানামুখী সমস্যা নিয়ে আলোচনার দিকে। এবং পড়ার আর একটা দিক ছিল প্রাচ্য সভ্যতা। এই সব নিয়ে দুজনে পড়াশুনো করতাম। এর পরও বহু বৎসর একসঙ্গে জেলে কাটিয়েছি ও একসঙ্গেই পড়াশুনা করেছি।

কালিপ্রসাদের সঙ্গে আগেও মেদিনীপুর জেলে কয়েক মাস কাটিয়ে এসেছি। নরেন বাবুকে ১৯১৭ সালে প্রেসিডেন্সি জেলে দেখেছি। তারও আগে ১৯১১-১২ সালে অনুশীলনের তৎকালীন নেতা মাখনলাল সেনের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে এঁকে জানতাম। দলের ভিতর এঁর তখন প্রবল প্রতাপ। তারপর থেকে এখন এঁর ভিতর অনেক পরিবর্তন হয়েছে। গেরুয়া ধরেছেন, নাম নিয়েছেন ব্রহ্মচারী রামকৃষ্ণ। 'নরেন বাবু' কেউ বললে অত্যন্ত চটে যান, এবং সরকারী কাগজপত্রে এই নামের উল্লেখ দেখলে ছিঁড়ে ফেলেন। এই রকম অবস্থায় মাঝে মাঝে আমায়

সামাল দিতে হয়। আরও তু'পাঁচটা এই ধরণের খেয়ালের জন্য অনুশীলনের এঁর কোনো কোনো বন্ধু এঁকে পাগল ব'লে প্রচার করেন—যদিও এই বারে ধরা পড়ার কিছুদিন আগেই এই সব বন্ধুদের ভিতর প্রতুল গাঙ্গুলিকে নিজের সাহস ও প্রত্যুৎপন্নমতির বলে জীবনে বাঁচান।

নরেন বাবুকে পাগল ওঁরা যতই বলুন, রাজনৈতিক মতামতের আলোচনা দেখি, ওঁদের ভিতর একমাত্র ওঁর সঙ্গেই করা চলে—যদি উনি বিশ্বাস ক'রে আলোচনা করেন। রাজনৈতিক চিন্তার ওঁর একটা ধারা আছে, এবং সেটা বেশ স্পষ্ট। তাছাড়া, এদিকের উদারবুদ্ধিও অনুশীলনের নেতৃবর্গের মধ্যে ওঁর ভিতরই যা দেখেছি।

আমার কাছ থেকে জিতেন প্রভৃতি বাইরের কর্মীদের কথা শুনে উনি রেঙ্গুনে অনুশীলনের যে তু'একজন কর্মী ছিলেন, তাঁদের সাথে মিলিয়ে দিতে চেষ্টা করেন। আগে বলেছি, ত্রৈলোক্যবাবু এ কাজে বাধা দেন। আর, নরেন বাবুর পাগল খ্যাতি তখন এমনই ছড়িয়ে পড়েছে যে এ-প্রচেষ্টায় তিনি ব্যর্থ হ'ন।

হরিদা তখন প্রায় উত্থানশক্তি রহিত। কখনও কয়লার বিস্কুট খাওয়াচ্ছে, কখনও বা একটুকরো মুরগীর মাংস আর তুটো বরবটি সেদ্ধ। হৃদরোগ প্রবল হয়ে উঠ্‌ছে। ওঁর স্ত্রীর বেলাতেও তো অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত সরকার পক্ষ খবর দিয়েছে, আরাম হচ্ছেন! আমরা হরিদা সম্পর্কে বর্মা গভর্ণমেণ্টকে লিখলাম।

একদিন মেজর তারাপোর দেখতে এলেন। পরীক্ষা ক'রে মেঃ ক্বিওলেকে জিজ্ঞেস করেন, ওঁকে এখানে রাখার দায়িত্ব তুমি নিচ্ছ কেন?

কি করব? আমি তো সঠিক কিছু পাচ্ছিনে।

কিন্তু ৫০ পাউণ্ডের মতো ওজন কমেছে, এই তো তোমার পক্ষে যথেষ্ট।

মেঃ ফিণ্ডলে মুখ কাঁচুমাচু করতে লাগলেন।

এর কয়েক দিন পরে হরিদাকে আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে বদ্‌লী করলো। সঙ্গে একজন ডাক্তার দিয়ে দিল।

আমরা পাঁচজন ইন্‌সিনে রইলাম।

ইতিমধ্যে সরকারী দপ্তরে কার মস্তিষ্কে কোথায় বুদ্ধির ঢেউ খেলতে স্থরু করলো। খাওয়াদাওয়ার জন্য আমাদের দৈনিক ভাতা তখন তিন টাকা; জামাকাপড় বিছানা, তেল সাবান প্রয়োজন মতো দেয়; বইয়ের জন্য মাঝে মাঝে কিছু টাকা দেয়—হঠাৎ সার্কুলার এল বই কাগজ এবং তেল সাবানের জন্য মাসিক পনের টাকা এবং কাপড় বিছানার জন্য বাৎসরিক ২২৫৲ টাকা। বাংলায় শুনলাম এই সব নিয়ে আরও নানা-রকমের এক্‌স্‌পেরিমেণ্ট চলেছে। ম্যাণ্ডালের বন্ধুদের মাথায়ও দুষ্টু বুদ্ধি খেলে গেল। টাকা ফুরিয়ে গেলে কি সারা বছর ন্যাংটা ক'রে রাখবে? এই যুক্তির উপর একমাস যেতে না যেতে বর্মী লুঙি, এঞ্জি (কোট) ইত্যাদি কিনতে ২২৫৲ শেষ ক'রে ফেললেন। আমরা এখন ম্যাণ্ডালের খবর প্রায়ই পাই এবং মহাজনদের পদাঙ্ক অনুসরণ করি। বছরে দুবার তিনবার ক'রে ২২৫৲ টাকা খরচের অনুমোদন আসে। মারিয়ানো ব'লে একটি জেলার আমাদের চার্জে। সে বড় ভাল বাজার সরকার, সৎ লোক।

ইন্‌সিনের কথা আগে বলেছি, ওটা ছিল পুরোনো কয়েদি রাখবার জেল। প্রথম প্রথম শুনতাম এবং দু'একদিন দেখেছি-ও কয়েদিগুলোকে ধ'রে ধ'রে সিপাই জমাদার ও মেটপাহারাওয়ালা ঠ্যাঙাতো। আমরা তাই নিয়ে চেঁচামেচি করতাম। একবার হাজার

ষ্ট্রাইকও করতে গিয়েছিলাম। সে ছিল সাদার্ল্যাণ্ড-ফস্টারের যুগ। যে কয়েদিকে মারতে দেখে আমরা নালিশ করেছিলাম, সেই কয়েদি নিজে এসে ডেপুটী কমিশনার কর্ণেল ব্রাউনের কাছে সাক্ষী দিয়ে গেল, তাকে কেউ মারে নাই।

এর পর অন্য রাস্তা ধরলাম। এই রকম মারপিটের খবর যখন যা পেতাম, Rangoon Mail কাগজে পাঠিয়ে দিতাম। নৃপেন বাবু তখন এ কাগজ ছেড়ে চ'লে এসেছেন। এটা তখন সিলেটের এস. সি. ভট্টাচার্যের কাগজ। তিনি মাঝে মাঝে বা দিনের পর দিন সম্পাদকীয় প্রবন্ধ বের করেন "Insein Jail Affairs." আই. জি. তাড়া লাগান, সিকলোনা অস্থির হয়ে ওঠে—এত কড়াকড়ি, তবু কি ক'রে এই সব আমরা পাঠাই!

একদিন সন্ধ্যাবেলা সিকলোনা বাসার বারান্দায় বসে আছে। গফুর তখন আফিসের সব কাজকর্ম সেরে আমাদের বিকেলের বাজার নিয়ে রেঙুন থেকে ফিরছে। গফুর ওদের খুব বিশ্বাসী লোক। তবু সেদিন ওকে ডেকে তন্ন তন্ন ক'রে তল্লাসী করেছে। ওর কাছে প্রায়ই আমাদের দুখানা তিনখানা ক'রে Forward, জিতেন, নির্মল— ওদের সব চিঠিপত্র থাকে। ভাগ্যক্রমে সেদিন কিছুই ছিল না।

ও তবু বুদ্ধি ক'রে সেদিন আর ভিতরে আসে নাই, আমাদের জিনিষপত্র গেটের সিপাই-এর কাছে ফেলে রেখে চ'লে গেছে। প্রতি সন্ধ্যায় আমি ওর জন্যে উদ্বিগ্ন হয়ে থাকি। সেদিন যখন ওর আসার সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে, আমি ইয়ার্ডের সিপাইএর মারফত রাউণ্ডের জমাদারকে দিয়ে খবর নিয়ে জেনেছি, গফুর গেট থেকে চ'লে গেছে। বুঝলাম, কি হয়েছে। আর কাউকে কিছু বললাম না।

রাত ৯টায় মারিয়ানো এসেছে আমাদের বন্ধ করতে। আমি

একেবারে ফেটে পড়লাম : "এত রাত হয়ে গেছে, আমাদের বাজার আসে নাই ; তুটি অসুস্থ বন্ধুকে প্রায় না খেয়ে থাকতে হ'ল !"

নরেন বাবু প্রায়ই ফল খেয়ে থাকতেন, জ্যোতিষ বাবুও অসুস্থ ব'লে রাত্রে ভাত না খেয়ে হালকারকম কিছু খেতেন। তবে ঘরে এঁদের দুজনের মতোই খাবার যথেষ্ট ছিল। তাতে কিছু যায় আসে না, মারিয়ানোকে সেল থেকে সুরু ক'রে শোবার দোতলা ঘর পর্যন্ত যেতে যেতে আগাগোড়া যা মুখে এল বকলাম। এত চীৎকার করেছি যে, অন্যদিনের মতো বেচারী সেদিন আর আমাদের সাথে সাথে দোতলা পর্যন্ত উঠে good-night-ও করলো না, গল্পও করলো না— জমাদারকে পাঠিয়ে দিল ঘরে তালা দেবার জন্য, নিজে হতভম্ব হয়ে নীচে দাঁড়িয়ে রইলো।

জমাদারও তালা বন্ধ ক'রে সিঁড়ি দিয়ে নামছে, আমিও হাসতে হাসতে খাটের উপর গড়িয়ে পড়লাম। অরুণদা আর কালিপ্রসাদ তো অবাক্। প্রথমতঃ, মারিয়ানোকে যে আমি অমন ক'রে বকতে পারি, তা ওঁরা ভাবতে পারেন নাই, দ্বিতীয়তঃ আমার এই হাসি দেখে। অরুণদা বলেন, "আগাগোড়া থিয়েটার করছিলে ? আমি তো বলি, কী মেজাজই হারিয়েছ !"

আমি বলি, এই থিয়েটার যদি আজ না করতাম, কাল থেকে গফুরকে দিয়ে আর কোন কাজ করানো অসম্ভব হ'ত, যখন তখন ওর তল্লাসী নিত, ও ভয় খেয়ে যেত।

মারিয়ানো ততক্ষণে আফিসে গিয়ে রিপোর্ট লিখছে : মিঃ দত্ত আজ আমায় ভয়ানক অপমান করেছেন।

সিক্লোনা কড়াকড়ির একটি ব্যবস্থা করেছিল—মারিয়ানোকে রোজ সকাল সন্ধ্যায় আমাদের সঙ্গে বেড়াতে যেতে হ'ত।

পরদিন ভোরবেলায় মারিয়ানোর সঙ্গে গায়ে প'ড়ে আমি খানিকটা গল্প করলাম।

খানিক বেলায় মেঃ ফিগুলের এক চিঠি পেলাম: Dear Mr. Datta, মিঃ মারিয়ানো রিপোর্ট করেছেন, আপনি কাল তাঁকে বেজায় বকেছেন আর অপমান করেছেন। আপনার কি বলবার আছে?

জবাবে লিখলাম, সময় মতো বন্ধু বান্ধবের খাবার আসে নাই, আমরা খেয়েছি, আর তাঁরা প্রায় অভুক্ত রয়ে গেছেন। এতে কার না মেজাজ খারাপ হয়? মিঃ মারিয়ানোই তো চার্জে। কিন্তু তাঁর সঙ্গে তো আবার আমার বেশ বন্ধুত্ব হয়ে গেছে!

মেঃ ফিগুলে মারিয়ানোকে জিজ্ঞেস করেছেন "তুমি খুসি তো?"

মারিয়ানো জবাব দিয়েছে, আমার আর রাগ নেই।

সকল নাটের গুরু সিকলোনা খানিক বাদে বাঁধানো দাঁত বের করতে করতে এসে বলে, মিঃ দত্ত, আমিই কাল গফুরকে আটকেছিলাম। আমি জানি, ও খুব বিশ্বাসী, এসব করবে না। কিন্তু কি ক'রে কাগজে এসব বের হয়? তাই কাল ওকে পেয়ে একবার তল্লাসী ক'রে দেখলাম।

আমি জিজ্ঞেস করি, একথাই বা ভাব কেন যে ওসব আমরা বের করি?

সিকলোনা হাসে আর বলে, সে আর ব'লে কাজ নেই।

বুঝলাম, ভবিষ্যতের জন্য গফুর বিপদ-মুক্ত।

পুজো আসছে। আগের বারের ম্যাণ্ডালের পুজোর জন্য আমরা হাঙ্গার ষ্ট্রাইক করেছি। এবারে আমরা নোটিশ দিলাম, আমরাও ইনসিনে পুজো করব।

ধর্মকর্মের জন্য গবর্ণমেণ্টের বাৎসরিক মঞ্জুরী আমাদের পাঁচজনের

দেড়শ'র মতো ছিল। আমার কিছু টাকা হরিদার স্ত্রীর শ্রাদ্ধে ব্যয় হয়েছে। আর শ'দেড়েকের মতো খাওয়ার খরচ থেকে বাঁচিয়েছি। ব'লে দিলাম বাকীটাও ঐভাবে বাঁচিয়ে দেওয়া যাবে। কিন্তু আমাদের মনের কথা, সবটাই গভর্ণমেণ্টের কাছ থেকে আদায় করব।

জেলের ভিতর মণ্ডপ তৈরী হ'ল। ত্রিপুরা জেলার এক কুমোর সেখানে প্রতিমা গড়তে সুরু করলেন, নেবেন ৮০৲ টাকা। মাদ্রাজী ব্যাণ্ড্ পার্টি আর ৮০৲ টাকা। চট্টগ্রামের পুরোহিত ১০০৲ টাকা। যোগেন ভট্টাচার্য্য পুলিশ দিয়ে টাউঙ্গুর দিক থেকে এত পদ্মফুল আনিয়ে দিল যে ভাঁড়ার ঘর যেটা ঠিক হয়েছিল, তার প্রায় অর্ধেকটা ভরে গেল।

এদিকে ঠিক হ'ল, ইন্‌সিনের ৩৩০০ কয়েদি, শ'দুই সিপাই জমাদার, ইন্‌সিন ও রেঙ্গুনের দুই বিশাল জেলের এবং আই. জি.র আফিসের সব কর্মচারী, বেসরকারী পরিদর্শক—যাকে যেমন পারি খাওয়াব। কয়েদিদের অবশ্য সবটা খাওয়া দিতে পারব না—জেল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ব্যবস্থা ক'রে যে চাল, ডাল, তরকারি ওরা জেল থেকে দেয়, তা-ই সেদিন একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়ে নেব, তার উপর আমরা দেব শুঁটকি মাছ, আলু, ঘি ও মিষ্টি। এসবেও খরচ কম নয়।

আগে কিছু বলিনি। ষষ্ঠির দিনে সকাল বেলায় যখন আমাদের রোজ বাজারের ফর্দ যায়, তখন পুজোর জিনিষপত্র সহ যে জিনিষের ফর্দ পাঠিয়ে দিলাম, তার মোট দাম ৯০০৲ টাকার উপর। সিকলোনা গফুরকে দিয়ে ব'লে পাঠাল, এত টাকা জমে নাই, এ জিনিষ আনতে দেওয়া হবে না। আমি গফুরকে দিয়ে ভাঁড়ার ঘরের চাবি ফেরত পাঠিয়ে দিলাম।

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এলেন।

"আপনাদের তো শ'তিনেকের উপর টাকা নেই। প্রতিমা, বাদ্য ইত্যাদিতে টাকা যাবে। তার উপর এই ৯০০৲ টাকার ফর্দ! এ আমি দিতে পারব না।"

আবার সেই ঠ্যাটামির আশ্রয়। "না দিতে পারার মানে কি জানেন? পুজোর মণ্ডপ হয়েছে, প্রতিমা হয়েছে, এখন পুজো না হ'লে প্রায়শ্চিত্ত—ঐ মণ্ডপ আর প্রতিমা সহ গৃহকর্তা বা পুজোর উদ্যোক্তাদের একজনকে আগুনে পুরে মরতে হবে।"

মেঃ ফিগুলে গম্ভীরমুখে কিছু সময় ভাবলেন, তারপর বললেন, "তা হলে আমি যা করতে পারি, সে হচ্ছে আপনাদের কাছ থেকে ম্যাচ্ বাক্সগুলো নিয়ে নেওয়া।"

আফিসে গিয়ে আই. জি.র সঙ্গে টেলিফোনে কথাবার্তা। তার পর গফুর এসে চাবি দিয়ে গেল। পুজো সাড়ম্বরে এবং according to plan হয়ে গেল। খরচ ১৮০০৲ টাকার মতো।

সপ্তমী পুজোর দিন সকাল বেলা জিতেন ওঁরা ফুল দেওয়া উপলক্ষ্য ক'রে চার পাঁচজন জেলের ভিতর ঢুকে পড়লেন। রোখে কে? সামান্য কথাবার্তার পর সিপাই জমাদাররা কাকুতি মিনতি সুরু করলো, ওঁরা চ'লে গেলেন। সিকলোনা সিপাইদের সঙ্গে হৈ চৈ করলো। যোগেন ভট্টাচার্য স্বয়ং খবরদারীর চার্জে। তার সেই ভাগনেটা যে পাচক সেজে আমাদের লঞ্চে বেসিন গিয়েছিল, সে হাফ প্যান্ট প'রে এসে মাঝে মাঝে ব'সে থাকে।

আমি করি ফোপরদালালী অর্থাৎ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ধমক ধাপ্পার কাজ; কালিপ্রসাদ বামুন মানুষ—পুজোর মণ্ডপে থাকেন; ভারী কাজ ভাঁড়ার এবং লোকজন খাওয়ানো—অরুণদার। ওঁর তখন নখের

পাশে, চোখের রোঁয়ার ভেতর, হাতে পায়ে অজস্র ফোঁড়া বের হচ্ছে, পায়ের একটা ফোঁড়ায় পা ফুলে পড়েছে, অসহ্য ব্যথা, তবু হাসিমুখে সারাদিন খাটছেন। নিজেকে spare করব না—মন্ত্রটি যেন জীবন ভ'রে আপন মনে জপ ক'রে চলেছেন।

বিজয়ার দিন জিতেনদের আয়োজনে জেলের গেটে সে কি লোকের ভিড়! গেট থেকে বিদায়ের আগে ওঁদের সঙ্গে আমাদেরও এক এক নজর দেখা হ'ল।

বৃষ্টি নেমে পড়লো। জেলের গুদাম থেকে ওয়াটার প্রুফের থান বের ক'রে তাই দিয়ে লরীর উপর আর এক মণ্ডপ তৈরী হ'ল। আগে থেকেই রেঙ্গুনে খবর রটে গিয়েছিল, ইন্‌সিন জেলের রাজবন্দীদের প্রতিমা বিসর্জনের জন্য আসবে। যোগেন ভট্টাচার্য আপত্তি তুলেছিল, প্রতিমা জেলেরই একটা ডোবাতে বিসর্জন দিতে বলেছিল। আমাদের ধমকের সামনে সে আপত্তি টেঁকে নাই। সর্ব জাতীয় এত লোকের মিছিল হয়েছিল যে, শুনলাম, রেঙ্গুনে অত বড় মিছিল খুব বেশী হয় নাই।

আবার পড়াশুনোয় দিন কাটছে। ফরাসী ভাষার চর্চা আবার নতুন ক'রে সুরু হ'ল অরুণদার সঙ্গে।

পুজোর অনেক দিন আগে মেঃ তারাপোর একদিন এসে আমাদের মনে এক আশা জাগান: ম্যাণ্ডালে জেলটা ম্যাণ্ডালে দুর্গের ভিতর। ঐ জেলে যেতে আসতে দেখেছি, জেল এবং আগে যে-বাড়ীতে লালা লাজপত রায় ও সর্দার অজিত সিং আটক ছিলেন, এই দুটোর মাঝখানে একটা স্কুলের বাড়ী ছিল। বর্মা গবর্ণমেণ্ট প্রস্তাব করেছে, বর্মায় সব বাঙালী ষ্টেট প্রিজনারদের জেলে না রেখে এই বাড়ীতে রাখা হোক। তা'তে ষ্টেট প্রিজনাররাও ভাল থাকবেন, জেলের সাধারণ

ডিসিপ্লিনের দিক থেকেও সেটা অনেক ভাল হবে। এই প্রস্তাব নিয়ে বর্মা, বাংলা ও ভারত গভর্ণমেণ্টের ভিতর লেখালেখি চলছে। ব্যবস্থা পাকা হয়ে গেলেই আমাদের ওখানে নিয়ে যাওয়া হবে।

মাসের পর মাস চ'লে যায়, আমরা আশায় আশায় থাকি—ওদিকে **hope deferred maketh the heart sick.** মেঃ তারাপোর প্রায়ই আসেন, আমরাও প্রতিবারেই তাগিদ দিই। অবশেষে একদিন এসে বললেন, বাংলা থেকে আই. বি. র ডি. আই. জি. লোম্যান গিয়েছিল ঐ বাড়ী দেখতে। বলেছে, ঐ বাড়ীর চারদিকে দেয়াল তুলতে হবে। দুর্গের মধ্যে আবার এই ছোট্ট একটুখানি জেল তৈরী করতে বর্মা সরকার রাজী হয় নাই, অতএব ও প্রস্তাব ফেঁসে গেল।

আমরা দরাদরি করি, তা হ'লে অন্ততঃ আমাদের ম্যাণ্ডালে জেলে পাঠিয়ে দিন।

সে হবে না, বাংলা গভর্ণমেণ্ট রাজী নয়। আমাদের সন্দেহ জাগে, ও-বাড়ীতে হ'লে সবাইকে একত্র রাখতে রাজী, আর, ম্যাণ্ডালে জেলে হ'লে কেন রাজী হবে না? এর ভিতর বর্মা গভর্ণমেণ্টের, হয়তো বা আই. জি.রই, কারসাজি আছে। একদিন মেঃ তারাপোরের সঙ্গেই ঝগড়া ক'রে ফেলি এবং তাঁর বিরুদ্ধে নানাবিধ নালিশ তুলে ভারত গভর্ণমেণ্টের কাছে লেখালেখি সুরু করি।

এসব ঘটে গেছে পুজোর আগে। পুজোর সময় অফিসারদের নেমন্তন্ন করেছিলাম। তার ভিতর এল আই. জি.র অফিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কেনি। খাওয়ার টেবিলে বসে নানারকম কথাবার্তার ভিতর বলে, আপনার সব চিঠিপত্র আমি পড়েছি। **Long after you have left the shores of Burma, you will be remembered in Burma.** ভাবি, এ আমড়াগাছি কেন। খানিক বাদে বেরাল বেরিয়ে

পড়লো। বল্লে, মিঃ কলিসের (বর্মা সরকারের চীফ সেক্রেটারী) সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। তিনি বলেন, আপনারা এইরকম চিঠিপত্র চালিয়ে যান। আপনারাই জিতবেন।

কিছুদিন আগেই কানাঘুষো শুনেছিলাম, কর্ণেল ক্যামেরণ, কর্ণেল সিমসন প্রভৃতি ইউরোপিয়ান আই. জি.র দল Inspectors-General of Prisons' Conference-এ মেঃ তারাপোরকে অপদস্থ করতে যথাসম্ভব চেষ্টা করছে, তিনি কারা-সংস্কারের যে সব প্রস্তাব করেছিলেন, সে গুলো যা'তে বানচাল হয়, তার জন্য যথাসাধ্য করছে। এখন কলিসের খবর শুনে বুঝলাম, এ হচ্ছে উচ্চপদস্থ দেশী কর্মচারীর বিরুদ্ধে ইউরোপীয় কর্মচারীদের ষড়যন্ত্র।

সেই থেকে মেঃ তারাপোরের নামে ব্যক্তিগতভাবে লেখা বন্ধ ক'রে দিলাম। তবু জেল খানায় কোনো-কিছু নিয়ে ঝগড়া একবার সুরু করলে চরমে যেতেই হয়, অথবা আত্মসম্মান বিসর্জন দিতে হয়। অনেক স্তরের ঝগড়ার পর শেষ পর্যন্ত নোটিশ দিলাম, রাত্রে ঘরে বন্ধ হব না। হাঙ্গার ষ্ট্রাইক করতে হ'লে, স্থির করলাম, করব এর পরের স্তরে।

জেলখানায় রাত্রে ঘরে বন্ধ হ'তে না চাইলেই ধ্বস্তাধ্বস্তি। গেরুয়াধারী নরেনবাবু বললেন, আমি তোমাদের সঙ্গেই আছি, তবে আমি ঠিক ধ্বস্তাধ্বস্তি পর্যন্ত যাবনা, under protest বন্ধ হব।

আমরা বলি, তথাস্তু।

জ্যোতিষ বাবুর গোড়াতে উৎসাহ খুব। কিন্তু সন্ধ্যার আগে মেঃ ফিণ্ড্লে এলেন রিচার্ডসের সঙ্গে। রিচার্ডস্ তখন ডেপুটি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট। জ্যোতিষবাবুর সঙ্গে কি কথা হ'ল জানিনে। উনি দেখি, মেঃ ফিণ্ড্লের সঙ্গে হাসপাতালে চ'লে গেলেন। সেখানে ওঁকে আলাদা থাকবার ঘর, রান্নাঘর ও পাচক দেওয়া হ'ল। প্রশ্ন ক'রে ওঁকে সংকুচিত ক'রে

তুলতে চাইনে—আমরা তিন জন মাঝে মাঝে হাসপাতালে গিয়ে ওঁর কুশলবার্তা জেনে আসি। বলেন, বেশ আছেন।

ধ্বস্তাধ্বস্তির জন্যে তৈরী আমরা তিনজন : অরুণদা, কালীপ্রসাদ ও আমি। রাত্রে পিংপং খেলার টেবিল বের ক'রে শুয়ে পড়ি। ৯টায় সিপাইরা চ্যাংদোলা ক'রে কেমন নিয়ে সেলে বন্ধ করবে, তার জল্পনা কল্পনা করি।

মেঃ তারাপোরের পরামর্শে সেসব কিছুই করলো না। যেমন শুয়ে ছিলাম, তেম্‌নি রাত ভোর ক'রে দিলাম। অমন লড়াইটা মাঠে মারা গেল।

দুর্ভাগ্যের অন্ত সেখানেই নয়। পাঁচদিনের দিন দুপুরে জমাদার মেঃ ফিণ্ড্‌লের একখানি চিঠি দিয়ে গেল : মিঃ দত্ত এবং ব্যানার্জিকে আজ রাত ৯টায় এ জেল ছেড়ে যেতে হবে। বিকেল ৫টার ভিতর তাঁদের জিনিষপত্র আফিসের লোক গেলে তার কাছে দিয়ে দেবেন।

একবার মনে উঠ্‌লো, বাধা দিই, জোর ক'রে নিয়ে যাক্‌। আলোচনায় ঠিক হ'ল, লাভ নেই কিছু। মনের দিক দিয়ে সবারই যা অবস্থা, তা জেলে যাঁরা এ অবস্থায় না পড়েছেন, তাঁদের কল্পনায় আসবে না।

পরদিন সন্ধ্যার আগে গিয়ে পৌঁছাই বেসিন জেলে। নুর মহম্মদ জেলার আর পুর্ণ বড়ুয়া ডেপুটি জেলার নিয়ে চললেন জেলের ভিতর। জিজ্ঞেস করি, কোথায় নিয়ে চলেছেন ?

নুর মহম্মদ বলে, আছে ওদিকে ভাল জায়গা আছে।

আমি বলি, বেসিন জেল আমার অচেনা জায়গা নয়। ঐ কোণে ঐ দশটা সেলে তো ?

হাঁ।

ওখানে আমরা থাকব না।

তাহ'লে তো সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে ডাকতে হয়।

ডাকুন।

ইয়ার্ডের ভিতর গিয়ে জিনিষপত্রের সাম্‌নে ডেক্‌চেয়ার বিছিয়ে বস্‌লাম। পুর্ণবাবু আমাদের সেই পুরানো রান্নাঘরে ঢুকে ইরাণী পাচকের হাত থেকে খন্তি নিয়ে মাছ সাঁৎলাতে লাগলেন।

কর্ণেল ষ্টুয়ার্ট বুড়ো মানুষ। বাটনহোলে গোলাপ ফুল গুঁজে এসে বলেন, না, না, আমি এখন কোথায় রাখব ?

আমি বলি, ঐ হাসপাতালের পাশে বি ক্লাস আণ্ডারট্রায়ালদের যে ছোট্ট ইয়ার্ডটা আছে, সেটা বেশ জায়গা, আমাদের দু'জনের খুব চ'লে যাবে।

তারপর ? বি ক্লাস আণ্ডারট্রায়ালরা কোথায় যাবে ?

আমি জবাব দিই, প্রায় কোনো জেলেই এ আর বি ক্লাসের আণ্ডার-ট্রায়ালের আলাদা ওয়ার্ড নেই, ওরা একসঙ্গেই থাকে।

এখন আমার কয়েদি বন্ধ হয়ে গেছে। আজ রাতের মতো এই সেলেই থাকুন, কাল যা হয় দেখা যাবে।

রাত্রে থাকা দূরের কথা, ও সেলে ঢুকবও না। জেলের মাঝখানে আপনাদের একটা আফিস ঘর আছে, সেটা রাত্রে বন্ধ থাকে, সেখানে আজ রাত কাটাবার ব্যবস্থা করুন।

কর্ণেল ষ্টুয়ার্ট মেট দিয়ে ঘর পরিষ্কার করাবার অর্ডার দিয়ে চলে গেলেন।

পুর্ণ বাবু মাছ ভাজা হাতে বেরিয়ে বলেন, সাবাস!

বললাম, চা করুন, তার সঙ্গে ওটা খান।

পরদিন সেই আণ্ডারট্রায়াল ওয়ার্ডেই স্থান হ'ল।

কালিপ্রসাদ ছাব্বিশ দিন বাদে বাইরে ইণ্টার্ণমেণ্টের অর্ডার পেয়ে বাংলায় চ'লে এলেন। আমি একাই রইলাম।

না, ঠিক একা নয়। পুর্ণ বাবু জেলের ভিতরের আফিস ঘরে বসেন। আর, সেখানে কোনো বেলায় ডেকে দেন স নে ডুনকে, কোনো বেলায় হরিনারায়ণ চন্দকে।

স নে ডুনের কথা আগে বলেছি। হরিনারায়ণ ১৯২৫ সালে দক্ষিণেশ্বরে যে বোমা ধরা পড়ে,সেই বোমার এক্সপার্ট। তাঁর কাছ থেকে এই নতুন ধরণের বোমার ফরমুলার ও serrated খোলসের খবর নিই। ফরমুলা আমাদের কাজে লাগে নাই, কারণ, ১৯২৯ সালে আমাদের যিনি এক্স্‌পার্ট জোটেন, তিনি আরও নতুন রকমের ফরমুলা দেন। কিন্তু হরিনারায়ণের কাছ থেকে খোলসের দরুণ যেসব ঠিকানা পাই, তারই সূত্র ধ'রে ১৯২৯ সালে হুগলির হামিদের কাছে একটা নমুনা খুঁজে পাই। Serrated হওয়ার দরুণ এই খোলসের এক একটা টুকরো এক একটা বুলেটের কাজ করে। এই নমুনাই ১৯৩০ সালের ডালহৌসি স্কোয়ারের ও অন্যত্রকার বোমার মডেল। তবে এই সময়কার আমাদের এক্স্‌পার্টের পরামর্শে দক্ষিণেশ্বরের মতো ওগুলোকে লোহার না ক'রে অ্যালুমিনিয়ামের করা হয়। সে কাহিনী অন্যত্র আসবে।

আমি বেসিনে আছি ব'লে হঠাৎ একদিন হরিনারায়ণকে মৌলমিনে বদলি ক'রে দিল। ভূপেন চাটার্জির হত্যার অপরাধে অনন্তহরি মিত্র ও প্রমোদ চৌধুরীর ফাঁসি হয় এবং হরিনারায়ণ, অনন্ত চক্রবর্ত্তী ও ধ্রুবেশ চাটার্জিকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের সাজা দিয়ে বর্মায় পাঠায়। অনন্ত ও ধ্রুবেশ ছিলেন মিয়াংমিয়া ও মিনজান জেলে। এই অপুর্ব চরিত্র কর্মীদের কাহিনী পরের অধ্যায়ে বলব।

ইতিমধ্যে দেশী ও ইংরেজ কর্মচারীদের পার্থক্যের একটু কাহিনী

বলি। দেশী কর্মচারীদের ভিতর খুবই ভাল ও শিক্ষিত যারা, তারাও যেন শাসনের কাজে ব্যক্তিকে বা নিজেকে বাদ দিয়ে কোনো কিছু দেখতে পারে না—যা ইংরেজ কর্মচারীরা কোনো কোনো ক্ষেত্রে পারতো।

ষ্টেটপ্রিজনার কোনো জেলে কেউ এলে তাকে কোথায় রাখা হয়েছে, সে সম্বন্ধে আই. জি.-কে রিপোর্ট দিতে হয়। আমাদের বি ক্লাস আণ্ডারট্রায়াল ওয়ার্ডে রাখা হয়েছে—এই রিপোর্ট পেয়ে কর্ণেল তারাপোর বেসিনের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে লেখেন, আমি যেখানে রাখার নির্দেশ দিয়েছিলাম, সেখানে এদের কেন রাখা হয় নাই।

শুধু আমি নই, কর্ণেল ষ্টুয়ার্টও কর্ণেল তারাপোরের এই ব্যক্তিগত আক্রোশের পরিচয় পেয়ে একটু মুচকি হেসেছিলেন। কর্ণেল তারাপোর জানতেন, বেসিনের ঐ সেলে থাকতে আমার আপত্তি ছিল ব'লেই ১৯২৪ সালে লেখালেখি ক'রে জীবন আর আমি ম্যাণ্ডালেতে বদলি হয়েছিলাম।

কিন্তু কর্ণেল ষ্টুয়ার্ট ঝুনো কর্ণেল, আর মেজর তারাপোর সবে লেফটেনাণ্ট কর্ণেল হয়েছেন। তাছাড়া, ১৮১৮ সালের ৩নং রেগুলেশনের ৬নং ধারায় ছিল, ষ্টেট প্রিজনারের স্বাস্থ্য এবং সুখ সুবিধার পক্ষে তার বাসস্থান উপযোগী কিনা তা দেখবে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট।

কর্ণেল ষ্টুয়ার্ট লিখলেন, I am perfectly satisfied with their present accommodation. কর্ণেল তারাপোর বিদ্বেষের বশে এইভাবে যেচে অপমান হলেন, দেখে একটু দুঃখই হ'ল।

বেসিনের ছোটখাটো সুযোগের ভিতর জিতেনদের সঙ্গে সামান্য যোগাযোগ। ইন্‌সিনে অরুণদা সবই জেনে নিয়েছিলেন। তিনিই

সব চালান, আমার চেয়ে ভালোভাবেই চালান। জেল থেকে পয়সাকড়ি বাঁচিয়ে ওঁদের পাঠান, প্রয়োজনমতো অন্য জিনিষপত্রও। জিতেনরা তবু বেসিনে আমার খবর নেন, ওখানেও তাঁদের দলের লোক ছিল। অরুণদার চিঠিপত্রও পৌঁছে দেন। অন্যভাবেও চিঠিপত্র চলে। আগ্রহ তীব্র, পথের অভাব হয় না। সুভাষ ইতিমধ্যে অসুস্থ হয়ে ম্যাণ্ডালে থেকে চিকিৎসার জন্য রেঙ্গুনে এসেছিলেন—সেখানে উদ্ধত, অভদ্র সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মেজর ফ্লাওয়ারডিউয়ের সঙ্গে ঝগড়া ক'রে ইন্‌সিনে আসেন। তাঁরও চিঠিপত্র পাই।

আর একটি ঘটনা একটু বিস্ময়কর। প্রথমবার যখন জীবন ও আমি বেসিন আসি, তখন রেঙ্গুন ঘাটে যোগেন ভট্টাচার্য আমাদের বলেছিল, বেসিনে আপনাদের কোনো অসুবিধা হবে না। সেখানে দত্ত নামে একটি বাঙালী কয়েদি আছে, সে-ই এ-জেলের রাজা। আমাদেরই অবিশ্যি ওকে সাজা দেওয়াতে হয়েছিল, তবে তার কাছে আপনারা যা সাহায্য চান পাবেন।

যোগেন ভট্টাচার্যের মুখে এই সার্টিফিকেটের পর আমরা আর ভরসা ক'রে ওর কাছে কোনো সাহায্য চাইনি। এবারে বেসিনে এসে দেখলাম, সেই দত্ত খালাস হয়ে জেলের ছোটখাটো কনট্রাক্টরির কাজ করে। পূর্ণ বাবু আমাদের সাথে দেখা করিয়ে দিলেন।

কিছুদিন বাদে বর্মা গভর্ণমেণ্টের এক চিঠি এল, লিখেছে: রেঙ্গুন মেল কাগজের মিঃ এস. সি. ভট্টাচার্য বেসিন যাচ্ছেন—প্রকাশ্যতঃ তাঁর কাগজের জন্য গ্রাহক সংগ্রহ করতে, কিন্তু আসলে ষ্টেট প্রিজনারটির খবরাখবর করতে। ষ্টেট প্রিজনার যেন কোনো প্রকারে এঁর সংস্পর্শে না আসতে পারেন। দত্ত ব'লে জেলের যে কনট্রাক্টর আছে, সে

বাঙালী, তার মারফত যোগাযোগ হ'তে পারে। সম্ভব হ'লে এর সব কন্‌ট্রাক্ট যেন বাতিল করে দেওয়া হয়।

ধ'রে আনতে বল্‌লে যারা বেঁধে আনে নুর মহম্মদ ছিল সেই ধরণের জেলার। দত্ত বেচারীর সব কন্‌ট্রাক্ট বাতিল হয়ে গেল। •

বর্মায় থাকতে বর্মার রাজনৈতিক জীবনের যে সামান্য পরিচয় পেয়েছিলাম, তার একটু আভাস না দিলে আমার পক্ষে অন্যায় হবে। আমি বিশেষ ক'রে তখনকার রাজনীতিতে ওখানকার ধর্মযাজকদের (ফুঙি) যে-প্রভাব ও দানের পরিচয় পেয়েছিলাম, তারই সামান্য উল্লেখ করব।

রাজদ্রোহের অপরাধে ভিক্ষু উত্তমার মোবিনে সাজা হয়। সাজার পর যখন তাঁকে কোর্ট থেকে জেলে নিয়ে যায়, তখন চৌদ্দশ' বর্মী নারী রাস্তার দুপাশে শুয়ে প'ড়ে তাঁদের চুল বিছিয়ে দিয়েছিলেন রাস্তায়, ভিক্ষু তারই উপর পা ফেলে ফেলে জেলে পৌছান।

আর যাঁর কথা বলব, তাঁর নাম ভিক্ষু নাগিন্দা। বাংলা দেশে স্বদেশী যুগে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় একভাবে ও ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত আর একভাবে ইংরেজের বিচারালয় সম্পর্কে তাঁদের মনোভাব জ্ঞাপন করেন। আর উ নাগিন্দা করেছিলেন বর্মায় সম্পূর্ণ অন্যভাবে। তিনি বলেন, বিদেশীর বিচারালয়ের কোনো অধিকার নেই তাঁর বিচার করবার। তিনি স্বেচ্ছায় বিচারালয়ে যেতে অস্বীকার করেন। সরকার থেকে কোনো যানবাহনের ব্যবস্থা করে নাই। ম্যাণ্ডালে জেল থেকে কোর্ট বেশ দূরে। ভিক্ষু নাগিন্দাকে বিচারের প্রত্যেক দিন দুই পা ধ'রে রাস্তা দিয়ে টেনে নিয়ে যাওয়া হ'ত। এইভাবে যেতে তাঁর শরীর মাথা সব ক্ষতবিক্ষত হয়ে যেত। তবু অন্য কোনো

পন্থার কথা কেউ চিন্তাও করে নাই। শাস্তি হয়ে যাবার পর এঁকে মেদিনীপুর জেলে পাঠিয়ে দেয়।

একা একা দিন কাটাই। পড়াশুনোয় বেশী মন বসে না। বই পত্র পাওয়ার সুযোগ কম। কর্ণেল ষ্টুয়ার্টকে বলে সরঞ্জাম ও লোক নিয়ে ছোট্ট ইয়ার্ডটা ফুলের বাগানে সাজাই। অতীত জীবনের স্বপ্নের মতো এক ঝাঁক ক'রে ফুল শুকায়, আবার ভবিষ্যৎ জীবনের কল্পনা নিয়ে আর এক ঝাঁক প্রতি প্রভাতে ফুটে ওঠে।

ইয়ার্ডে আমার বানরটা ছিল একা। বেড়াতে যখন বের হ'তাম আফিসের উপরের ঘরে জানালা থেকে 'কাকু' ব'লে ডাকতো পূর্ণবাবুর প্রতীক্ষমান আট বছরের ছেলে—যেন 'ডাকঘরে'র অমল। আর, বাগানে বিশাল এক খাঁচার সামনে করুণ চোখে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকতো একলা একটি হরিণ। এদের প্রতি আমার তখনকার সহানুভূতির যে গভীরতা, আমার নিজের মনেও তার তুলনা কম। অন্তর তবু ভরপুর।

প্রায় ছয় মাস কেটেছে, এমন সময় হঠাৎ একদিন বাংলায় বদলির অর্ডার আসে। তাড়াতাড়ি কর্ণেল ষ্টুয়ার্টকে দিয়ে ইন্‌সিনের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে খবর পাঠাই, আমার সঙ্গে যে বানরটা আছে, সেটা ইন্‌সিনের ষ্টেট্-প্রিজমারদের জন্য নামিয়ে দিয়ে যাব, একজন লোক যেন ইন্‌সিন ষ্টেশনে আসে।

আমি ইন্‌সিনে থাকতেই গফুর ছুটি নিয়ে বাড়ী গিয়েছিল। তার জায়গায় কাজ করতো মহম্মদ আমিন। সে-ও আমাদের সমানই বিশ্বাসী হয়ে উঠেছিল। তাকে বানর নিতে ষ্টেশনে আসতে হবে শুনে অরুণদা সবই বুঝলেন। মহম্মদ আমিনের মারফত বানরও গেল, চিঠি বিনিময়ও হ'ল—পুলিশ ও আই. বি. থাকা সত্ত্বেও।

পরদিন জাহাজে যে বাঙালী আই. বি. অফিসারটিকে সঙ্গী পেলাম, সে ছেলেমানুষ। বললাম, এমন ভদ্রলোকের মতো চেহারা, আর এই চাকরী করছেন! বেচারী কেঁদে ফেললো—বলে, আমার মাকে নিয়ে খেয়ে বেঁচে থাকতে পারি, এমন একটি কাজ জুটিয়ে দিন, এ চাক্‌রী ছেড়ে দেব।

বেচারী দু'দিনই কেঁদেছিল, কিন্তু আমি জানি, ও-চাক্‌রী সে ছাড়ে নাই, অন্য চাক্‌রীর চেষ্টাও করে নাই।

একটি যুগাদর্শের তিরোধান

খালাস অথবা খালাসের সূচনায় বাইরে অন্তরীণ হবার তখন ধুম লেগে গেছে। আমি যে ষ্টীমারে বর্মা থেকে এলাম, তার ঠিক আগের ষ্টীমারে সত্যেনদা (মিত্র) কলকাতায় পৌঁছে খালাস হলেন। সুভাষও এলেন এক সপ্তাহের মধ্যে—চিকিৎসক বোর্ডের উপদেশে মুক্তি পেলেন।

বাংলার জেল প্রায় খালি। আমায় নিয়ে তুল্লো আলিপুর জেলে। সেখানে তখন পাঁচজন মাত্র আছেন। ইয়ার্ডের ফটকেই যাদুদার সঙ্গে দেখা। বেলা গোটা এগার, স্নান খাওয়া হয় নাই, সেলের দোতলা ব্লকের বারান্দায় পা দিতেই রবিবাবু (অনুশীলনের রবীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত) বলেন, কি ভূপেনবাবু, আর বলবেন শেয়ালের যুক্তি ?

কেন, কি হয়েছে ?

মহারাজ (ত্রৈলোক্য বাবু) বলেন নাই আপনাকে কিছু ?

হ্যাঁ, বলেছেন—ঠিক হয়েছে, আপনারা গোপন কাজ করবেন, আর আমরা কংগ্রেসের কাজ করব !

এই কথা তিনি বললেন আপনাকে ?

বললেন তো !

রবিবাবুর চোখে মুখে, হাতের পাতা উল্টানিতে হতাশার ভাব দেখা দিল। আস্তে ধীরে পরে শোনা গেল : দুই দল একত্রই কাজ করা হবে, গোপন আর প্রকাশ্য কাজ হিসাবে কোন ভাগাভাগির ব্যবস্থা নেই। অন্যান্য ব্যবস্থার ভিতর শেষ কথা স্থির হয়েছে, যদি দুই দল এক হয়ে কাজ না করতে পারে, সর্বচেষ্টার অবসানে আমাদের দিক

থেকে যাদুদা, আর ওঁদের দিক থেকে নরেনবাবু, অথবা নরেনবাবু যদি সক্রিয় রাজনীতিতে না থাকেন, তা হ'লে ত্রৈলোক্যবাবু রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ করবেন। মিলনভঙ্গের গুরুতর অপরাধের এই সমুচিত প্রায়শ্চিত্ত।

পরের কথা আগে ব'লে রাখার একটু প্রয়োজন আছে: বাংলার বিপ্লবী রাজনীতির ধারায় ১৯২৮ সাল থেকে ১৯৩০ সালের মধ্যে যে অত ওলটপালট হয়ে গেল, তার একটা কারণ এই মিলন ভেঙে যাওয়া। দু'টি দলেরই বহু কর্মী ১৯২৯ সালে যার যার দলের বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহ করেন, তার একটি কারণ এই। মিলন খোলাখুলিভাবে ভেঙে যায় ১৯২৮ সালের কলিকাতা কংগ্রেসের সময়। যাদুদা এর পর থেকে আর সক্রিয় রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ না ক'রে রাঁচিতে ডাক্তারী করতে থাকেন। নরেনবাবু মিলনের সময়ও রাজনীতির সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখেন নাই, ত্রৈলোক্য বাবুও কোনো সময়েই সক্রিয় রাজনীতি ছাড়েন নাই। মিলন ভাঙার ইতিহাস অন্যত্র আসবে।

রবিবাবু কিন্তু মিলন কামনায় এই সময় বিশেষ উদ্বুদ্ধ, তার পরিচয় নানাভাবে পেয়েছিলাম। নিজেদের দলের গলদ এঁরা সাধারণতঃ অপরের কাছে খুলে বলতে অভ্যস্ত নন। কিন্তু তখন ওঁদের দলের অপর যে-দুটি কর্মী আলিপুরে ছিলেন, তাঁদের একজনকে ওঁরা গুরুতর সন্দেহ করতেন—সেকথা যাদুদার ও আমার কাছে স্পষ্টই বলেছিলেন। পরে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পর আই. বি. যখন চট্টগ্রাম থেকে অনেক যুবককে পলাতক ধরবার উদ্দেশ্যে কলকাতায় নিয়ে আসে, তখন এই লোকটিকে দেখেছি, ঘুরে ঘুরে আমাদের কোনো কোনো প্রতিষ্ঠানের উপর নজর রাখতো।

প্রথম ইন্সিনে নরেনবাবুর মুখে, পরে বেসিনে হরিনারায়ণের

কাছে কিছু কিছু আভাস পেয়েছিলাম, ১৯২৪-২৫ সালে কি ক'রে বাংলার বিপ্লবী আদর্শনিষ্ঠার ইতিহাসে ভাঙন ধরে। এখন যাদুদার মুখে এর বিস্তারিত ইতিহাস শুনলাম। কাদা ঘেঁটে কিছু লাভ নেই। শুধু রাজনৈতিক দিকটার কথাই বলব—যাতে পরবর্তী রাজনৈতিক ইতিহাসের কিছু কিছু সূত্রের সন্ধান পাওয়া যাবে।

আগে বলেছি, ১৯২৩-২৪ সালের বিপ্লবী সংঘটন ও ধরপাকড়ের ভিতর আই. বি.র দুটি চর, মিহির ঘোষ ও টুনু সেনের হাত কতখানি ছিল। পরে এই দু'টি চরের দলের ভিতর এক বীভৎস দ্বন্দ্ব লাগে এবং তার ফলেও খুন ও খুনের চেষ্টা হয়। সেই সম্পর্কে অনেক যুবক ধরা প'ড়ে জেলে আসে। এটা ১৯২৪-২৫ সালের কথা।

১৯০৭-৮ সাল থেকে সুরু ক'রে ১৯১৫-১৬ সাল পর্যন্ত যে বিপ্লব প্রচেষ্টা চলে, সেই চেষ্টার অঙ্গস্বরূপ বাংলায় অনেক ডাকাতি ও নরহত্যা হয়। পরে ১৯২১ সাল থেকে যে-সব যুবক বাংলায় বিপ্লব-চেষ্টায় মাতে, বিশেষতঃ যারা মিহির ও টুনুর মতো লোকের বাক্‌চাতুর্যে প্রতারিত হয়ে দলে আসে, তারা ঐ খুন ডাকাতি গুলোই কেবল দেখেছিল, সে সবের পিছনে যে আদর্শবাদ ও আদর্শনিষ্ঠা ছিল তা দেখে নাই, দেখার প্রয়োজন মনে করে নাই, দেখাবার চেষ্টাও কম হয়েছে। তার ফল হয় সর্বনেশে। এই যে-সব যুবক জেলে আসে, আগেকার বিপ্লবীদের তুলনায় এরা এক সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। এই হিসাবে এদের বলব নতুন দলের লোক।

নতুনে পুরোনে সংঘর্ষ লাগলো প্রকাশ্যতঃ আলিপুর জেলে এবং সেটা সুরু হ'ল পুরোনোর এক দুর্বলতম অংশের সঙ্গে। এখান থেকে যে-আঘাত সুরু হ'ল সেই আঘাতে ইতিহাসের একটি যুগের আদর্শ ক্রমে ধ্বসে যেতে সুরু করলো।

পুরানোর এই দুর্বলতম অংশের যিনি মুখপাত্র তাঁর নাম ধরে নেওয়া যাক নিরুপম বাবু। আজ তাঁকে দুর্বলতম অংশের ভিতর ফেলবার হেতু আছে; কিন্তু একদিন অনেক বীর যোদ্ধার শিক্ষা-দীক্ষা দিয়েছেন ইনি। তাঁদেরই সঙ্গে যদি এঁর ফাঁসি হয়ে যেত, হয়তো তিনি দুর্বলতা দেখাতেন না, জাতকে প্রেরণাই যোগাতেন।

কিন্তু যখন ফাঁসিতে মরবার কল্পনা করেছেন, যুদ্ধে প্রাণ দেবার সাধনা করেছেন, বছরের পর বছর জেলবাসের যে অন্য ধরণের একটা সহন ক্ষমতা অর্জনের প্রয়োজন, সেদিকে হয়তো দৃষ্টি পড়ে নাই। তাই এর আগে দীর্ঘ মেয়াদে যখন জেলে যান, তখনও তাড়াতাড়ি খালাসের জন্য নানা কলাকৌশল অবলম্বন করেন—কর্তৃপক্ষের কাছেও, নিজের কাছেও নিজেকে ছোট করেন। ধরাপড়ার পরমুহূর্তেই এক বন্ধুর কাছে যে বুদ্ধি পরামর্শ পান, হ'তে পারে, তাই ছিল এই দুর্বলতার মূলে। আসল মূল অবশ্য অন্যত্র—বুদ্ধিতে সেন্টিমেণ্টে যেখানে বিচ্ছেদ ঘটে, মানুষের চরিত্রের দুর্বলতা দেখা দেয় সেখানে। সেন্টিমেণ্ট একচ্ছত্র হ'লে মানুষ হয় বেকুফ, আর বুদ্ধি যেখানে সেন্টিমেণ্টকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখায়, সেখানে সৃষ্টি হয় সয়তানের।

এবারে আমরা সবাই তো ধরা পড়ি, বলতে গেলে, একরকম বিনা কারণে। সেই যুক্তিতে, একদিনে হোক্, পাঁচদিনে হোক্,—যাঁরা এঁর সঙ্গে জেলে একত্র থাকতেন তাঁদের এই কথাটা বুঝিয়ে নিয়ে চলতে পারতেন, জেলে পচে লাভ কি? যতো তাড়াতাড়ি খালাস হ'তে পারি, সর্ব উপায়ে তার চেষ্টা করা উচিত। বুদ্ধি, বাকচাতুর্য ছিল এঁর অসাধারণ।

বুদ্ধি বাকচাতুর্যে অপর দিকে নতুন দলের মুখপাত্রটিও কম ছিলেন না। এঁর কথা অন্য সম্পর্কে আগে উল্লেখ করেছি। সেখানে নাম

বলেছি আশুতোষ মিত্র। সেখানে মিহির ঘোষ ছিলেন এঁর **friend, philosopher and guide.** জেলে ইনি নিজেই নিজেকে চালাতেন, এবং অপরকেও। শিক্ষিত মানুষের ভিতর কস্তুরী মৃগটি সব চেয়ে অশিক্ষিতমনা। ইনি ছিলেন একটি কস্তুরীমৃগ।

জেলখানায় এঁর ব্যক্তিগত কিছু দুর্বলতা প্রকাশ হয়ে পড়ার দরুণ বাংলা গভর্ণমেণ্ট তার সুযোগ নেয়। সেই উপলক্ষ্যে একে আলিপুর, প্রেসিডেন্সি ও দার্জিলিং জেলের ভিতর পর পর টানা হেঁচ্ড়া করতে থাকে। এই সব জায়গায় ভূপেন চাটার্জি, টেগার্ট ও লর্ড লিটন এঁর সঙ্গে বার বার দেখা করে। দেশবন্ধু এই সময় চ্যালেঞ্জ দিয়েছিলেন, '২২-২৩ সালে এমন কিছু বিপ্লবী কাজকর্ম হচ্ছিল না, যার জন্য এত ধড়পাকড়ের প্রয়োজন ছিল। ওরা সেই চ্যালেঞ্জের জবাব সংগ্রহ করে।

আশুতোষ যখন এ-জেল ও-জেল করছিলেন, তখন এঁর এক চ্যালা —ধরুন, নবীন তার নাম—পড়ে নিরুপম বাবুর সঙ্গে এক ঘরে। নবীন একেবারে মুগ্ধ হয়ে যায়। তার এই মুগ্ধতার সুযোগ নিয়ে নিরুপম বাবু আশুতোষের বিরুদ্ধেও যতো যা কিছু বলার ছিল নবীনকে বলেন। নিরুপম বাবুর রাগ ছিল—কারণ, আশুতোষদের ক্রিয়াকলাপের ফলেই এবারে ধরা পড়েছেন।

নিন্দাকে যদি বিদ্রূপে পরিণত করা যায়, তার শক্তি যে কতোগুণ বাড়ে, নিরুপম বাবুর মত তা বাংলায় খুব বেশী লোকে জানতো না। তিনি আশুতোষের দলের এবং তখনকার দিনের অন্যান্য তরুণ বিপ্লবীর নাম দিয়েছিলেন "তরণী স্নানের দল।" বয়স নবীনের যত অল্পই হোক্ খাতির তার সঙ্গে তখন জমজমাট। নিজেও মালকোছা মেরে কাপড় প'রে, নবীনকেও পরিয়ে, তার হাতে একগাছা লাঠি দিতেন, নিজেও

একখানা নিয়ে পাঁয়তারা ভেজে দু'জনে লাঠি খেলতেন আর নজরুলের ক্যারিকেচার ক'রে গান ধরতেন—

ওরে ও তরুণী স্থান
বাজা তোর প্রলয় বিষ্যাণ

বন্ধুরা খুব হাসতেন।

হঠাৎ একদিন নবীনের বদলীর হুকুম এল প্রেসিডেন্সি জেলে। আশুতোষ তখন প্রেসিডেন্সিতে। অনেকের অনুমান, এ বদলি আশুতোষের অনুরোধে। রায় বাহাদুর ভূপেন চাটুজ্যের ইতিপূর্বেই আনাগোনা সুরু হয়ে গেছে আলিপুর ও প্রেসিডেন্সি জেলে। খালাসের বা জেলের বাইরে অন্তরীণ হবার আগে আই. বি.র কর্মচারীরা রাজবন্দীদের মন পরীক্ষা করে—এই অজুহাতে ভূপেন চাটুজ্যে রাজবন্দীদের ওয়ার্ডের ভিতরেই যায়। কেউ কেউ বাইরে ইতিমধ্যে অন্তরীণ হয়েছেনও। আবার প্রেসিডেন্সি জেলে মনোমোহন ভট্টাচার্যের সঙ্গে যখন দেখা করতে চায়, তখন তিনি ব'লে পাঠান I'll kick him if I meet him. ভূপেন চাটুজ্যে তার জবাব দেয়, মুখের দোষেই তিনি জেলে থাকবেন।

এই আনাগোণার ফলে ভূপেন চাটুজ্যের সাথে কোন কোন রাজবন্দীর খাতির জমে উঠেছে। ছোটখাটো অনুরোধ তাদের ফেলা যায়না। আশুতোষ অনেক কিছুই করিয়ে নিতে পারেন, সকলের ধারণা।

নবীন প্রেসিডেন্সিতে বদলী হবার কিছুকাল বাদে হঠাৎ একদিন আশুতোষ আবার ফিরে এলেন আলিপুর জেলে। নিরুপমবাবু দাঁড়িয়ে ছিলেন তাঁদের ইয়ার্ডের দরজার বাইরে—আশুতোষ সামনে দিয়ে তাঁর ইয়ার্ডে যেতে যেতে বলেন, "কিরে বুড়ো…? কেমন

আছিস?" নিরুপম বাবুতো হতবাক! মাথায় হাত দিয়ে ধীরে ধীরে গিয়ে শুয়ে পড়লেন নিজের খাটটিতে। বন্ধুরা জিজ্ঞেস করেন, কি হ'ল? অনেকক্ষণ কোন কথাই নেই। তার পর বলেন, নব্‌নে ব্যাটা সব বলে দিয়েছে।

বলবে না? পুরোনো গুরু-চ্যালার সম্পর্ক যে! অত" বুদ্ধিমান লোক হয়েও নিরুপমবাবু এইটুকু ধরতে পারেন নাই। মনে করেছেন, নবীনকে হাত ক'রে ফেলেছেন।

এখন উপায়? আশুতোষ তো নিশ্চয় যতো রকম ক'রে পারে আমার সম্বন্ধে লাগিয়েছে ভূপেন চাটুজ্যের কাছে।

সুরু হয়ে গেল ভূপেন চাটুজ্যের খাতির পাবার প্রতিযোগিতা। আজ যদি আশুতোষের ইয়ার্ডে গিয়ে ভূপেন চাটুজ্যে আধ ঘণ্টা কাটিয়ে আসে, কাল নিরুপম বাবুর ইয়ার্ডে ওকে ধ'রে রাখা হয় এক ঘণ্টা। কোনো দিন সারাটা দুপুর বেলা একটা খাটে শুয়ে কাটিয়ে যায়। সেই সুযোগে সেই ইয়ার্ডের যত রাজবন্দী নিজের নিজের আবেদন নিবেদন নিয়ে তার কাছে হাজির হন। এ-ইয়ার্ডে বুড়ো দাদা ও-ইয়ার্ডে তরুণ দাদা তাঁদের হয়ে ওকালতি করেন।

আগেকার দিনে আদর্শ-নিষ্ঠার সঙ্গে আত্মসম্মান বোধটা জড়িয়ে ছিল। আজ এতখানি পর্যন্ত তা নাম্‌লো যে, ভূপেন চাটুজ্যে দুপুরে শোবার আয়োজনে যখন জামা খুলছে তখন চাকরকে পা ধোবার জল দিতে ব'লে রাজবন্দী নিজে গামছা খানা ধ'রে দাঁড়িয়ে থাকছেন।

এর পর যদি ছোট ছোট ছেলেরা—এদের শিক্ষাদীক্ষা ও আদর্শজ্ঞানের কথা উল্লেখ করেছি—গিয়ে বলে, স্যার, আমার মায়ের অসুখ, দুটো দিনের ছুটি দিন স্যার, অথবা আর পাঁচটা টাকা ভাতা বাড়িয়ে দিন স্যার, তা হ'লে তাদের দোষ দেবার কি আছে? সবাই

করছে, তাই আমিও করছি—এদের কাছে এইটেই চরম যুক্তি। সবার পেছনে চলা যে আদর্শের পেছনে চলা নয়, সবার থেকে নিজেকে ছোট করা, সে কথা তো এদের কেউ শেখায় নাই।

ইউরোপিয়ান ওয়ার্ডাররা পর্যন্ত রাজবন্দীদের ক্যারিকেচার করতে সুরু করলো। আফিসে গিয়ে টেলিফোন ধ'রে রায় বাহাদুরকে কি ভঙ্গীতে ডাকে, আর ওদিক থেকে রায় বাহাদুর যখন বলে, না হবে না, তখন এদিকে কি পরিমাণ ঘাড়টা কাৎ হয়ে যায় তাই দেখায় আর মুখে বলে, রায় বাহাদুর, রায় বাহাদুর একটি দিন স্যার।

এম্‌নি অনেক কিছু।

এর অপর দিকও কিন্তু ছিল। গোপীনাথ সাহার ফাঁসির উল্লেখ ক'রে এই ওয়ার্ডারদেরই একজন বলতো, হি ওয়াজ এ মা-আ-আ-ন (He was a man.) ফাঁসির জন্য যখন ডাকতে গেছে, দেখে গোপী ঘুমুচ্ছে। এক কথাতেই উঠে সঙ্গে চললো। কী সে পা ফেলার ভঙ্গী! বুক ফুলিয়ে ফাঁসির কাঠে দাঁড়ালো, নিজেই যেন সাহায্য করতে চায় ফাঁসির রশিটা গলায় বাঁধতে। কিন্তু ওর হাত দুটো তখন পেছনে বাঁধা।

দেওয়ালের দিকে লোক গেলে ঐ ওয়ার্ডাররাই দেখিয়ে দেয়, গোপীনাথের শবদেহ এখানে দাহ করা হয়েছিল। ওদের কাছেও ওটা যেন তীর্থক্ষেত্র!

ভূপেন চাটুজ্যের প্রসাদলাভের প্রতিযোগিতা প্রবল তখন। যাদুদাকে নিয়ে আসা হ'ল আলিপুরে। নিরুপম বাবুর এক সঙ্গী—যাদুদারও তিনি বন্ধু—বলেন, রায় বাহাদুরের সঙ্গে কথা বলনা একবার! যাদুদা পাশ কাটান! অবশেষে একদিন রায় বাহাদুরকে ডাকিয়ে আনা হ'ল, যাদুদাকে ডাকবার জন্যে এদিকে ওদিকে লোক

ঘুরলো। কোথাও সন্ধান পাওয়া গেল না। ভূপেন চাটুজ্যে বুঝলো। বলেই গেল, যাদু বাবু আমার সঙ্গে দেখা করলেন না!

বন্ধুটি তারপর বললেন, একবার দেখা করলে কি এমন দোষ হ'ত?

পুরোনো আদর্শনিষ্ঠা একটা স্ফুলিঙ্গ প'ড়ে যেন গর্জে 'উঠলো: "কি বলছেন আপনি! আপনাকে আমি শ্রদ্ধা করি। কিন্তু এ কি হচ্ছে? মুক্তি পাবার জন্যে আই. বি. র খোশামোদ? আমরাই না এতদিন বড়াই করেছি, আমরা শুধু একটা জাতের স্বাধীনতার সৈনিক নই, আমরা একটা নতুন জাতের স্রষ্টা ও শিক্ষকও? কিন্তু আজ আমরা জাতকে কি শেখাচ্ছি? রাজনৈতিক বন্দীরা যেখানে থাকবে, সেটা একটা দেবতার মন্দির। সেখানে এসে আই. বি. অফিসার আড্ডা দেবে, খাবার খাবে, আর রাজবন্দীর বিছানায় শুয়ে গড়াবে?

বন্ধুটির আর বাক্ সরলো না। এই বন্ধুর দল অল্প দিনের ভিতরই সব হয় খালাস হয়ে গেলেন, নয়তো অন্তরীণ হয়ে বাইরে চলে গেলেন।

অন্যপক্ষে, অনিবার্য কারণে তরুণদলে নীতির দিকে ভাঙনও যেমন দেখা দিল, অপরদিকে ঐ আলিপুর জেলেরই এক কোণে ছিল একটা শুকনো খড়ের গাদা, তাতে ঐ স্ফুলিঙ্গে আগুন ধরিয়ে দিল—

আগে বলেছি, জেলের বাইরে মিহির ঘোষ আর টুনু সেনের দল যখন বিপ্লব চেষ্টার নামে ভূতের নৃত্য সুরু করে দিয়েছে, চট্টগ্রামের সূর্য সেন তখন পলাতক অবস্থায় কলকাতায় এসে দলের কাজের ভার নিলেন। পুরোনো দুই দলেরই বহু কর্মী তখন বাইরে। "নতুন দল" ব'লে যাদের উল্লেখ করেছি, তারাও বহুক্ষেত্রেই এই দুই দলের সংস্পর্শেই রাজনীতির ক্ষেত্রে এসে জুটেছে, পরে পড়ে গেছে মিহিরের বা টুনুর বা রমনীর পাল্লায়।

যুক্তপ্রদেশের কিছু কর্মীও এই সঙ্গে এসে জুটেছিলেন। সূর্যবাবু এই সবের ভিতর থেকে কিছু লোক বেছে নিয়ে কাজ সুরু ক'রে দেন। কাজের ভিতর দিয়ে ছাড়া আদর্শপ্রীতি বাঁচিয়ে রাখা যাবে না, এই ধারণা তিনি বরাবর পোষণ করতেন।

কিন্তু এত অসৎ সংস্পর্শ যেখানে চারিদিকে, সেখানে গোপন কাজ চালিয়ে যাওয়া অত্যন্ত শক্ত। একথা বুঝতো ব'লেই মিহির ঘোষের মতো সব লোকদের দিয়ে ১৯২০।২১ সালে বাংলার আই. বি. বিপ্লবী দল গড়তে সুরু করেছিল। সূর্যবাবুর প্রেরণায় দক্ষিণেশ্বরে বোমা তৈরীর একটা জায়গা হয়েছিল। সেটা ধরা পড়ে যায়। সেই সম্পর্কে কলকাতায় শোভাবাজারে এবং আরও কোনো কোনো জায়গায় অনেক কর্মী ধরা পড়েন।

এঁদের ভিতর একটা শ্রেষ্ঠ অংশ ছিলেন উত্তরপাড়া বিদ্যাপীঠের সঙ্গে সম্পর্কিত। যুক্তপ্রদেশের, চট্টগ্রামের এবং বরিশাল শংকর মঠ ও দৌলতপুর সত্যাশ্রমের কর্মীও সব এঁদের ভিতর ছিলেন; দুই দলেরই লোক ছিলেন। আমি ব্যক্তিগতভাবে এঁদের ভিতর জানতাম বরিশালের অনন্ত চক্রবর্তীকে ও চট্টগ্রামের রাখাল দেকে। যেমন পবিত্র এঁদের চরিত্র, তেমনি দেহের শক্তি, তেমনি মনের নির্ভীকতা। অনন্তের কথা অন্যত্র উল্লেখ করেছি। চট্টগ্রামের রাখাল দে চারুর সঙ্গে প্রথম কুমিল্লায়, পরে উত্তরপাড়া বিদ্যাপীঠে ছিলেন। ১৯২৩ সালে আমি যখন ধরা পড়ি, তখন এঁর স্বাস্থ্য খুব খারাপ ছিল ব'লে সুন্দরবনের গোসভায় বন্ধু আশুতোষ রায় চৌধুরী ও অশ্বিনী রায়ের (পুরোনো দিনে এঁর নাম ছিল "চাচা") কাছে রেখে যাই।

বিভিন্ন স্থান থেকে কর্মী বেছে নিয়ে প্রায় সময়ই কাজ করা সম্ভব হয় না। যদি হ'ত, তা হ'লেই হয়তো এই দক্ষিণেশ্বরের বোমার

সম্পর্কে যে দলটি ধরা পড়ে, তেমনি দল বাংলার বিপ্লব ক্ষেত্রে বার বার দেখা দিত।

এঁদের সবাইকে মামলায় ফেলা সহজ হয় নাই। তারা অনেকে ডেটিনিউ হন। এঁদের ভিতর সুপরিচিত আর্টিষ্ট চৈতন্যদেব চট্টোপাধ্যায় এবং আরও কেউ কেউ যাদুদার সঙ্গে ছিলেন। যাঁরা মামলায় পড়েন এবং পরে যাঁদের সাজা হয় তাঁরা ছিলেন একটি ভিন্ন ইয়ার্ডে।

নিজেদের সহকর্মীরা সামান্য টাকা পয়সার জন্য, জিনিষপত্রের জন্য পরস্পরে ঝগড়া করেন, আই. বি.র কৃপাপ্রার্থী হন, খালাসের জন্য বা দু'পাঁচ দিনের ছুটির জন্য যে কোনোরকম হীনতা স্বীকার করতে প্রস্তুত—এসব দেখে শুনে লজ্জায় ঘৃণায় এঁদের মাথা কাটা যেত। কদর্যতা আরও অনেক দূর. গিয়েছিল। সে সবের উল্লেখের প্রয়োজন নেই। শুধু আদর্শের বিপর্যয়ের কথাই বলি। বিলিতি কাপড় কেন পরব না, বিলিতি সিগারেট কেন খাব না, বিলাসিতা কেন বাড়াব না—এসব প্রশ্ন বিপ্লবী দলে এই সময়ই প্রথম ওঠে—আলিপুর জেলে।

উপদেশে কোনো কাজ হ'ল না, নরকের শক্তি প্রবলতর। নিজেদের জীবন দিয়ে রাজনৈতিক কর্মীদের মান বাঁচাতে হবে, আদর্শকে জীয়ন্ত রাখতে হবে। ভূপেন চাটার্জির হত্যার আয়োজন হ'ল। হত্যা হয়েও গেল। আয়োজন এবং কাজ সবই করলেন দক্ষিণেশ্বরের বোমার মামলার আসামীরাই।

ডেটিনিউরা দু'একজন জানতেন মাত্র। দক্ষিণেশ্বরের আসামীদের ভেতর এমনি যাঁরা জানতেন এবং কাছে ছিলেন, তাঁদেরই একজনের ফাঁসি হয়ে গেল, আবার স্বহস্তে যাঁরা দুজন লোহার ডাণ্ডা বসান, তাঁদের হয় দ্বীপান্তর দণ্ড। যার যা-ই হোক, সবাই ফাঁসির কাঠে ঝুলবার উচ্চাশাতেই অনুপ্রাণিত হয়ে আয়োজন করেছিলেন এবং

হত্যার সময়ও সবাই উপস্থিত ছিলেন যেন ফাঁসি দেবার জন্যে কাউকে বেছে না নিতে পারে। কিন্তু এ মামলায় কি ভাবে সাক্ষী যোগাড় হয়, তা এখন প্রায় সবাই জেনেছেন।

এই মামলায় ফাঁসি হয় অনন্তহরি মিত্রের ও প্রমোদ চৌধুরীর এবং দ্বীপান্তর দণ্ড হয় হরিনারায়ণ চন্দ, ধ্রুবেশ চাটার্জি, অনন্ত চক্রবর্ত্তী ও রাখাল দের।

ভূপেন চাটার্জির পেছনে অমূল্য প্রাণ গেল। কিন্তু ভূপেন চাটার্জি ভূত হয়ে চাপলো বাংলার রাজনীতির স্কন্ধে।

অনেকের ধারণা, আই. বি.র কাজ বুঝি কেবল খবর সংগ্রহ ক'রে বিপ্লবী ধরা। কি মনোভাব থেকে বিপ্লবী উত্তেজনা আসে, ছড়িয়ে পড়ে, এবং দল গ'ড়ে ওঠে, সেটা বুঝে সেটাকে সমূলে নষ্ট করার চেষ্টাও যে আই. বি.র একটা কাজ—এ ধারণা আমাদের খুব বেশী লোকের নেই।

নিরুপম বাবু এবং আশুতোষ ও তাঁদের বন্ধুবান্ধবের কাছ থেকে অতীতের যতোরকম গল্প শুনেই ভূপেন চাটার্জি নিরস্ত হ'ল না, নিরুপম বাবু এবং আশুতোষ দু'জনার সঙ্গেই পুরোনো এবং নতুন বিপ্লবীদের মনস্তত্বের আলোচনা করে—কোন্ উচ্চাশা আগেকার দিনের শিক্ষা দীক্ষায় জাগাতো, কোন্ উচ্চাশায় নতুন কর্মীদের প্রেরণা জোগায়—তার সব কিছু জেনে নিল। তারপর শিষ্য গুরুর স্থলাভিষিক্ত হ'ল।

আশুতোষ কথা তুললেন, দাদারা আর কিছু করবে না, তরুণরা দাদাদের পেছনে ঘুরো না, নিজেরা দল গড়।

নিরুপম একেই শ্লেষের ভাষা দিলেন: "দাদা কোম্পানী"র সম্বল ছুটি ভাঙা পিস্তল, ওই দেখিয়ে ওরা দলপতিত্ব করবে।" এতটুকু বলার পর নিরুপম বাবুর আর কিছু বলার অবশিষ্ট থাকতো না। অপরের নিন্দা করতে পারতেন, কিন্তু কি করতে হবে তার সন্ধান দিতে

পারতেন না। তাঁর চেষ্টা তাই কখনও কোনোরকম দানা বেঁধে ওঠে নাই। পুরোনো বিপ্লবীদের সাধনাকে হেয় ক'রে তুলতে ইনি এবং এঁর বন্ধুরা প্রথমবারে জেল থেকে বেরিয়েই অনেকখানি সহায়তা করেছিলেন। এখন তাই আর একটু বাড়লো মাত্র। "দাদা কোম্পানী" কথাটা যাঁরা ব'লে বেড়াতে লাগলেন, তাঁরা কেবল বুঝলেন না যে, তাঁরা ভূপেন চাটুজ্যের অনুচরের কাজ করছেন।

অপরপক্ষে, আশুতোষ যে বীজ ছড়ালেন, তারই গাছগুলি ডালপালা মেলে বিশাল জঙ্গল হয়ে দাঁড়ালো পরবর্তী যুগে—Anti-Terrorist campaign-এর আমলে—অ্যাণ্ডার্সনের প্রেরণায় এবং বাংলার কম্যুনিষ্ট পার্টির সহায়তায়। অ্যাণ্ডার্সনের চরেরা এবং কম্যুনিষ্ট পার্টি জেলে এবং জেলের বাইরে পরস্পরের জন্য রিক্রুট সংগ্রহ করলো—পুরোনো বিপ্লবী দলগুলো ধ্বসে গেল। জনকতক লোককে টেনে নেওয়াতেই যে বিপ্লবী দল ম'রে গেল তা নয়। ভূপেন চাটার্জি-নিরুপম-আশুতোষ সফল এখানেই: বহুযুগের ইতিহাসে বাংলার বিপ্লবী সাধনা এদেশে যে এক নতুন আপন ভোলা আদর্শ-নিষ্ঠার দীপ জ্বেলেছিল, তাকে নিভিয়ে দিল।

আগেকার দিনের বিপ্লবীরা শিখতেন, শেখাতেন—নিজের জন্য কিছুই চাইনে—নাম না, যশ না, নেতৃত্ব না। এগুলো মানুষের last infirmityর ভিতর। এই last infirmityতে হাত পড়বার বহু আগেই ভূপেন চাটার্জি-আশুতোষের চেষ্টায় যেটা জাগতো, সেটা নেতৃত্বের আকাংক্ষা। এই আকাংক্ষা জাগিয়ে ১৯২৯-৩০ সালে সব দলের ভিতর বিদ্রোহের সৃষ্টি করলো। তার বহু উপলক্ষের ভিতর একটা উপলক্ষ হ'ল যুগান্তরে অনুশীলনে মিলন-চেষ্টা ব্যর্থতায় পরিণত হওয়া।

খালাসের পর আশুতোষের প্রচার কেন্দ্র রইলো মধ্য কলকাতায়।

কিন্তু তাঁর একটি মন্ত্র শিষ্য জুটলেন দক্ষিণ কলকাতায়—বোমার আর রিভলভারের আশায় যে আড্ডায় গিয়ে ১৯২৯-৩০ সালে দলে দলে কর্মীরা ধরা পড়লেন।

সে-কাহিনী পরে আসবে।

আপাততঃ এই অমৃত-সমান কাহিনী শুনতে শুনতেই ১৯২৭ সালের আগষ্ট মাস ফুরিয়ে গেল। এর ভিতর আমাদের মন পরীক্ষা করতে লোম্যান আর নলিনী মজুমদার বারকতক এল।

থাইসিসে আক্রান্ত—এই সন্দেহে জীবন বর্মা থেকে বাংলায় আসেন, আমি তখন বেসিন জেলে। ষ্টেট প্রিজনার ষ্টেট-প্রিজনারের কাছে চিঠি দিতে পারতো না। আমি জীবনকে এক চিঠি দেই বেসিন থেকে এবং সঙ্গে D. I. G., I. B.কে এক চিঠি দিয়ে অনুরোধ জানাই যেন ঐ চিঠিখানা পাশ করা হয়। লোম্যান তখন ডি. আই. জি.। সে আমার চিঠিখানা পাশ ক'রে আমায় এক ব্যক্তিগত চিঠি লিখে সেই খবর জানায়। আমি জীবনের উত্তর পেয়ে আবার যখন তাঁকে চিঠি দিই, ডি. আই. জি.কে চিঠি লিখবার বেলায়, আগের চিঠি পাশ করার জন্য ধন্যবাদ জানাই। মামুলি ধন্যবাদ। তবু আমি যে ডি. আই. জি.কে ধন্যবাদ দিতে পারি, তা ওরা ভাবতে পারে নাই। লোম্যান তা নিয়ে বন্ধুদের কাছে বলেছে, Bhupen Babu has thanked me. আলিপুর জেলের এত কাহিনী জানলে ধন্যবাদ দিতাম কিনা সন্দেহ। যাই হোক্, এর কিছু ফল উপভোগ করলাম—জীবনের সঙ্গে আলিপুর জেলে একবার দেখাও হ'ল। ডাক্তার হিসাবে যাদুদাকে দিয়ে তিনি এর আগে স্বাস্থ্যও পরীক্ষা করিয়ে গেছেন। এর পর জীবন গেলেন চিকিৎসার জন্য আলমোড়ায়, যাদুদা প্রদেশ থেকে বহিষ্কৃত হয়ে রাঁচিতে এবং আমি অন্তরীণে কালিম্পং-এ।

অন্তরীণে

কালিম্পং যাবার আগে দার্জিলিং-এ পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডের সঙ্গে দেখা করতে হ'ল। ম্যাকেঞ্জির সঙ্গে দেখা নাম মাত্র। ভদ্রতাই দেখাল। তারপর যে অফিসারটি সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল, তার সাথেই পাঠিয়ে দিল অ্যাডিশনাল পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডের কাছে। এই লোকটি বিখ্যাত সর্দার বাহাদুর ল্যাডেন লা। ১৯২৩ সালে যখন মেদিনীপুর জেলে যাদুদার সঙ্গে ভারতের উত্তর, উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্ব সীমান্তের ভূগোল বিবরণ পড়ি, সেই সময় থেকে লোকটির কিছু কিছু পরিচয় জানি।

একদিকে রয়াল জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটির ফেলো, অন্যদিকে তিব্বতে ও ভূটানে ইংরেজের অনুগত ও অনুগৃহীতদের সাথে যোগাযোগ রাখেন এবং তিব্বত ভূটানসহ ওদিককার সমস্ত সীমান্ত অঞ্চল সম্পর্কেই খবর সংগ্রহের কাজ করেন। এই উপলক্ষে বাংলা, বিহার, আসামের অনেক রাজনৈতিকের সঙ্গে একটা গোপন সম্বন্ধ আছে। তিব্বতে বেড়াতে যাবার আগ্রহ তখন আমার প্রবল—এই কথা পেড়ে আলাপ জুড়ে দিয়েছি, এমন সময় বিহারী মুসলমান এক ভদ্রলোক এলেন। পরিচয় করিয়ে দিলেন—সম্ভ্রান্ত বংশীয় এবং বিশিষ্ট কংগ্রেস ও খিলাফৎ নেতা ব'লে। আলাপের ধরণে বুঝলাম, ইনিও সংবাদ সংগ্রহে ওঁর সহায়তা করেন।

স্থানীয় একজন পুলিশ অফিসারকে সঙ্গে দিলেন, ঘুরে ঘুরে সহর দেখলাম। দিনটা মেঘে ঢাকা, ম্লান। সন্ধ্যার ঠিক আগে পৌছালাম Step Aside বাড়ীখানার সামনে। আপনা থেকে চোখে জল এল।

দুই বছর আগে—তখন আমি ইন্‌সিন্ জেলে—কে একজন পরিদর্শক এসেছেন, তাঁর সঙ্গে কথা বল্‌ছি—হাতে দিয়ে গেল Rangoon Gazette কাগজখানা। ইংরেজদের কাগজ, পাতা উল্টাতে একটা দুর্লক্ষ্য জায়গায় চোখে পড়লো দার্জিলিং-এর ছোট্ট একটী খবর : নামকরা রাজনৈতিক সি. আর. দাসের আজ এখানে মৃত্যু হয়েছে।

সেদিনকার সে ব্যথা না ফুটলো ভাষায়, না চোখের জলে—এ যেন গৃহকর্তা বাড়ীর সবগুলি মানুষকে একান্ত অসহায় ক'রে চ'লে গেলেন।

আজ সন্ধ্যায় Step Aside বাড়ীখানার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে মনে পড়লো সেদিনের কথা।

কালিম্পং বাজারের সামান্য নীচে ওখানকার খেলার মাঠ। আরও খানিকটা নীচে বুদ্ধিমন্ত সিং চেমজং-এর বাড়ী। তাঁর নীচের তলার দু'খানা ঘর আর একখানি বাথরুম আমার জন্য নির্দিষ্ট হয়েছে। পাহাড়ের গা কেটে ছোট্ট একখানি কাঁচাঘর তৈরী হয়েছে রান্নার জন্যে। যেদিন পৌঁছালাম—সেইদিনই এক পাচক নিযুক্ত হ'ল—প্রেম তার নাম, ছোট্ট ছেলেটি, লেপচা ক্রিশ্চিয়ান, বাবা কসাইয়ের কাজ করে। আমার আগে চৈতন্যদেব কালিম্পং-এ অন্তরীণ ছিলেন—তাঁরও ছিল ঐ ঘর আর ঐ পাচক। চৈতন্যদেবের "কালিম্পং-এর ভুটিয়া ভিখারী" সুপরিচিত ছবি।

সামনের বারান্দাটুকুতে বসি। কালিম্পং-এর মেঘলা দিন তখনও চলছে। বাড়ীখানার নীচে থেকে ধাপে ধাপে পাহাড় নেমে গেছে, আবার উঠেছে—প্রায় দশ বার মাইল দূরে ওদিককার উচ্চতম শীর্ষ এগার হাজার ফুট, গভীর জঙ্গলে ঢাকা সমস্ত পাহাড়টি, তারই ঘোলাটে কৃষ্ণনীলের বুক চিরে নেমেছে গলিত রজতের ঋজুরেখা—তিস্তার একটি ঝর্ণা।

হিমালয়কে আগে দেখেছি হরিদ্বারে, লছমনঝোলায়,—সেখানে যা দেখবার সুযোগ জোটেনি, তা এই প্রথম দেখলাম—আমেখলং সঞ্চরতাং ঘনানাং ছায়ামধঃসানুগতাং…শৃঙ্গাণি যস্যাতপবন্তি।

নতুন পরিচয় তখনও বিশেষ হয় নি, নিঃসঙ্গ জীবন। পরে যখন হল, তখনও নিঃসঙ্গতা তেমন কাটলো না। কিন্তু অন্তরে দৈন্য কিছু বোধ করিনে। রিক্ততার মাঝেই পূর্ণতার একটা স্বাদ রয়েছে যেন সমস্ত মনে প্রাণে। ব্যথা হয়তো আছে, কিন্তু ব্যথা নেই তো শূন্য মনে।

ডি. আই. জি.র মারফত অরুণদার, জীবনের চিঠি মাঝে মাঝে পাই।

১৯১৬-১৭ সালে পলাতক অবস্থায় মেদিনীপুর, বাঁকুড়া অঞ্চলে ঘুরতে গিয়ে দেখেছি অন্তরীণে আবদ্ধ দু'একজনের জীবন। গ্রামের ভিতর সঙ্গী নাই, সাথী নাই—আছে ঘরের পাশেই থানার অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত সরকারী কর্মচারী। অন্তর ব'লে বস্তুটি এদের প্রায় শূন্য। একযুগের শিক্ষাসংস্কৃতি ভেঙে পড়েছে, অপর যুগেরটাও পায়নি। রাষ্ট্রাধিপতি ইংরেজ—শিক্ষা সংস্কৃতি, সব কিছুতে তারাই যেন শ্রেষ্ঠ। তাদের কিন্তু খুব উঁচুপদের দু'একজনকে বাদ দিলে আর যারা, তারা অন্তরের শূন্যতায় সময়কে ভরে রাখে খেলাধূলোয়, মদে আর নারীতে। ইংরেজের সাথে সাথে খেলাধূলো আমাদের দেশে ঢুকেছে বেশীর ভাগই সহরে। ওদের অনুকরণে দেশী কর্মচারীরা—মদের মূল্য যারা পোষাতে পারে, তারা খায়। নীচের দিকের কর্মচারীদের ভাগ্যে সেটা সব ক্ষেত্রে জোটে না। বাকি দিকের ব্যভিচারটা যেখানে অপেক্ষাকৃত সহজ-আয়ত্ত, অন্তরীণে রাখবার স্থান অনেকক্ষেত্রে সেখানেই বেছে নেওয়া হ'ত—বিশেষ ক'রে অল্পবয়স্কদের জন্য—যাদের দলের ভিতর

শিক্ষাদীক্ষা বেশীদূর অগ্রসর হবার আগেই ধরা হয়েছে। এসব দিকে টেগার্ট-লোম্যানের শিক্ষক ছিল ভূপেন চাটুজ্যে নলিনী মজুমদারের দল। আজও এই চাটুজ্যে-মজুমদাররাই আসল শাসক !

জেলের বাইরে অন্তরীণের জীবন এই আমার প্রথম। পুলিশের ভিতর বন্ধু জোটে নাই—তাদের সঙ্গে সম্পর্ক সকালে একবার, বিকালে একবার হাজরে—থানার ঘরে চেহারাটা দেখিয়েই বেরিয়ে পড়ি।

বন্ধু জুটলো স্থানীয় বাঙালীদের ভিতর—দু'একজন আমার সমবয়সী, অধিকাংশ ছোট। বাঙালীও বেশী নেই।

পণ্ডিত শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীর বন্ধু ডাঃ গ্রেহাম তখনকার বাংলায় সুপরিচিত ছিলেন। এই পাদ্রি ওখানকার "কালিম্পং হোমে"র প্রতিষ্ঠাতা। এই "হোমে"র প্রভাবে স্থানীয় লেপ্‌চারা অনেকে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেছে। লেপ্‌চা মেয়েরা সুন্দরী ব'লে পরিচিত। কালিম্পং হোমের ছেলে ও মেয়ের দল ও ওখানকার লেপ্‌চা মেয়েদের নিয়ে একটা আলাদা আবহাওয়া। স্থানীয় বাঙালী ছেলেরাও এই আবহাওয়া উপভোগ করে।

এই ধরণের সঙ্গী সাথী আমার জীবনে এই প্রথম। আমরা বিপ্লবী দলে যারা মানুষ হয়েছি, কালিম্পং-এই প্রথম অনুভব করলাম, তাদের গড়ে উঠবার সমস্ত আবেষ্টনটিই আলাদা। দেশের ছেলেরা সাধারণতঃ যে অবস্থার ভিতর দিয়ে গড়ে ওঠে, তার সাথে এর কোনো সাদৃশ্য নেই।

যে সব বিপ্লবী কর্মীরা অন্তরীণে গিয়ে একটা উচ্ছৃঙ্খল জীবনের ভিতর পড়েছেন, তাঁদের অনেক নিন্দা শুনেছি, করেছিও। তাঁদের সঙ্গে আজ নিজের অবস্থার তুলনা করি। কাজকর্ম নিজে সৃষ্টি না ক'রে নিলে কোথাও কিছু নেই। পড়াশুনোও তাই। আমার সমাজ

থেকেও আজ আমি দূরে—লোকলজ্জার ভয় নেই। যেসব বন্ধুরা সারাদিন আমারই ঘরে বসে তাস পিটছেন, চা সিগারেট খাচ্ছেন, অবাধে আমি সর্বব্যাপারেই তো তাঁদের সহচর হ'তে পারি।

মনে হয়, এটা সুযোগ সুবিধার কথা নয়, প্রবৃত্তি অপ্রবৃত্তির কথা। এই প্রবৃত্তি অপ্রবৃত্তি কোনো পরীক্ষার সামনেও পড়ে না যদি হৃদয়ের বন্ধন থাকে অন্যত্র। তাছাড়া, আছে নিজের সম্মানবোধ, আদর্শের সম্মানবোধ। নিছক কর্তব্য বোধ জীবনের অনেক ঝড়ঝাপটায় সামাল দিতে পারে না, যতক্ষণ না তার মূল রস টানে অন্যত্র থেকে। এই সত্য, এই তত্ত্ব থেকে সেকালে আমাদের বিপ্লবী জীবনের গোড়ায় ধর্মসাধনার উপর জোর দেওয়া হ'ত। এতে ক'রে যেমন ফাঁসি অত্যাচারের সামনে দাঁড়াবার জন্য মানুষ তৈরী হবে, তেমনি কামিনী কাঞ্চন সম্পর্কে উদাসীন থেকে সমাজে চরিত্রবান পুরুষ ব'লে পরিচিত হবে এবং চরিত্রের বলে অপরকে স্বাধীনতাকামী হ'তে উদ্বুদ্ধ করবে—এই ছিল প্রথমযুগের বিপ্লবী নেতাদের ধারণা।

দেশের প্রতি কর্তব্য করতে তখন বলা হ'ত ভগবান বা ব্যক্তিগত মুক্তি লাভের উপায় হিসাবে। কিন্তু একান্তভাবে এই নিজের মুক্তির সন্ধান থেকে স্বার্থের সন্ধান দূরের বস্তু নয়—বিশেষ ক'রে সাধ যখন দূর থেকে দূরের দিগন্তে মিলিয়ে যেতে থাকে, আর সাধনা বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে স্তিমিত হয়ে আসে। এতে পরিণামে অনেক ক্ষেত্রে আমাদের জীবনে চূড়ান্ত সংকীর্ণতা টেনে এনেছে।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যমূলক প্রাচীন সমাজব্যবস্থার ভিত্তি টুকরো টুকরো হয়ে গেছে—সে-যুগের সেই ধর্মের সাধনা আমাদের বৃহত্তর সত্তার আধ্যাত্মিক মৃত্যুর দিনে আজ আর আমাদের কোনো কাজে লাগলো না। আমাদের জীবনে দেখেছি, যতীনদা স্বাধীনতার ও ধর্মের সাধনার

সঙ্গে মানুষের প্রতি, সহকর্মীদের প্রতি আকর্ষণকে সুস্থ, সবল রাখতেই উৎসাহ দিয়েছেন। অনেক ক্ষেত্রে, এর ফলে, সহকর্মীদের নিয়ে এক একটা যেন পারিবারিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছে, স্বার্থের গণ্ডী প্রসারিত হয়েছে, সংকীর্ণতা লজ্জা পেয়েছে। এটা ছিল আমাদের অনেকের জীবনে যৈন একটা third line of defence এবং এই তিন লাইনে কতকটা মেশামেশি হয়ে আমরা অনেকে সাধারণ সমাজে হয়ে পড়েছিলাম কতকটা বেখাপ্পা।

আজ নিজের ভিতর তাকিয়ে দেখি, প্রবৃত্তিই আলাদা হয়ে গড়ে উঠেছে। বন্ধুরা যাতে রস পান, আমি তা'তে পাইনে। অথচ তাঁরা সে রস উপভোগে সতত যত্নবান ব'লে যে, তাঁদের প্রতি একটা অবজ্ঞা বা করুণা জাগে, তা-ও নয়। বরং তাঁদের আনন্দে হাসি। ভেবে দেখি, সমাজের অধিকাংশ লোকের প্রবৃত্তি যেভাবে গড়ে উঠেছে বা ওঠে, তাতে অধিকাংশকে অপরাধী মনে করবার তো অর্থ হয় না। মানব-মনের অভিব্যক্তির এ একটা স্তর মাত্র।

ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাববার অবসর প্রচুর। কি করব? আলোচনা ইনসিনেও হয়েছে অরুণদার সাথে, আলিপুরে হয়েছে যাদুদার সাথে।

আমরা যখন বর্মার জেলে, সেই সময়ের ভিতর বাংলার জেলে যুগান্তরে-অনুশীলনে মিলন-ব্যবস্থা অনেক দূর এগিয়েছে। আমি যতোদিন জেলের বাইরে—অন্তরীণে, মনোরঞ্জনদা তখন মুক্ত, কিন্তু কলিকাতা, ২৪ পরগণা, হাওড়া ও বরিশাল—এই কয়টি জায়গায় ঢুকতে পাবেন না। তিনি থাকেন হুগলি বিদ্যামন্দিরে এবং ঐ কয়টি জায়গা ছাড়া অন্যত্র ঘুরে ফিরে মিলন-ব্যবস্থাকে রূপ দেন।

জেলে ব'সে মিলন-ব্যবস্থার ভিতর দু'টি কথা হয়েছে—নেতিমূলক

কথা। প্রথম কথা, "কর্মীসংঘ"কে বাঁচিয়ে রাখা হবে না। দ্বিতীয় কথা, কম্যুনিষ্টদের সঙ্গে যোগ দেওয়া চলবে না।

নীতি হিসাবে কোন্‌টি ভালো, কোন্‌টি মন্দ—সেটা আলাদা কথা এবং প্রকাশ্য কথা। অপ্রকাশ্য, আসল কথা যেটি—সেটি মিলনের খাতিরে চাপা রইলো। প্রথমটিকে ধ'রে নেওয়া হ'ল সুরেশ দাসের দল, এবং দ্বিতীয়টিকে এম. এন. রায়ের দল। মিলন হয় সমানে সমানে। এ দু'টিকে অপাংক্তেয় না করলে এক পক্ষকে গোড়াতেই এতটা শ্রেষ্ঠ বলে মেনে নিতে হয় যে অপর পক্ষকে সেখানে মিলতে যেতে হয় অনেকখানি মাথা নীচু ক'রে—অন্ততঃ এই ভাবটি ছিল একপক্ষের মনে। এই মিলন-চেষ্টার ভিতর তাই দলের মোহই বড়ো হয়ে ফুটলো, দেশের স্বাধীনতার জন্য শক্তি সঞ্চয়ের চেষ্টা চোখের সামনে থেকে অনেকখানি স'রে গেল। বিরুদ্ধ-ধর্মী দু'টি দলের এই মিলন চেষ্টায় শেষ পর্যন্ত বাংলার বিপ্লবী সাধনাকে তাই পঙ্গু করলো।

এখানে কর্মী সংঘ ও কম্যুনিষ্ট পার্টির উত্থানের গোড়ার কথা কিছুটা বলা অবান্তর হবে না।—

১৯২৩ সালে আমাদের ধরপাকড় এবং ১৯২৪ সালে অর্ডিন্যান্স ক'রে সুভাষচন্দ্র, সত্যেন মিত্র প্রভৃতির গ্রেপ্তার থেকে দেশবন্ধু বুঝেছিলেন, বিপ্লবান্দোলন দমন করার কথা ইংরেজ সরকার একটা বাজে অজুহাত হিসাবে তুলেছে, যুগান্তর দলের কর্মীরা বাংলার কংগ্রেস ও স্বরাজ্যদলের সংগঠনকে শক্তিশালী ক'রে না তুলতে পারে—এইটিই ছিল ওদের আসল মতলব। তাই ১৯২৪-২৫ সালে দেশবন্ধু বাংলা কংগ্রেসের যে কার্যকরী সমিতি গড়লেন, তাতে যুগান্তরের যতো কর্মীকে সম্ভব স্থান দিলেন।

দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর তাঁর অনুগামীরা দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে

পড়লেই। একদিকে দেশপ্রিয় জে. এম. সেনগুপ্ত, অপরদিকে শরৎচন্দ্র বোস, নলিনীরঞ্জন সরকার, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, নির্মলচন্দ্র চন্দ্র ও তুলসীচন্দ্র গোস্বামী—এই Big Five বা "পাঁচ চাঁইয়ের" দল। ঝগড়া সুরু হ'তেই গান্ধীজি দেশপ্রিয়ের মাথায় "তিন মুকুট" (Triple Crown.) পরিয়ে ঝগড়ার অবসান করতে চাইলেন—তাঁকে যুগপৎ প্রাদেশিক কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট, বাংলা কাউন্সিলে কংগ্রেস দলের নেতা ও কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র ক'রে দিয়ে গেলেন। কিন্তু গান্ধীজিও বাংলা ছাড়লেন, ঝগড়াও নিত্যকার বস্তু হয়ে উঠলো।

এই ঝগড়ায় নেতারা বিভিন্ন দলের কর্মীদের আজ একটুক্রোকে এদিকে, কাল আর একটুক্রোকে ওদিকে টানেন—দেশেরও অনিষ্ট হয়, কর্মীদেরও সর্বনাশ হয়। আমাদের দলের প্রবীণদের মধ্যে বাইরে ছিলেন সুরেশ দাস। তিনি এই অবস্থাটার অবসানের জন্য "কর্মীসংঘ" করলেন। অনুশীলন দলের লোকরাও এতে যোগ দিলেন।

যে-দোষ জাতির চরিত্রে ঢুকেছে, তাকে এমন ক'রে ঠেকিয়ে রাখা যায় না। তবু সুরেন ঘোষ ও হরিকুমার চক্রবর্তীর নেতৃত্বে যে বিরাট দল তারকেশ্বর সত্যাগ্রহের সময় গ'ড়ে উঠেছিল, সুরেশবাবু তাদের অনেককে বেশ কিছুদিন একত্র ক'রে চালাতে পেরেছিলেন। নেতারা তবু থাবলা মেরে এক একজনকে মাঝে মাঝে সরিয়ে নিতেন।

ইতিমধ্যে, অপর দলের যাঁরা কর্মীসংঘে যোগ দিয়েছিলেন, তাঁদের প্রধানদের মধ্যে একজন সংঘের অর্থ থেকে কিছু টাকা ধার নিলেন। অপর দিকে সুরেশবাবু যে দলের লোক, তার আদর্শ-নিষ্ঠা তখনও স্তিমিত হয় নি—দলের অর্থের অপব্যয় হ'তে দিতে সুরেশ বাবু অপারগ। তিনি টাকার তাগিদ দিলেন। ফলে বিবাদ পেকে

উঠলো। এবং অপর দলের প্রধানটি সুরেশ বাবুর নামে নালিশ পাঠালেন জেলখানায় নিজের দলের নেতাদের কাছে।

কর্মীসংঘের আসল অপরাধ এখানে।

কিন্তু ব্যক্ত অপরাধ অন্যত্র। কর্মীসংঘ সুরেশবাবু চালাতে চালাতে অমরদা (চাটার্জি) খালাস হয়ে এলেন। সুরেশ বাবু সংঘের নেতৃত্ব তাঁর হাতে সমর্পণ করলেন।

হিন্দুমহাসভা বাংলায় এই সময় কিছু প্রবল। এবং অমরদার সাথে হিন্দুমহাসভার পুরোনো লোকদের খানিকটা ঘনিষ্ঠতা ছিল। অপর দিকে, উপেনদা (ব্যানার্জি) অমরদার উপদেষ্টা। উপেনদা জেল থেকে বেরিয়ে "দাদা কোম্পানী" শব্দটি চালু করলেন এবং বক্তৃতায় বিপ্লবীদের নিন্দা গাইতে লাগলেন।

মোটের উপর জেলখানায় কর্মীসংঘ সম্পর্কে নিন্দা শোনা গেল— ওটা হিন্দুমহাসভা ঘেঁষা এবং বিপ্লবীদের শত্রু। আমি বর্মা থেকে ফিরে আলিপুরে এসে দেখলাম, যাদুদা এটা মেনে নিয়েছেন ; এবং সিদ্ধান্ত হয়েছে, কর্মীসংঘের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা হবে না। অপরদলের রবি বাবু (রবীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত) এই মতের উগ্র প্রচারক এবং আলিপুরে যাদুদার পরামর্শদাতা, যেমন ছিলেন মেদিনীপুরে মনোরঞ্জনদার।

যাদুদা এবং মনোরঞ্জনদা দু'জনেরই তখন ধারণা, মিলনের জন্য **no sacrifice is too great.**

এর পর কম্যুনিষ্ট দল পত্তনের কথা।

বোধ হয় ১৯২২ সালের গোড়ায়, জার্মানী থেকে এম. এন. রায় এক ব্যক্তিকে পাঠান এখানে তাঁর বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন ক'রে অথবা তা সম্ভব না হ'লে অন্য যে কোন উপায়ে এদেশে একটি কৃষক

শ্রমিকের বিপ্লবীদল গড়তে। এই ব্যক্তি বোম্বেতে পুরোনো পরিচিত এক বাঙালী বন্ধুর মারফত কয়েকজনের সঙ্গে যোগাযোগ ক'রে কলকাতায় আসেন, কিন্তু এখানে এম. এন. রায়ের পুরোনো বন্ধুরা এই ব্যক্তির সঙ্গে দেখা করতে রাজী হন নাই—একথা পূর্বে উল্লেখ করেছি। আমি তখন কুন্তল ও চারুকে নিয়ে যশিধিতে। কয়েকদিনের জন্ত কলকাতায় এসেছি, সাতুদা (সাতকড়ি ব্যানার্জি) বলেন, এত বছর বাদে নরেন (এম. এন. রায়) এত বিপদ আপদের ভিতর একজন লোক পাঠাল, তার সঙ্গে কেউ দেখাও করবে না? যাদুদার অনুমোদন নিয়ে আমি ডাঃ টি. এন. রায়ের বাড়ীতে এই লোকটির সঙ্গে দেখা করি।

ডাঃ টি. এন. রায় ও ডাঃ এস. সি. সেনগুপ্ত (দন্ত চিকিৎসক) তখন এক বাড়ীতেই থাকতেন। ওঁদের সামনেই প্রথম কথা হ'ল। লোকটি তো চাল দিতে সুরু করলো। বলে, এম. এন. রায় কে? কে তাকে চেনে? লেনিনের কাছে যাতায়াত আমারই…ইত্যাদি।

বুঝলাম, ধাপ্পা। ধমক দিয়ে বলি, আপনি কে মশাই? আপনার credentials কি? কে আপনাকে চেনে?

ব'লে উঠে আসছি—বাইরে এসে হাত ধরলো: কিছু মনে করবেন না—রায়ই আমায় এই রকম বলতে বলেছে।

এর পর অনেক কথাই হ'ল। দেখলাম, যতোদিন যাদুদা প্রভৃতি কেউ ওর সঙ্গে দেখা করেন নাই, ততোদিন সে চুপ করে বসে থাকে নাই—মৌল'না আবুল কালাম আজাদের পুরোনো দলের সঙ্গে সম্পর্কিত অনেকের সঙ্গে আলাপ করেছে।

আমার সঙ্গে যাঁদের সে আলাপ করিয়ে দিলে, তার মধ্যে প্রধান মজাফর আহমেদ। আলাপ ক'রে ভাল লাগলো—শান্ত মানুষ, একনিষ্ঠায় পুরোনো বিপ্লবী কর্মীদের সঙ্গে তুলনীয়।

ব্যবস্থা হ'ল, তাঁর কাছেই চিঠিপত্র আসবে, তিনি যে সব ঠিকানা দিয়েছেন, সেই সব ঠিকানাতেই কাগজ পত্র আসবে। আমার কোনো চিঠি দিতে হ'লে তাঁর কাছেই দেব এবং তিনিও কোনো চিঠি দিতে হ'লে আমায় দেখিয়ে দেবেন, অথবা আমার সঙ্গে আলোচনা ক'রে লিখবেন।

যাদুদা এই ব্যবস্থা সমর্থন করলেন। মজফর আহমেদ এই ব্যবস্থার কখনও অন্যথা করেন নাই।

মজফরের সঙ্গে এই ব্যবস্থা হয়ে যাবার পরই এম. এন. রায়ের লোকটি (এখন থেকে এর নাম বলব "কুমার"—কারণ, এম. এন. রায়ের চিঠিতে এর সম্বন্ধে "কুমার" ব'লেই উল্লেখ থাকতো) ইউরোপ চলে যায়।

শুধু যাদুদা নন, আমাদের ভিতর তখন যাঁরা কলকাতায় সক্রিয় রাজনীতিতে ছিলেন—অমর চ্যাটার্জি, উপেন ব্যানার্জি, সতীশ চক্রবর্তী, সাতকড়ি ব্যানার্জি, মনোরঞ্জন গুপ্ত, ভূপতি মজুমদার, অতুল ঘোষ, অরুণ গুহ, জীবন চ্যাটার্জি, কুন্তল চক্রবর্তি, চারু ঘোষ—সবাই ক্রমে এম. এন. রায়ের সঙ্গে এই যোগাযোগের কথা জানলেন এবং অনেকে মজাফর ও তাঁর বন্ধুদের সঙ্গে পরিচিত হলেন। এম. এন. রায়ের চিঠিতে অনেক সময় অমরদার নাম অনুযায়ী আমাদের উল্লেখ থাকতো চ্যাটার্জি এণ্ড কোং ব'লে। ভূপতিদার সঙ্গেও এম. এন. রায়ের পাড়াগেঁয়ে সংস্কৃত ভাষাতে চিঠিপত্র বিনিময় হ'ত। সব চিঠিই অবশ্য যেত মজাফরের মারফতেই।

কুমার ফিরে যাবার কিছুদিনের মধ্যেই মজাফর কলেজ ষ্ট্রীটে এক আফিস খুলে কাজি নজরুল ইসলামকে সেখানে বসালেন। কাজি "ধুমকেতু" বের করলেন। কী তখন উদ্দীপনা! দু'চার সংখ্যাতেই সহর গরম হয়ে উঠলো।

আমাদের আড্ডা জমে ওখানে। শিশুর মতো চরিত্র কাজির। হৈ-হল্লার অন্ত নেই। আমি তখন রুগ্ন চারুকে নিয়ে থাকি শ্যামবাজারে। এক একখানা কাগজ বের হ'তেই এনে রোগীকে একটানা পড়ে শোনাই। কাজি অনেক সন্ধ্যায় অত পথ হারমোনিয়াম ঘাড়ে ক'রে আসেন রোগীকে গান শোনাতে।

কাগজ বের হবার অল্পদিন বাদেই ভূপতিদা প্রায় যেচে কাগজ চালাবার অনেকখানি ভার নিলেন। কাজি ধরা পড়তে যশোরের পুরোনো কর্মী অমরেশদাকে (কাঞ্জিলাল) এনে জোটালেন ভূপতিদাই।

কুমার ফিরে যাবার কিছুদিন বাদে তারই মতো গোপনে এসে পৌঁছাল অবনী মুখার্জি। সে বলে, ইণ্টারন্যাশনালের প্রতিনিধি সে; এম. এন. রায় ধাপ্পাবাজ। আমাদেরই এক বন্ধুর বাড়ীতে উঠেছে—জার্মানীতে তাঁর সঙ্গে আলাপ। মনোরঞ্জনদা, ভূপতিদার সঙ্গে দেখা। ভূপতিদা অবনীকে সিঙ্গাপুরে বন্দী থাকা কাল থেকেই ভালভাবে চেনেন। এঁরা চেষ্টা করেন ওকে আবার দেশ থেকে বের ক'রে দিতে। ও যাবে না। ইতিমধ্যে ক্যালিনিনের (অথবা ক্যামেনেফের?) এক চিঠি এল। তার মর্ম এই—মুখার্জি ব'লে একটি লোক নিজেকে ইণ্টারন্যাশনালের প্রতিনিধি ব'লে এবং মিঃ এবং মিসেস রায়ের বিরুদ্ধে ভারতে প্রচার ক'রে বেড়াচ্ছে। এ লোকটি কেউ নয়, এম. এন. রায়ই ইণ্টারন্যাশনালের পক্ষে কাজ করছেন।

যাবার পাথেয় পর্যন্ত নিয়েও লোকটি যাবে না। শেষ পর্যন্ত ভূপতিদার সঙ্গে প্রায় হাতাহাতি। কিন্তু আমাদের দেশে দলের অন্ত নেই। আমাদের আশ্রয় থেকে যখন সে বেরিয়ে পড়তে বাধ্য হ'ল, অপর একটি দল তাকে লুফে নিল।

ভূপতিদা ছাড়া আর যাঁরা এই সময় বাংলায় কম্যুনিজমের পত্তনে হাত দিলেন, তার ভিতর উপেনদার নাম উল্লেখযোগ্য। জার্মানী থেকে এম. এন. রায়ের কাগজ আসতো ভ্যানগার্ড। এর ভাবগুলো উপেনদা "আত্মশক্তির" মারফত তো প্রচার করতেনই—অমৃতবাজারেও তখন তিনি সহকারী সম্পাদক, তারও সম্পাদকীয় প্রবন্ধে ঐকথাগুলোই একটু অদল বদল ক'রে চালাতেন। অমৃতবাজার পত্রিকার কর্তৃপক্ষ বেজায় হুঁশিয়ার। উপেনদাকে ওখান থেকে সরতে হ'ল। উপেনদাও হুঁশিয়ার কম নন। বের হবার বেলায় সাথে নিয়ে বের হলেন মৃণালকান্তি বোসকে ও কিশোরীলাল সরকারকে। তখন দেশবন্ধু Forward বের করবার সংকল্প করছেন। একরকম স্থির হয়ে রইলো, এঁরা সেই কাগজে যোগ দেবেন।

কম্যুনিজমকে মনে প্রাণে গ্রহণ করেছিলেন আমাদের ভিতর জীবন। এই গ্রহণের ভিতর এম. এন. রায়ের প্রতি ব্যক্তিগত টানও যেমন ছিল, থিওরিটাকে বুঝবার চেষ্টাও তেমনি ছিল। কি ক'রে দেশে বিপ্লবকে জাগানো যায়, আমাদের সমস্ত বিপ্লবী জীবন ধ'রে সেই পথই খুঁজেছি। কাজেই কোনো নতুন আইডিয়াকে বর্জন করার চেষ্টা আমাদের দিক থেকে কখনও হয় নাই। কিন্তু ঢাকা থেকে জিতেন কুশারি নালিশ জানালেন, জীবন গোপনে ছেলেদের Vanguard ও International Press Correspondence পড়ান। আমি তখন পূর্ববঙ্গ সফরে যাচ্ছি। মনোরঞ্জনদা এই নালিশ সম্পর্কে আমায় অনুসন্ধান করতে বললেন। নৈষ্ঠিক গান্ধীবাদের প্রতি অনুরক্তি ছাড়া জিতেন বাবুর নালিশের যুক্তিসহ কোনো ভিত্তি খুঁজে পেলাম না। যাদুদাকে, মনোরঞ্জনদাকে তা-ই জানিয়ে দিলাম।

ইতিমধ্যে ইণ্টারন্যাশনালের এক মিটিং-এর তারিখ আসছে। এম. এন. রায় লিখলেন, লেনিন ভারতের বিপ্লব আন্দোলনকে সাহায্য করবার বিরোধী—কারণ, এ আন্দোলন শ্রমিক কৃষকের আন্দোলন নয়। এম. এন. রায় তাঁর দিকে হয়ে ভারতের আন্দোলনকে সাহায্য করার প্রস্তাব সমর্থন করতে পারে, এমন দু'জন ডেলিগেট পাঠাতে বললেন। সময়মতো কাউকে পাঠানো সম্ভব হবে মনে হ'ল না। তখন দলের তরফ থেকে এক থিসিস পাঠানো হ'ল। সে থিসিসের মর্মকথা এই: ভারতের মতো শস্তা কাঁচামালের এবং জীবিকার নিম্নমানের কোটি কোটি লোকের দেশ যদি ব্রিটেনের মতো এক ক্যাপিট্যালিষ্ট দেশের অধীনে থাকে, তা হ'লে শ্রমিক কৃষকের সোভিয়েট দেশেরই টি'কে থাকা শক্ত। সেই হিসেবেও ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনকে সাহায্য করা উচিত। এবং ভারতের গণ-আন্দোলনও অনতিবিলম্বে কৃষকশ্রমিকের আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়ে উঠতে বাধ্য।

ইতিমধ্যে কুমার আর একবার এদেশে আসে ও Regulation III তে ধরা পড়ে। মজাফর আহমেদও ধরা পড়ে যান। আমি থিসিসটি সুভাষচন্দ্রকে দেখাই। তিনি উৎসাহিত হয়ে ওঠেন। এবং তিনিই এটা গোপনে রায়কে পাঠাবার ভার নেন।

এর কিছুদিনের মধ্যেই আমরা সবাই ৩নং রেগুলেশনে বন্দী হই। পরে জেনেছিলাম, রায় এ-থিসিস কাজে লাগিয়েছিলেন।

এর পর কানপুর ষড়যন্ত্র মামলায় বিচার অন্তে মজফর প্রভৃতি খালাস হয়ে যখন Workers' and Peasants' Party করে দাঁড়ান, তখনও আমরা জেলে।

জেলখানায় যুগান্তর অনুশীলনে মিলনের বেলায় স্থির হ'ল—এ-পার্টির

সঙ্গেও আমরা যোগ রাখব না। মিলন না হ'লেও যোগ রাখতাম কিনা সঠিক বলতে পারিনে। তবে আমরা যখন ১৯২৩ সালে জেলে গেছি, তখনও লেনিন জীবিত। কম্যুনিষ্ট পার্টির strategy ও tactics সব পরে যা দেখেছি, তখন পর্যন্ত সে সব অজ্ঞাত। আমরা কিন্তু মিলনের খাতিরে জেল থেকে বেরিয়ে এসে মজাফরদের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্কও প্রায় রাখিনি। অবশ্য, ইতিমধ্যে Workers' and Peasants' Party-র সঙ্গে এসে জুটেছিল এমন সব লোক যাদের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা ছিল না। আবার আমরাও এই পার্টির সঙ্গে থাকলে ওসব লোক বেশীদিন থাকতে পারতো কিনা সন্দেহ।

অপর দিকে, আমাদের কাছ থেকে তাড়া খাবার পর অবনী জুটলো অনুশীলনের সঙ্গে, এবং বীর অবনীতে পরিণত হ'ল। কুমারও জেল থেকে ছাড়া পেয়ে ওঁদের সঙ্গে জুটেছিল এবং দলের অন্তর্দ্বন্দ্বের সুযোগ নিয়ে ওঁদের নেতৃস্থানীয় একজনের হত্যার চেষ্টা প্রভৃতি অনেক অনর্থ ঘটিয়ে ওঁদের নেতৃবর্গের বিরাগ ভাজন হয়েছিল। কম্যুনিষ্ট পার্টির সঙ্গে আমরা যোগ রাখতে পারব না—মিলনের সর্তের মধ্যে এই নিষেধ বাণীর সমূহ কারণ এইটি।

কম্যুনিজম সম্পর্কে আমাদের অনেকের ভিতর এবং অনুশীলনের নেতৃস্থানীয় প্রত্যেকের ভিতর এমন একটা বিরুদ্ধতা ছিল যে, জিনিষটাকে বুঝবার চেষ্টাও কম হয়েছে—বোলশেভিক বিপ্লবের পর থেকে ক্যাপিটালিষ্ট ও ইম্পিরিয়ালিষ্টদের সংবাদ-সরবরাহকারীদের মারফত যা প্রচার হয়েছে, তাকেই এঁরা এ সম্পর্কে প্রায় শেষ কথা ব'লে ধরে নিয়েছিলেন।

ভূপতিদার ব্যাপারটা কিন্তু অদ্ভুত। এই সময়ে মনোরঞ্জনদার কম্যুনিজম বিরোধিতার জন্য ভূপতিদার তাঁর প্রতি যে মনোভাবটা

প্রায়শঃ দেখা যেত, তাকে বলা চলে ক্ষিপ্ত। অথচ, আসলে কম্যুনিজম বিরোধিতাটাও তাঁর ভিতর প্রায় ক্ষিপ্ত ধরণেরই (rabid). এই পরস্পর-বিরোধী মনোভাবের তাৎপর্য খুঁজে পাওয়া যায় একমাত্র এম. এন. রায়ের প্রতি একটা ব্যক্তিগত টানের ভিতর। যা-ই হোক্, কম্যুনিজম্ সম্পর্কে আমাদের প্রধানদের বিরোধিতা যখন অনস্বীকার্য, তখন অনুশীলনের দাবী সহজেই মেনে নেওয়া হ'ল। আমরা এ-দলের সংস্রব ত্যাগ করলাম।

এই তো গেল নেতির দিক। ইতির দিক নিয়ে কালিম্পং-এর অবাধ অবসরে ভাবি। সেপ্টেম্বরের মেঘলা দিনগুলো কেটে গেল। অক্টোবরের গোড়ার দিকে ভোরের বেড়ান সেরে একদিন এসে পড়তে বসেছি—বাড়ীওয়ালা চেমজং বললেন, আজ যান—কাঞ্চনজংঘা দেখতে পাবেন। সমস্ত উত্তর আকাশকে শীর্ষে নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে ছোট বড়ো অগণিত স্তম্ভবিশিষ্ট রূপোর এক দেয়াল, চেয়ে চেয়ে আর চোখ ফেরে না—যেমন দিনের মৃদু রোদে তেমনি রাতের স্ফুট জ্যোৎস্নায়। সঙ্গী সাথী যদি কখনও থাকেও, আপন মনে আনমনা হয়ে যেতে আটকায় না।

আমাদের জীবনে এ যেন পুরোনো সংস্কারকে ছেড়ে এক নতুন জীবনের পত্তন। অসহযোগের দিনে গণ-আন্দোলনের এমন রূপ দেখিনি যাতে ইংরেজের কামানগোলাকে তুচ্ছ ক'রে দেশকে স্বাধীন করতে পারে। গান্ধীজি যে দেশকে ধাপে ধাপে তৈরী করছেন, সেটা তখনও স্পষ্ট হয়নি। কাজেই দেশের সাধারণ লোককে ইংরেজ বিমুখী করবার ভার গান্ধীজি ও কংগ্রেসের উপর রেখে আমরা অস্ত্রের শক্তিকে দাঁড় করবার কল্পনা নিয়েই এগিয়ে যাচ্ছিলাম। এই কল্পনা মাথায় নিয়েই ধরা পড়ি ১৯২৩ সালে।

গণ-শক্তিকে কাজে লাগাবার যে প্রোগ্রাম এম. এন. রায় দিচ্ছেন, তাতেই বা আমরা কতোটা এগুতে পারব? গণ-আন্দোলনের ধারা ধ'রে তখনও আমরা চিন্তা করতে তেমন অভ্যস্ত হই নি। তার উপর, তখন পর্যন্ত আমাদের দেশের কৃষককে আমরা যা জানি, তারা জীবনের সর্ব ব্যাপারে উদাসীন—দুঃখদৈন্যে অভ্যস্ত হয়ে গেছে, অদৃষ্ট ছাড়া নিজের চেষ্টার যে কোনো স্থান আছে, একথা কোন্ যুগে ওরা ভাবতে পারবে, তা আমাদের কল্পনায় আসে না। আর শ্রমিক কয়জন আমাদের দেশে?—দু'চারটে জায়গায় যারা আছে, সংগ্রাম হয়তো তারা করতে পারে নিজেদের মাইনে বাড়াবার জন্যে। সে সংগ্রামে একটা ব্যাপক রাজনৈতিক উদ্দেশ্য কত যুগে আসতে পারে, তা আমরা তখনও ভেবে উঠতে পারিনে।

তাছাড়া, মধ্যবিত্ত কর্মীও তখন পর্যন্ত আমাদের দেশে মুষ্টিমেয়। কংগ্রেস আন্দোলনে যারা এসেছে, তাদের ভিতর দু'পাঁচজন ছাড়া আর সবাই সহজের সাধক। ইন্‌সিনে ও আলিপুরে আলোচনায় আমাদের যে সিদ্ধান্ত হয়, তাতে বুঝি, অসহযোগ আন্দোলনের মতো আরও একটা আন্দোলন আগামী দিনে আসছে—যার ভিতর আমাদের কাজ হবে মধ্যবিত্তেরই একটা বিরাটতর মরিয়া ধরণের কর্মীশ্রেণী গ'ড়ে তোলা। সে কাজ আমরা কংগ্রেসের ভিতর থেকেই করতে পারি। এবং এরও পরের স্তরে বিপ্লবী আন্দোলনের প্রশস্ততম ভিৎ গড়ে উঠবে, কৃষক শ্রমিককে কংগ্রেসের ভিতরই আমরা পাব—মরিয়া ধরণের কর্মীশ্রেণীর বিরাটতর দল কৃষক শ্রমিককেও মরিয়া ক'রে তুলবে। সেই দিনই আসবে ইংরেজের সামরিক শক্তির সঙ্গে আমাদের গণশক্তির সত্যিকারের প্রত্যক্ষ সংগ্রামের দিন।

আগের বারেও জেল থেকে বেরিয়েছি একটা ভাঙা-গড়ার মুখে। তখনও ভবিষ্যতের পন্থা সম্পর্কে একটা মোটামুটি ধারণা করতে গিয়ে চোখের সামনে দেখেছি, গান্ধীজি ইংরেজের সাথে অসহযোগের জন্যে দেশকে উত্তেজিত, মথিত করে তুলছেন। দেশেরই সাধারণ উত্তেজনা থেকে তিনি প্রেরণা পেয়েছেন।

এবারেও অন্তরীণে বসে দেখছি, দেশময় একটা যুব-আন্দোলনের সূচনা দেখা দিচ্ছে। এর ভিতর ধীরে ধীরে ফুটে উঠছে সদ্য রুশিয়া প্রত্যাগত জওহরলালের এবং সদ্য জেল থেকে মুক্ত সুভাষচন্দ্রের প্রেরণা। এঁরাও প্রেরণা সংগ্রহ করছেন দেশের একটা অশান্ত উত্তেজনা থেকে।

আমরা ভাবছি, একে আরও উন্মত্ত ক'রে তোলা যায় কি ক'রে। দেখছি আর ভাবছি, ভাবছি আর দেখছি। এই ক'রেই অন্তরীণের দিনগুলো আমার কাটছে।

এ ছাড়া, কালিম্পং-এর জীবন প্রায় ঘটনাবৈচিত্র্যহীন। ওখানে পৌছাতেই শুনি, ওখানে আগে থেকেই একজন মস্তবড় বিপ্লবী রয়েছে। ইংরেজী ধরণে, নাম কেউ বলতে পারে না, বলে "সরকার"। একটু অনুসন্ধানে নাম সংগ্রহ করতেই বুঝলাম, এ ১৯১৫ সালের এক বিখ্যাত স্বদেশী মামলার এক কুখ্যাত রাজসাক্ষী। ও যে একজন তাগড়াগোছের বিপ্লবী, ওর নিজের মুখের দেওয়া সেই পরিচয় ওখানকার বাঙালীদের মুখে মুখে শুনি। কাউকে কিছু বলিনে।

কোর্টে সাক্ষী দেবার পর দূরে এক নিভৃত পাহাড়ে ইংরেজ সরকার ওকে কিছু জমি দেয়। সেখানে চাষবাস করে, এক পাহাড়ী মেয়েকে বিয়ে করে। আটনয় বছর এইভাবে কাটে—সেই স্ত্রীটির মৃত্যুর পর ইংরেজ সরকার এক রায়বাহাদুরের ব্যবসায়ে চাকরী দিয়ে ওকে শহরে

এনেছে। দেশে এসে আবার এক বাঙালী মেয়েকে বিয়ে করেছে। এরকম ছেলেকে বিয়ে করবারও আমাদের দেশে মেয়ের অভাব হয় না!

প্রবৃত্তি যায় নাই—কালিম্পং সহরে কে কে আমার সঙ্গে মেশে, খবরটি ওখানকার সার্কেল ইন্‌স্পেক্টারকে পৌঁছে দেয়। আমি বুঝি, অন্যে টের পায় না।

সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টা পর্যন্ত আমি বাইরে থাকতে পারি। সেটা বোধ হয় হবে নভেম্বর মাস। ও অঞ্চলে তার ভিতরই যেন বেশ রাত হয়ে যায়। ওখানকার লাইব্রেরী থেকে বের হচ্ছি, সামনেই সার্কেল ইন্‌স্পেক্টার।

বলে, আপনি এতক্ষণ পর্যন্ত বাইরে থাকতে পারেন?

পারি কিনা ঘড়ি খুলে দেখুন গিয়ে।

"আপনি লাইব্রেরীতে আসতে পারেন?"

"কোন্ আইনে আটকায়?"

"Don't carry your duty too far"—ব'লে একটা ধমক দিয়ে চ'লে এলাম।

এর পর ও লাগলো আমার পেছনে।

একদিন এক ভদ্রলোকের সঙ্গে বাড়ীর দিকে যাচ্ছি, ঐ বিপ্লবীটি এসে প্রথম পরিচয় করলো, সঙ্গের ভদ্রলোকও পরিচয় করিয়ে দিলেন। তারপর বিপ্লবী হাতজোড় ক'রে বলে, কাল আমার ছেলের অন্নপ্রাশন, আমার বাড়ীতে একবার পায়ের ধূলো দেবেন।

বলি, মাপ করবেন। আপনাকে আমি জানি। আপনি যাঁদের সর্বনাশ ক'রে এসেছেন, তাঁদের আমি ব্যক্তিগত ভাবে না জানলেও, তাঁরা আমার সহযাত্রী, আমার এক পরিবারের লোক। আপনি

তাঁদের আন্দামানে পাঠিয়ে এসেছেন, আর আজ আমি এখানে এসে আপনাকে জাতে তুলে যাব? সে আমি পারব না।

আর কথাটি না ব'লে, এক পায়ে ত্'পায়ে স'রে গেল। সঙ্গের ভদ্রলোকটী তো অবাক। তারপর আমার কাছে সব শুনলেন। ওর বাড়ীতে রান্নাবান্না দেখার, লোকজন খাওয়ানর ভার ছিল এঁর উপর। ইনি আর গেলেন না।

কথাটা রাষ্ট্র হয়ে গেল। রাস্তায় ঘাটে ছেলেরা ওকে দেখতে পেলে চেঁচাত, "মীরজাফর", "উমিচাঁদ"।

সার্কেল ইন্‌স্পেক্টার রিপোর্টের উপর রিপোর্ট পাঠাতে লাগলো আমার নামে।

কমলা লেবু পেকে উঠেছে। রোজ তিন চার জন সঙ্গী সাথী নিয়ে সার্কেল ইন্‌স্পেক্টারের বাংলোর সামনে দিয়েই অনেক নীচে কমলা লেবুর বাগানে চলে যাই—সে আমার গতিবিধির জন্য নির্দিষ্ট সহরের যে অংশ, তার বাইরে বহু দূরে।

কালিম্পং-এর শীত জমে উঠেছে। আকাশের চেহারা, পাহাড়ের রং, পাহাড়ের খাতে খাতে জমা পুঞ্জীকৃত মেঘের অপরূপ রূপ পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। বন্ধু মণি ফটোগ্রাফার। ভোর পাঁচটা বাজতে না বাজতে ওভারকোট চাপিয়ে বেরিয়ে পড়ি। ওখানকার উঁচু উঁচু শিখরে বসে কাঞ্চনজংঘার শীর্ষে প্রথম সূর্যের আলো পড়বার প্রতীক্ষায় অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকি। বার বার মুখে আসে সেই কথা, "আহা, কি দেখিলাম? জন্মজন্মান্তরেও ভুলিব না।" একটু রোদ উঠতে মেঘ, বন, পাহাড়—সবের ফটো নিতে নিতে ফিরি।

কমলালেবু খেতে যেমন স্থানের দিক দিয়ে, দৃশ্য দেখতে তেমনি সময়ের দিক দিয়ে আইন ভাঙ্গি।

তিস্তা যেখানে নেমেছে, একদিন কানু আর ননীকে নিয়ে সেখানের উদ্দেশে যাই। গিয়ে পাহাড়ে পথ হারিয়ে ফেলি। সমস্ত দিন ধ'রে সে যে কি ঘোরাঘুরি আর পথ খোঁজা! কোথাও পাশের জঙ্গলেই বাঘের ডাক শুনছি, গায়ের গন্ধ পাচ্ছি, কোথাও বহু উপর থেকে গাছের শিকড় ধরে ধরে নদীগর্ভে নামছি আর উপর থেকে বালুর উপর দিয়ে পাথর নেমে আস্‌ছে। একবার তো ননী উপরে দাঁড়িয়ে ভয়ে শুষ্ক মুখে দেখছে আর ভাবছে এইবারে হয় আমি প্রকাণ্ড এক পাথরের নীচে গুঁড়ো হয়ে যাব, নয়তো ওর চাপে গাছের শিকড় থেকে আমার হাত খসে যাবে, আর হাজার দুই ফুট নীচে প'ড়ে শেষ হয়ে যাব। সে সব কিছুই হ'ল না, ডান হাতে শিকড় ধরেই, বাঁহাত তার তলায় দিয়ে ধাক্কা দিতে বুকের উপর দিয়েই গেল বটে, কিন্তু আমায় পিষে দিয়ে গেল না। অবশেষে নদীর ওপারে উঠে অনেক উপরে এক ধানের ক্ষেতে এক কৃষককে আবিষ্কার করা গেল। তাকে কিছু পয়সা দিয়ে কালিম্পং-এ ফিরবার পথ পাওয়া গেল। জীবনে এমন ক্লান্ত কখনও হইনি। থানায় হাজরের সময় পেরিয়ে গিয়ে প্রায় সন্ধ্যা হয়েছে, ধূলোবালি মাখা মাথা আর জামা কাপড় নিয়ে সার্কেল ইন্‌স্পেক্টারের বাড়ীর সামনে দিয়েই বাসায় পৌছালাম।

লোম্যান ওদিকে রিপোর্ট পেয়ে পেয়ে আর চুপ ক'রে থাকতে পারে না। অবশেষে এক ডেমি-অফিসিয়াল পত্র দিল দার্জিলিং-এর পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেন্টের কাছে: এই সব লোকের বিরুদ্ধে এই সব ছোটোখাটো ব্যাপার নিয়ে মামলা করা সরকারী নীতি নয়—বিশেষতঃ এসব ব্যাপারের কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য আছে ব'লেও আমাদের কোন রিপোর্ট নেই। অন্য ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

অন্য ব্যবস্থা ওরা যা করলো, তার আগে একটু কাজ হয়ে গেল।

আমার বাড়ীওয়ালার স্বদেশ ও স্বজাতিপ্রীতি গভীর। তিনি রাত্রে রাত্রে এসে পরামর্শ করেন। নেপালের কোনো সংবাদপত্র নেই, এবং কোন্ হরফে সংবাদপত্র চলতে পারে—সে-ও একটা সমস্যা। অথচ সংবাদপত্র না হ'লে দেশে স্বজাতিপ্রীতিও জাগান যাবে না—নেপালীরা বিশ টাকা মাইনেয় চিরকাল ইংরেজের নোক্‌রী ক'রে ভারতবর্ষের আর অন্যান্য দেশের স্বাধীনতার শত্রুতা ক'রে বেড়াবে। এই আলোচনায় গভীর রাত্রে মাঝে মাঝে ওখানকার একজন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীও যোগ দেন। দেরাডুনের Himalayan Review পত্রিকার সম্পাদক, তখনকার দিনের নেপালী নেতা ঠাকুর চন্দন সিং-এর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেন ডাঃ কিচ্‌লু ১৯২৩ সালে। তাঁকেও আনবার ব্যবস্থা হ'ল। এবং হিন্দি হরফেই কাগজ বের হবে স্থির হ'ল। চেমজং কলকাতায় এলেন আমার এক বন্ধুর কাছে চিঠি নিয়ে—প্রেসের মেসিন এবং টাইপ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে।

লোম্যান অন্য ব্যবস্থা করলো—হুকুম হ'ল আমার বাড়ীতে অন্তরীণের।

এটা ১৯২৮ সালের গোড়ার কথা। যশোর সহরে দেখা হ'ল অ্যাডিশনাল পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট রাঘবেন্দ্র ব্যানার্জির সঙ্গে। রাতের বেলায় ডেকে পাঠিয়ে আই. বি. অফিসারকে বাইরে বসিয়ে রেখে ঘরে দরজা বন্ধ ক'রে আলাপ করলেন। আমি যখন কলেজে পড়ি ইনি তখন নামকরা ছাত্র নেতা। আর এখন বিদেশী সরকারের পুলিশ কর্মচারী!

আভাসে কথাটার উল্লেখ করতেই বলেন, শীঘ্রই বিলেত যাচ্ছি ব্যারিষ্টারি দিতে। তারপরই এ-চাকরী ছেড়ে দেব।

সব সরকারী কর্মচারীর মতোই কথা, এবং সব সরকারী কর্মচারীর মতোই চাক্‌রী ইনি ছাড়েন নাই—বিলেতও গিয়েছিলেন, ব্যারিষ্টারিও পাশ করেছিলেন।

জীবনে বাড়ীতে অল্পই থেকেছি। যখনই থেকেছি, গ্রামের ছেলেরা প্রায় দিনরাত আমাদের বাড়ীতেই কাটায়। তাদের কাছে গ্রামের অবস্থা সব শুনি।

গ্রামের মাঝখান দিয়ে একটা পথ—নদীর ঘাট পর্যন্ত গেছে। বর্ষার দিনে সে পথ প্রায় অগম্য, কাদা তো আছেই, কোথাও কোথাও প্রায় কোমর অবধি জল। মেয়েদের সেই পথেই জল আনতে যেতে হয়।

ঝুড়ি কোদাল হাতে ছেলেদের দল নিয়ে মাটি কেটে রাস্তা তৈরী করতে স্থুরু করি। বেশ উৎসাহ। ভিন্ন গ্রাম থেকেও ছেলেরা আসে।

আবার বাধাও আসে। একটি ব্রাহ্মণ-সন্তান আছেন, গ্রামে এমন ভাল কাজ হয় না, যাতে বাধা সৃষ্টি করা তিনি যুক্তিযুক্ত না মনে করেন। তার ফলে, আই. বি.র লোক ও-অঞ্চলে গেলে স্থান তাঁর বাড়ীতেই। এবং সমূহ অপর ফল ফললো, গ্রামের রাস্তাটি তাঁর বাড়ীর সামনেই আজও সরু রয়ে গেছে।

আরও বাধা এল অন্য দিক থেকেও। তবে কোনো বাধাই টেঁকে না। কারণ, সব বাড়ীরই ছেলেরা আমাদের দিকে।

এই রাস্তার কাজের ফল পেলাম। আমাদের ও-অঞ্চলটা প্রায় পাণ্ডব বর্জিত। তবু পরবর্তী যুগে ওখান থেকেও কয়েকজন কর্মীই রাজবন্দী হলেন।

তার চেয়েও বড়ো ফল ফললো অন্য দিকে অন্যভাবে। এ-ও এক

বাধারই ফল : রাস্তার কাজের পরিশ্রমের পর স্নান সেরে আমাদের বাড়ীতেই হোক, অন্য বাড়ীতেই হোক, প্রায় সন্ধ্যাতেই কিছু জলযোগ জুটে যায়। রাধারমণ সাহার মা একদিন লুচি তরকারি ক'রে খাওয়ালেন। আমাদের পুরোহিত-পুত্র ধীরেন চক্রবর্তী। তাঁর কাকা ব'লে বসলেন, প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। ধীরেন বলেন, এমন কিছু অপরাধ করেছি ব'লে তো মনে করিনে। প্রায়শ্চিত্ত কেন করতে যাব ?

প্রায় পঁচিশ বছর আগেকার আমাদের পাড়াগাঁ—কাকার তর্জন সমর্থন পায়। পরামর্শের জায়গা আমারই ঘর। বলি, চুপ ক'রে থাক, সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। ঠাণ্ডাই হয়ে গেল। আজ আর আমাদের দেশে জল অচল কোনো হিন্দু নেই, পুজোর ঘরে জল দেবার, ভোগ দেবার অধিকার সবার সমান। নিমন্ত্রণে আমন্ত্রণে একসঙ্গে খাওয়াই বিধি। ধীরেন আর রাধারমণ আজও কর্মী, এবং এদিকে সজাগ।

জুন মাস প্রায় শেষ হয়। খালাস হয়ে কলকাতায় এলাম।

শেষ